মারকে লেঙ্গে

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রীডার্স কর্ণার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৫৭

দাম চার টাকা

শিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র এম. এ. প্রকাশ করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ হাজরা ছেপেছেন

ভূমিকা

মারকে লেঙ্গে নীতি বর্তমান নীতি। এই নীতিই প্রতিফলিত দেখা যাবে এই গল্পগুলোতে।

অধিকাংশ গল্পের বিষয় বস্তুতেই রচনা-সময়ের ছাপ পড়েছে, সে জন্যে প্রত্যেকটি গল্পের শেষে রচনা-কাল (ইংরেজী সন) ছাপা হল। কিন্তু এই সময়ের ছাপ একটু স্বতন্ত্র। কারণ মারকে লেঙ্গেতে যে সময়ের ছাপ পড়েছে তা সংকীর্ণ সময়ের। জাত-গল্প-লেখকদের লেখায় যুগের ছাপ পড়ে, এগুলোতে আছে হুজুগের ছাপ। যেমন চোরাকারবার খারাপ যখন এই মনোভাব দেশে প্রবল, তখন গল্পে তার নিন্দা আছে। আবার যখন অধিকাংশ লোক চোরাকারবারের সমর্থক হয়ে উঠেছে তখন গল্পেও তার সমর্থন আছে। সাম্প্রদায়িক মিলন যখন কাম্য হয়েছিল তখন গল্পে মিলনের গুণগান ফুটেছে। যখন পশ্চিমবঙ্গের জমির দর বাড়ানোর জন্যে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিল তখন তাকে সমর্থন করা হয়েছে। পরীক্ষা গৃহে ছাত্ররা যখন বই টোকা রীতি প্রচলন করতে চায়, সে সময়ের গল্পে তার পূর্ণ সমর্থন আছে। খেলার মাঠের মারামারির উচ্চ প্রশংসা পাওয়া যাবে গল্পের মধ্যে। এমন কি নতুন কাগজ বের করাও সমর্থিত হয়েছে।

এই ভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল সব হুজুগের পটভূমিতে এক একটি রচনা জন্মলাভ করেছে। সমাজ ইতিহাসে যুগ ধর্মের প্রভাব ছাড়াও যাঁরা হুজুগ ধর্মের প্রভাব খুঁজতে চাইবেন তাঁদের সুবিধার জন্যে তার কিছু কিছু চিহ্ন রেখে দেওয়া গেল এই গল্পগুলোর মধ্যে।

কিন্তু গল্পের চেহারা থাকলেও সবগুলো ঠিক গল্প নয়, ক্যারিকেচার বা কার্টুন চিত্র।

কিন্তু ক্যারিকেচার রেখার হোক বা ভাষার হোক, প্রকাশ করার সাহস আছে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্রের, তাই তাঁকে নমস্কার জানাই, আর এই সঙ্গে বন্ধুবর শ্রীশৈল চক্রবর্তীকেও, কারণ তিনিও সাহস করে তাঁর নিজের স্বাধীন কল্পনা এর অনেকগুলো ছবিতে যোগ করেছেন।

৩৫ ডি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ৩১-৫-৫০

পরিমল গোস্বামী

—সূচী

কলকাতা শহরের ছোট বড় প্রায় চারশো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক আজ মাসখানেক ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন শহরের মধ্যে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদের প্রকাশিত হবার উপায় নেই।

কিন্তু কেন?

এ কি ধর্মঘটিদের ভয়ে?

এ কি চোরাকারবার ধরা পড়ার ভয়ে?

এ কি পাওনাদারের ভয়ে?

এ কি কোনো নতুন আইনের ভয়ে?

না। এর কোনোটাই নয়। এ এক অপ্রত্যাশিত বিপদ। শহরে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে। এ শক্তি নির্মম, নিষ্ঠুর, দুর্বার। এ শক্তি শুধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই মাথা তুলেছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এর কাছে অসহায়।

এ এক নতুন শত্রু। এ শত্রু সংখ্যায় প্রবল, উপরন্তু সশস্ত্র। এর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি? আত্মরক্ষা কি সম্ভব?

বহু রকম প্রতিকার চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয়নি। জীবনমরণের প্রশ্ন, সঙ্কট মাথার উপরে ঝুলছে, সময় সঙ্কীর্ণ, অবিলম্বে কিছু করা দরকার।

পাঁচকড়ি তালুকদার ? হাঁ, তাঁর কাছেই এখন যেতে হবে। ব্যবসায়ী মহলে প্রখর বুদ্ধি একমাত্র তাঁরই ছিল একদিন। সম্প্রতি তিনি কর্মতৎপরতার পথ ছেড়ে জমিদারির মালিক হয়েছেন। বুদ্ধি আরও জমাট হয়েছে, বুদ্ধির জন্যে তাঁর কাছেই যেতে হবে। বুদ্ধিহারা ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছলেন অবশেষে।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। পাঁচকড়ির প্রশস্ত আঙিনায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একে একে এসে মিলেছেন চারশো ব্যবসায়ী। মৃদু আলো জ্বলছে মাথার উপরে।

চুপে চুপে পরামর্শ। ফিস ফিস আলাপ। চেঁচিয়ে কথা বলার উপায় নেই, শত্রুপক্ষ সর্বত্র সজাগ। ঘুণাক্ষরে টের পেলে মৃত্যু অনিবার্য।

পাঁচকড়ি বললেন, "সব খুলে বল তো—বিপদের চেহারাটা আরও একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার আমার কাছে। যারা তোমাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে তারা সংখ্যায় ঠিক কত বলে মনে হয় ?"

এঁদের মুখপাত্র অভয়াচরণ বললেন, "হাজারের বেশি।"

পাঁচকড়ির মুখে একটা ছায়াপাত হল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে উচ্চারণ করলেন, "হা-জা-রে-র বে-শি ?"

অভয়াচরণ বললেন, "সেই জন্যেই তো কূলকিনারা পাচ্ছি না।"

"ওরা কি বলে ?"

'বলে, 'দিতে হবে'।"

"গায়ের জোর ?"

"শুধু গায়ের জোর নয়, অস্ত্রের জোরও আছে।"

পাঁচাকড়ি এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, "তা কি করে সম্ভব ? হাজার লোক অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?"

অভয়াচরণ বললেন, "অস্ত্র নিয়ে ঘোরা আজকাল তো স্বাভাবিক

ব্যাপার। গান্ধিজী বলেছিলেন বটে সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর, তাঁর কথায় অনেকে ছেড়েও দিয়েছে, শুধু ওরা ছাড়েনি।”

“পুলিসে জানিয়েছ?”

অভয়াচরণ সখেদে বললেন, “সে পথ বন্ধ।”

“কেন?”

“শুনছি পুলিসরাই নাকি ওদের সাহায্য করছে।”

“বল কি? শত্রু সশস্ত্র, উপরন্তু পুলিসের সাহায্য? আচ্ছা, তোমরা পুলিসকে হাত করার চেষ্টা করেছ কেউ?

“কি ভাবে?”

“ওরা যে ভাবে করেছে?”

“ওরা যে ভাবে করেছে ভেবেছিলাম, তা নয়। হাজার হাজার টাকা ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছি, সবাই মিলে লাখ টাকা পর্যন্ত উঠেছি, কিন্তু পুলিস অটল। এ এক মহা রহস্য মনে হচ্ছে। টাকার চেয়ে সংসারে আর কি বড় আছে আমরা জানি না। প্রস্তাব শুনে পুলিস মারতে আসে।”

পাঁচকড়ি আরও চিন্তাবিষ্ট হলেন। মনে হল যেন, তিনিও এ রহস্য ভেদ করতে পারছেন না।

কিন্তু ঠিক এই সময় বহু দূর থেকে আগত একটি সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি শুনে উপস্থিত সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। এই সুর, এই ধ্বনি, এই সে-দিনও শহরে শোনা গেছে। অতি মারাত্মক ধ্বনি। এর পরিণাম যে কি তাও কারও অজানা নেই।

হঠাৎ আবার কি হল?

বিভক্ত স্বাধীন বাংলায় আবার কি হল?

ধ্বনির একটা অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। “মা-র-কে লে-ঙ্গে!”—কিন্তু পরবর্তী অংশটি তখনও অস্পষ্ট।

একজন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বোধ হয় তারা আসছে!"

"তারা আসছে?—কিন্তু তাদের মুখে এ ধ্বনি কেন?"—প্রশ্ন উঠল সবার মুখে। প্রশ্নের উত্তরও আর কয়েক মুহূর্ত পরেই পাওয়া গেল।

এক দল চেঁচিয়ে বলছে 'মা-র-কে লে-ঙ্গে'—

আর এক দল সমস্বরে বলছে, 'বি-জ্ঞা-প-ন!'

দুটি অংশ জুড়ে দাঁড়াচ্ছে, 'মা-র-কে লে-ঙ্গে বি-জ্ঞা-প-ন-!'

"তারা আসছে!"

"তারা আসছে!"

"তা-রা আ-স-ছে!"

"আলো নেবাও। সদর দরজা বন্ধ আছে? জানলা গুলো ভাল করে বন্ধ কর। দারোয়ান! বন্দুক! গেট ভাঙবে? প্রস্তুত থাক।"

অন্ধকারে কারো মুখের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠক ঠক শব্দে অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল।

ধ্বনি করতে করতে হাজার লোকের শোভাযাত্রা বাড়ির দরজায় এসে পড়ল। হাজার নতুন কাগজের সম্পাদক।

তারা বিজ্ঞাপন চায়।

মৃত্যুর মতো কালো অন্ধকার আঙিনায় চারশো মুমূর্ষুর চাপা আর্তনাদ আবহাওয়াকে ভয়াবহ করে তুলল।

পাঁচকড়ি লুকিয়ে দেখলেন সেই শোভাযাত্রীর দলকে। তাঁর মাথাই কিছু ঠাণ্ডা ছিল। দেখলেন তাদের হাতে স্টেন গান্, ব্রেন গান্, বোমা, অ্যাসিড বাল্‌ব্। আর তাদের পুরোভাগে দুশো সশস্ত্র পুলিস। তিনি চাপা গলায় সবার মধ্যে খবরটি প্রচার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আঙিনার বিভিন্ন স্থান থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ উঠতে

লাগল, বু—বু—। সে শব্দ এতই জোরালো যে শোভাযাত্রীরা তা শুনে চেঁচিয়ে বলে উঠল "খবর ঠিক, এই খানেই আছে তারা, গেট ভাঙো।"

অধিকাংশ ব্যবসায়ী বু—বু—করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পাঁচকড়ির দুখানা পা ইতিমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে।

দরজার উপর পড়ছে ঘা। দারোয়ান বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল, সে সাফ জবাব দিল গোলি চালিয়েও সে ওদের রুখতে পারবে না।

পাঁচকড়ি বললেন, "দরজা খুলে দাও। এরা মরে মরুক, দরজার যেন ক্ষতি না হয়।"

দরজা খোলা হল, আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দল ঢুকে পড়ল ভিতরে। বাইরের হাজার শোভাযাত্রী সমস্ত পল্লী কাঁপিয়ে ধ্বনিত করল, 'মারকে লেঙ্গে বিজ্ঞাপন।

পাঁচকড়ির পা দুখানি তখনও কাঁপছে। তিনি ভীতভাবে বললেন, "যা করবার ঝটফট করে ফেল। কিন্তু—কিন্তু—আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা পুলিস হয়েও এই মারাত্মক লোকদের সাহায্য করছ কেন।"

অভয়াচরণও সাহস পেয়ে বললেন, "আমাদের মেরে তোমাদের লাভ কি!"

পুলিস কড়াস্বরে হুকুম চালাল, "ওরা যা চায় জলদি দিয়ে দাও, নইলে বোমা ফাটবে।"

পাঁচকড়ি বললেন, "বোমা-টোমা ফাটিও না, বাবা, ওদের সাধ্য কি তোমাদের রোখে? কিন্তু এই কথাটি আমি শুধু বুঝতে চাই যে এতে তোমাদের স্বার্থ কি?"

এ কথায় দুশো পুলিস এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। সর্দার পুলিস বলল, "ওরা কথা দিয়েছে আমাদের লেখা ছাপাবে।"

"তোমাদের লেখা ?" পাঁচকড়ি স্তম্ভিত হলেন, কিন্তু তখনই বুঝতে পারলেন অভয়াচরণ টাকা দিয়ে ওদের ঠেকাতে পারেনি কেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের লেখা ? ছাপাবে ওরা ?"

"জরুর ছাপাবে।"

"কি লিখবে তোমরা ?"

একজন বলল, "আমি গল্প লিখব।"

আর একজন বলল, "আমি কবিতা লিখব।"

আর একজন বলল, "আমি নাটক লিখব।

আর একজন বলল, "আমি উপন্যাস লিখব।"

আর একজন বলন, "আমি গান লিখব।"

পাঁচকড়ি বললেন, "তোমরা সবাই লিখবে ?"

"সবাই লিখব।"

"কিন্তু এত নতুন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যে ওরা মারা যাবে।"

"জরুর যাবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন তো ওরা ছাড়বে না।"

একজন সম্পাদক বলল, "কার বেঁচে থাকার দাবী বেশি, সে বিচার কে করবে ?"

অভয়াচরণ বললেন, "আমরা মারা গেলে কাগজ বাঁচে কি করে ?"

সম্পাদক বলল, "কাগজ যদি বিজ্ঞাপন না পায় তা হলে তোমাদের বাঁচায় কে ?"

পাঁচকড়ি বললেন, "তোমরা এত কাগজ বের করছ, বিজ্ঞাপনও পাচ্ছ, কিন্তু এত কাগজ পড়বে কে ?"

একজন বলল, "হয় তো কেউ পড়বে না।"

আর একজন বলল, "না পড়ল তো বয়েই গেল।"

আর একজন বলল, "কেউ পড়বে কি না সে কথা আমরা ভাবি না।"

অভয়াচরণ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "তবে এ পরিশ্রম কেন ?"

"কেন ? কারণ এত কাল আমরা ভুল করে শুধু শুনেই এসেছি কিছু বলতে পারিনি, আজ আমরা কিছু বলতে চাই।"

"কেউ যদি না শোনে, বলে লাভ কি ?"

ঐখানেই তো আমাদের বৈশিষ্ট্য। শুধু বলার উদ্দেশ্যে বলা। শুধু লেখার জন্যে লেখা। শুধু আর্টের জন্যে আর্ট।"

পাঁচকড়ি বললেন, "এ রকম একটা কথা শুনেছি বটে।"

"না শুনলেও কিছু এসে যায় না। পৃথিবীতে চিরকাল এই রীতি চলে আসছে। টা হোটেপ, কনফিউসিয়াস, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ থেকে শুরু করে আজকের দিনের গান্ধিজী পর্যন্ত সবাই এই রীতিতে চলেছেন। তাঁদের কথার মুদ্রিত সংস্করণে পৃথিবীকে পঞ্চাশবার মোড়া যায়, কিন্তু তাঁদের কথা কেউ শোনে কি ? কোনো দিন কেউ শুনেছে ? আর তাঁরা যদি শোনার পরোয়া না করে এত বলতে পারেন, আমরা পারব না কেন ? বুঝে দেখুন কথাটা।"

পাঁচকড়ি গম্ভীর সুরে বললেন, "ভাববার কথা।"

পুলিস বলে উঠল, "ভাববার কথা নয়, সই করবার কথা।—নিয়ে এসো 'ফারম'।"

শোভাযাত্রীদের পিছনে ছিল লরি, লরিতে ছিল কনট্রাক্ট ফর্ম, সম্পাদকেরা ঘাড়ে করে বয়ে আনতে লাগল বোঝা বোঝা ফর্ম। হাজার সম্পাদক ওদের ঘিরে প্রত্যেকে একখানা করে সই করিয়ে নিতে লাগল। মূর্ছিতদের গুঁতো মেরে মেরে জাগানো হল।

প্রত্যেক ব্যবসায়ী হাজারখানা করে সই করলেন, করতে করতে রাত শেষ হয়ে এল। মোট চার লাখ ফর্ম সই হয়ে গেলে দুশো পুলিস আর হাজার সম্পাদকের বিজয় হাস্যে আঙিনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। তাতে উষার আলো উজ্জ্বলতর হল, কিন্তু চারশো স্বাক্ষরকারী সে আলো দেখতে পেল না, তারা দেখল শুধু অমা-নিশার ঘোর অন্ধকার।

(অচল পত্র, ১৯৪৭)

মারকে জেঙ্কে

গাধা বসে ভাবছে।

প্রবীণ, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী এক গাধা।

গাধার চিন্তা শেষ হয় না।

ঐ যে নদীর ওধারে ঘনজঙ্গল। সেখানে বাঘেরা থাকে। কি আশ্চর্য শক্তি তাদের গায়ে। কি প্রবল ব্যক্তিত্ব, কি স্বাধীনতা। সমস্ত পশু তাদের ভয়ে কম্পমান। কিন্তু গাধাকে কেউ মানে না, কেউ তার দিকে ফিরে চায় না।

বাঘের ঐ স্বাধীন জীবনের স্বাদ তার পেতে ইচ্ছা করে। মেষ, হরিণ, গোরু সবাই তার ভয়ে কাঁপবে, সবাই তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে, এ এক অপূর্ব পুলকময় অভিজ্ঞতা, এ অভিজ্ঞতা অন্তত এক দিনের জন্যেও কি পাওয়া যায় না?

পাওয়া গেল সহজেই।

নদীর ধারে এক সন্ন্যাসী কিছুদিন বাস করছিল, তার ছিল এক বাঘছাল। এক দিন সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতিতে গাধা সেই বাঘছাল চুরি করে বাঘ সেজে বসল।

তার অনুমান মিথ্যা নয়, কারণ তাকে দেখে পশুরা সত্যিই তাকে বাঘ মনে করে ভয়ে পালাতে লাগল। গাধার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল।

সে দিন উৎসাহের আতিশয্যে সে সমস্ত রাত জেগে বাঘের ভূমিকা অভিনয় করল।

কিন্তু বাঘের চেহারা নিয়ে তো আর ঘাস্ খাওয়া যায় না, কেউ যদি দেখে ফেলে ? তা ছাড়া তার নিজের কাছেও তো সেটা লজ্জাকর। গাধা ভাবতে লাগল দু এক টুকরো মাংস খেয়ে দেখলে কেমন হয় ? কিন্তু মনের সঙ্গে, কল্পিত স্বাদের সঙ্গে এবং মাংসের চেহারার সঙ্গে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তিকে কিছুতে মেলাতে পারল না, তাই সে জঙ্গলে গিয়ে কিছু ঘাসই খেয়ে এলো।

জমিদার দেখে প্রজাদের যেমন অবস্থা হয়, গাধাকে দেখে পশুদের (এবং অন্য গাধাদেরও) সেই অবস্থা হল। গাধা নিজেকে জমিদার কল্পনা করে গর্বে আরও ফুলে উঠল।

কিন্তু হায়! মৃণালে কণ্টক থাকে, আর কুসুমে কীট! এক দিন তাকে ধরা পড়তে হল এক বাঘেরই হাতে। সেই বাঘ এক হরিণ তাড়া করে ছুটে আসছিল, গাধা তাকে দেখতে পায়নি, সে ছুটন্ত হরিণকে দেখে মনে করল তাকে দেখেই সে পালাচ্ছে সুতরাং গাধাও তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

এমন সময় রঙ্গমঞ্চে বাঘের আবির্ভাব। বাঘ হঠাৎ ছদ্মবেশী-গাধাকে দেখে একটু ভড়কে গিয়েছিল কিন্তু মুহূর্তেই সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে সকৌতুকে গাধার দিকে চেয়ে রইল।

গাধা ভাবল তাকে দেখে বাঘের সম্ভ্রম জেগেছে।

কিন্তু বাঘের কণ্ঠস্বরে সে ভুল তার ভেঙে গেল। গম্ভীর স্বরে বাঘ জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ?

গাধা একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল মাত্র, কারণ কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে।

বাঘের আর বুঝতে বাকী রইল না বাঘছালের আবরণে কে। সে

আর কিছু না বলে সোজা ওর পিঠের বাঘছাল খানা কামড়ে টেনে নিয়ে গাধার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিল, তার পর হো হো করে হাসতে লাগল ওর ভীত চেহারা দেখে।

গাধা অপ্রস্তুতভাবে বলল, "হোসো না।"

"কেন?"

"হাসবার মতো কি ঘটেছে?"

"না এমন কিছু নয়। তবে তোমার অভিনয়টা সামান্য একটু হাসির উদ্রেক করেছিল।"

গাধা ক্রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করল, "অভিনয় কি তুমি এতই অপছন্দ কর?"

বাঘ বলল, "করি বৈ কি। আমরা বাঘ, আমরা অন্তরে বাহিরে বাঘ, কিন্তু তুমি অন্তরে গাধা বাইরে বাঘ।

গাধা বলল, "তুমি সভ্য সমাজে বাস করনি, তাই ও রকম বলছ। তুমি নিতান্তই জানোয়ার, ষোল আনাই পশু, তাই হয় তো এ রকম বিশুদ্ধবাদী হয়েছ। কিন্তু মানুষের সমাজে বাস করে সমস্ত বিষয়েই আমরা নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী লাভ করেছি।"

বাঘ বলল, "তার মানে ভেজালকেই তোমাদের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছ।"

গাধা বলল, "ভেজাল কথাটা এ ক্ষেত্রে ভালগার। আদর্শের চরম অপব্যবহার হলে তখন এ কথাটি ব্যবহার করা চলে। আমরা ভেজাল বলি না, বলি মিশ্রণ। সঙ্গীতে শিল্পে পোষাকে আচারে ব্যবহারে আমরা বিভিন্ন রীতির মিশ্রণকে নতুন সৃষ্টির নিদর্শন বলে মেনে

নিই, কিন্তু চালে পাথর আর ঘিতে চর্বি মেশালে তাকে বলি ভেজাল।”

বাঘ হেসে বলল, “এ সব তো নিতান্তই বাইরের জিনিস, কিন্তু তোমরা জীবনেই যে এই কুৎসিত নীতিটি প্রয়োগ করে চলেছ?”

গাধা জিজ্ঞাসা করল, “কি ভাবে?”

বাঘ বলল, “তোমরা মনে এক, কথায় এক।”

গাধা বলল, “আমরা নই, মানুষেরা। কিন্তু মানুষের ঐটেই তো বৈশিষ্ট্য, আর তার শক্তির মূলও তাই। আমরা তাদের সঙ্গে বাস করে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছি।”

বাঘ বলল, “মানুষকে আমরা সেই জন্যেই ঘৃণা করি। তারা সেই কারণেই আমাদের খাদ্য তালিকাভুক্ত।”

গাধা একটু দুঃখিত হয়ে বলল, “মানুষকে তোমরা ভুল বুঝেছ, তাদের মতো স্নেহমমতা”—

বাঘ বাধা দিয়ে বলল, “তাদের স্বার্থপরতার ওটা ছদ্মবেশ। আমি বহু মানুষের রক্ত খেয়ে দেখেছি।”

গাধা বলল, “তাতে তাদের পরিচয় পেলে কি করে?”

বাঘ বলল, “রক্তেই তাদের পরিচয়।”

গাধা বলল, “কি রকম?”

বাঘ বলল, “সবাই একটা ক’রে মুখোশ পরে বেড়াচ্ছে, যে যা নয় তাই সে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত। যে বাইরে সাহসী সে অন্তরে ভীরু, যে বাইরে সাধু সে আসলে চোর।—এ রকম কত যে দেখেছি।”

গাধা বলল, “আমি বলি ওটাই তার বৈশিষ্ট্য, তার স্বভাবের বৈচিত্র্যও ঐখানে। তুমি মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় কখনো পাবে না, সে এক মহা রহস্য। মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় জানে না, কারণ সাধুতা অসাধুতা ন্যায় অন্যায় কথাগুলো আপেক্ষিক, ক্ষেত্রভেদে অর্থ

করতে হয়, এবং কোনো অর্থই absolute নয়। তার মন অত্যন্ত জটিল, তার আদি অন্ত নেই, আর এই জটিলতাই তাকে শিল্পীতে পরিণত করেছে। হয় তো জান নাটক, মানুষদের একটি বড় শিল্প, অভিনেতারা সম্মানীয় শিল্পী। অথচ অভিনয় ছলনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে মানুষ অন্তরে বাহিরে এক, সে হয় দেবতা না হয় পশু। সে অভিনয় করতে পারে না। ভিখিরী ভিখিরীর, রাজা রাজার অভিনয় করতে পারে না। আমি গাধা, আমি গাধার অভিনয় করতে পারি না, সেই জন্যেই আমি বাঘের ভূমিকায় নেমেছিলাম। তুমিও বাঘের অভিনয় করতে পারবে না—গাধার ভূমিকা চেষ্টা করে দেখতে পার।"

বাঘ এই শেষের কথাটিতে হঠাৎ বড়ই অপমানিত বোধ করল, কিন্তু মনের ভাব চেপে গিয়ে তার শেষ প্রশ্নটি গাধাকে জিজ্ঞাসা করল—বলল—"মানুষের মধ্যে কোন গুণটি তোমার কাছে বড় মনে হয়েছে সেই কথাটা তোমার মুখে শুনতে চাই।"

গাধা একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার কাছে তাদের সবচেয়ে যে গুণটি বড় মনে হয়েছে—এবং আমি যাতে মুগ্ধ হয়েছি"—

বাঘ অধীর হয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি বল।"

গাধা বলল, "অবশ্য এটি আমার ব্যক্তিগত মত,—আমার মনে হয় এক মানুষ আর এক মানুষকে যে এক্সপ্লয়েট করে এইটিই তাদের সবচেয়ে বড় গুণ।"

বাঘ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল এ কথা শুনে। গাধাকে আক্রমণ করবে বলে এতক্ষণ সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু এই কথাটিতে ঘাবড়ে গেল। ঘাবড়ে গেল গাধার বিশ্লেষণী শক্তিতে, তার অভিজ্ঞতায়। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকে অন্যপথে আক্রমণের চেষ্টা দেখতে লাগল। গাধার পূর্বকথারই জের টেনে অবশেষে বলল, "তুমি আমাকে গাধার ভূমিকায় নামতে বলছিলে না?"

গাধা বলল, "নামলে সফল অভিনয়ে নাম করতে পারতে।"

এই কথাটিতে বাঘের মাথা আবার গরম হয়ে উঠল, সে নিজের মধ্যে আবার ব্যাঘ্রত্ব অনুভব করতে লাগল। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলল "অল রাইট, আমি গাধাই সাজব, অতএব চামড়া দাও"—এবং বলেই গাধার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

গাধা মৃত্যুর পূর্বে শুধু এই অনুতাপ করে মরল যে সে সত্যই গাধা।

(পূর্ণিমা ১৯৪৭)

উদ্দেশ্যমূলক গল্প

আর্ট মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকবে এইটে ছিল আমার সুদৃঢ় মত। কিন্তু সম্প্রতি একটি ঘটনায় আমার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি।

একটি সর্বমানবচিত্তরঞ্জনকারী এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-বিহীন আর্ট এতদিন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

যাদুবিদ্যার আর্ট। অর্থাৎ যাদুবিদ্যা।

এই আর্ট পাট চাষে সাহায্য করে না, দুর্ভিক্ষে অন্নদান করে না, শুধু মনকে খুশি করে। আর্ট যে উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া উচিত সেই যুক্তির প্রথম ধারাটি যাদুবিদ্যা থেকেই আমার মনে প্রথম প্রবাহিত হয়, এবং এই আর্টই একদিন হঠাৎ আমার সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন আর্টের সপক্ষে আমার মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়।

যাদুবিদ্যার দুটি রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। যে যাদুকর রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে পকেটের পয়সা টিকিট-ঘরের মারফৎ মারেন, তিনি বিশুদ্ধ আর্টের স্রষ্টা। আর যিনি কোনো ভূমিকা না ক'রে ক্ষিপ্র অঙ্গুলিচালনার সাহায্যে সোজাসুজি পকেটে হাত দিয়ে পয়সা মারেন, তিনি উদ্দেশ্যমূলক আর্টের স্রষ্টা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টটি নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর।

এ কথা বলছি এই জন্যে যে আমার নিজেরই পকেট কিছুদিন আগে মারা গেছে।

পকেটে পয়সা ছিল না, ছিল একটি ফাউণ্টেন পেন, সেইটি আমি হারিয়েছি।

উক্ত কলম কেনা উপলক্ষ্যে দুঘণ্টার মধ্যে আমি দুটি পকেটমারের সংশ্রবে এলাম। একটিকে আমি স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়েছি, আর একজনকে প্রশ্রয় দিতে পারিনি। যাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি তিনি হচ্ছেন কলমের বিক্রেতা। তিনি বলেছিলেন কলমের আসল দাম পঁচিশ টাকা, কিন্তু বাজারে পাবেন না, যদি আপনার দরকার থাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হবে।

আমার দরকার ছিল।

ক্ষমাও তাঁকে করেছি। কিন্তু কলমটি পকেটে নেবার দুঘণ্টার মধ্যেই বাস্-এর মধ্যে কৌশলী হাতের বিদ্যায় সেটি হারিয়েছি। হাতকে ক্ষমা করা অসম্ভব।

ঘটনাটা খুলেই বলি।

পূজোর কয়েক দিন আগের ঘটনা। কলকাতার মহা হত্যাযজ্ঞের শেষ হয়েছে, কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস দূর হয়নি। হিন্দুভ্রাতৃত্ব-বোধে তখন হিন্দু-পাড়া উদ্বুদ্ধ। পরিচিত অপরিচিত সবাই তখন সবার নির্ভর, সবাই সবার পরমাত্মীয়।

সন্ধ্যার শেষ বাস্‌খানায় উঠলাম শ্যামবাজারের বাস্-প্রান্ত থেকে। ভিড় অত্যন্ত বেশি। সেই ভিড়ই তো সেদিনকার মনের বল এবং ভরসা। গায়ে গায়ে নিবিড় ভাবে সংলগ্ন সব আপন জন। বন্ধুত্বের নতুন অনুভূতি, নতুন স্বাদ। বেশ নিশ্চিন্ত মনে, অত্যন্ত উদার চিত্তে বন্ধুদের ধাক্কা সহ্য করছি। একজন ডান পায়ের জুতোর উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিন হ'লে ঝগড়া বেধে যেত, কিন্তু সে দিন মনে

হ'ল দাঁড়াবেই তো, আজ বিপদের দিনে বন্ধুর পা রাখবার জায়গা করে দিতে আমার একখানা পা যদি যায়, যাক।

মিনিট পাঁচেক পরেই নামবার সময় হ'য়ে এল। পুরনো অভ্যাস-বশত বুক-পকেট কনুইয়ে চেপে রেখে ভিড় ঠেলে নামবার চেষ্টা করছি এমন সময় এক বন্ধুর হাত দরজার সম্মুখে প্রসারিত হয়ে আমাকে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করল। আমি যত দরজার দিকে যেতে চেষ্টা করছি, হাতও আমাকে তত বেশি ঠেলে রাখছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন হস্তাধিকারী বিপন্ন হয়ে ঐ রকম করছেন। আমার বুক পকেটের উপর আমার বাঁ হাতের চাপ না থাকলে এই ঠেলাঠেলির ব্যাপারটি যে আদৌ ঘটত না, সে কথা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু বুঝেও করবার কিছু ছিল না। নির্দিষ্ট জায়গায় না নামলে বিপজ্জনক পথে সেই সন্ধ্যায় আর কোথায়ও নামবার জায়গা নেই, সুতরাং আমাকেও এগোতেই হবে। এমনি অবস্থায় হস্তাধিকারী নিজেই যেন টাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমার ডান হাত মাথার উপরকার রড থেকে খুলে গেল, তখন বাঁ হাত তুলে পাশের লোকটিকে ধ'রে ফেললাম পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। তখনই দেখি নেমে যাবার পথে আর কোনো বাধা নেই। সেই মুহূর্তে পকেটেও স্পর্শ অনুভব করে-ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কলমটি হস্তান্তরিত হ'ল, ক্ষিপ্র হাত-খানাও যেন একটু দেখেছিলাম, এবং সে হাত হিন্দুরই হাত—আমাদের সাম্প্রদায়িক বিপদের পরম নির্ভর হাত কিন্তু নবজাগ্রত আত্মীয়তা-

বোধ মন থেকে অতর্কিতে তাড়ানো সহজ নয়, ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই বেশ কিছু দেরি হ'ল। তা ছাড়া পেন-রক্ষার চেয়েও প্রাণ-রক্ষার তাগিদ তখন বড় হয়ে উঠেছিল।

নগদ পঁয়তাল্লিশটি টাকা চুরি গেলে এত দুঃখ হ'ত না। ধাক্কায় ধাক্কায় আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় ক'রে ফেলে আমারই চোখের সম্মুখ থেকে আমার কলমটি মেরে নিয়ে গেল এতে একটা পরাজয়ের হীনতা অনুভব করলাম।

মনটা অতিমাত্রায় বিবিয়ে উঠল।

যিনি চুরি করলেন তাঁর চেহারা আমার মনে আছে। শ্রদ্ধেয় ভদ্র-লোকের চেহারা—যে জন্যে উল্টে তাঁকে চোর বলা গেল না।

ক্ষতিটা সামলে নিলাম, কিন্তু ঐ পরাজয়ের অপমান ভোলা অসম্ভব হ'ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে লোকটিকে হাতে হাতে ধরা গেল না।

দিনের পর দিন আত্মধিক্কারের মাত্রা বাড়তে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত বাস্-এর মধ্যে যে কোনো একটি পকেট-মারকে ধ'রে এর শোধ তুলব এই প্রতিজ্ঞা ক'রে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মনকে সান্ত্বনা দেবার এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

আমার একটি পুরনো ভাঙা অব্যবহার্য ফাউণ্টেন পেন ছিল। কিছু-দিন হ'ল কলমটিকে কে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তার মাথার ক্যাপটি তখনও পড়ে ছিল। ভাবলাম শুধু ঐটি পকেটে এঁটে বাস্-এ বসলেই চোরের হাত এগিয়ে আসবে। পরিকল্পনাটি খুবই চমকপ্রদ মনে হ'ল।

কিন্তু একদিন দুদিন তিনদিন যায়, কিছুই হয় না। ইচ্ছে করে ভিড়ের মধ্যে বুক ঠেলে চলি, কিন্তু কোনো হাতের স্পর্শই পাই না।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন শ্যামবাজারের মোড়ে বাস্ থেকে নামতেই এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে কোথেকে শুনেছে আমার নতুন

কলমটি চুরি গেছে! আমাকে দেখে সে কলম নিয়ে কি ভাবে পথ চলতে হয় তার বিস্তারিত উপদেশ শুরু করতেই আমি তাকে থামিয়ে সব খুলে বললাম এবং আমার পরবর্তী চোরধরা ফাঁদের পরিকল্পনাটিও তার কাছে গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করলাম।

বন্ধু বলল, কলমের শুধু ক্যাপটি পকেটে নিয়ে ঘুরবে তার জন্তে?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ঘুরব মানে? ঘুরছি তো আজ পাঁচ দিন।

বন্ধু আমার পকেটের দিকে চেয়ে বললেন, কৈ পকেটে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না?

মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলাম। পকেটের দিকে চাইবার সাহস হ'ল না, হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখলাম পকেট সত্যই শূন্য!

হঠাৎ চিন্তামূঢ় ভাবে বন্ধুকে বললাম, চল ঐ চায়ের দোকানটায় একটু বসা যাক্।

দ্বিতীয় পরাজয়ের গ্লানিতে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে চা খেলাম। বন্ধু আমাকে অবিরত তিরস্কার করতে লাগল।

তারপর চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে দেখি মানিব্যাগটিও নেই।

(পাথেয়, ১৯৪৬)

একটি রূপকথা

চার দিকে নিবিড় অরণ্য। সেখানে মানুষের চিহ্ন নেই। প্রাচীন আদিম অরণ্য পর্বতশ্রেণীর সানুদেশ রহস্যাবৃত করে রেখেছে।

সেই অরণ্য ভেদ করে যেতে হবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

যেতে হবে হিংস্র জন্তুর সীমানা দিয়ে—সিংহ বাঘ সাপের অন্ধকার রাজত্ব দিয়ে।

যেতে হবে পাখীদের কলগান-মুখরিত রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকার উপর দিয়ে।

তার পর শুরু হবে পর্বতারোহণ পালা।

একটার পর একটা পাহাড় পার হতে হবে। তার পর আরও পাহাড়, আরও পাহাড়। যেতে হবে শীতের দিনে শত শত শূন্য শুষ্ক পাহাড়িয়া নদীপথের উপর দিয়ে, পূর্ণদেহা খরস্রোতা নদীগুলির সগর্জন অভিযান অগ্রাহ্য করে।

তার পর আরও উপরে, আরও উপরে—যেখানে পাহাড়ের চূড়াগুলি মাথা তুলেছে নীল আকাশের দিকে, যেখানে মেঘ-শিশুরা লুকোচুরি খেলছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, যেখানে শৃঙ্গ দলের বায়ু-প্রবাহহীন প্রস্তরকারাগারে শাদা মেঘেরা হয়েছে বন্দী। যেতে হবে মেঘের সেই নীল বাষ্পাচ্ছাদিত বিপদসঙ্কুল পথে।

 মারেক লেক্কে

তার পর আরও একটি পাহাড়, আরও একটি। তার পর হিম বায়ুমণ্ডল। একটু উপরে চাইলে দেখা যাবে শুভ্র তুষারের সীমাহীন বিস্তার।

ঠিক তার নিচেই প্রশস্ত পাষাণ-প্রাসাদ।

সেই প্রাসাদে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা।

ঐ যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছে এক রাজপুত্র। বিষণ্ণ মুখ, ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন চরণ। জীবন মৃত্যু কি তার কাছে আজ একই অর্থ বহন করছে? আনন্দ এবং বেদনার মাঝখানে কি সে আজ দিশাহারা হল?

বিপজ্জনক পথে তার পদপাত অসাবধান।

তার দৃষ্টি উদাস।

কিন্তু যেদিন সে এখানে এসেছিল সেদিন তার অবস্থা এ রকম ছিল না। সেদিন তার মনে ছিল উজ্জ্বল আশার দীপ্তি, তার চোখে ছিল মধুর স্বপ্ন, দেহে ছিল বিপুল শক্তি। দুর্লভের আকাঙ্ক্ষায় সে ছুটে এসেছিল অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড় উত্তীর্ণ হয়ে এই নিঃসঙ্গ নির্জন দুর্গম প্রাসাদে; কিন্তু আজ ব্যর্থতার নৈরাশ্যে তার সকল শক্তি, সকল উৎসাহ চূর্ণ। তার উজ্জ্বল দৃষ্টি আজ ঝাপ্‌সা।

রাজকন্যার ঘুম সে ভাঙাতে পারল না!

রাজকন্যা তার অসামান্য রূপ নিয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন, পাশে সোনার কাঠি, কিন্তু তার স্পর্শে সাড়া দিল না। রাজপুত্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল।

দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা, প্রভাতারুণের প্রথম করস্পর্শে, নভোনীলিমার পটভূমিকায় যে অপরূপ স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, রাজকন্যা যেন তারই প্রতিচ্ছবি। পাষাণ-প্রাসাদের কোমল নীল শাড়ীপরা রাজকন্যার তপ্তকাঞ্চন কান্তির তরঙ্গায়িত ইঙ্গিত যেন কাঞ্চনজঙ্ঘারই জীবন্ত ক্ষুদ্র অনুকরণ। তার সুপ্ত সত্তা শুধু নিশ্বাসের তালে তালে আন্দোলিত, চেতনার স্পর্শে তা জেগে ওঠে না। কিন্তু যদি হঠাৎ উঠত!

কিন্তু হায়, বৃথা কল্পনা! রাজকন্যার ঘুম ভাঙল না।

কত রাজপুত্র জীবন তুচ্ছ করে কত দুস্তর সমুদ্র, কত দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে এসে পৌঁছেছে এই প্রাসাদে, কিন্তু তারা সবাই একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

নিকটবর্তী কোনো উচ্চতর গিরিচূড়ায় উঠে দেখা সম্ভব হলে দেখা যেত, সেই সব রাজপুত্রের অনেকেই এখনও পাহাড়-পথে নামবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মতো। কেউ বা ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে পাথরের উপর।

কেটে গেল আবও কিছু দিন। ইতিমধ্যে কোন্ হতাশ বাজপুত্র নিষ্ফল সোনার কাঠিটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তার পর যারা এসেছে তারা রাজকন্যার পাশে বসে শুধু প্রার্থনা জানিয়েছে, কেউ বা সঙ্গে এনেছে বৈদ্য। কিন্তু কেউ ঘুম ভাঙাতে পারেনি রাজকন্যার। হতাশায় কত রাজপুত্র পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

তার পর বাস্তব রাজকন্যা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে রূপকথার রাজকন্যায়। তাকে ঘিরে কত কাহিনী রচিত হয়েছে লোকের মুখে মুখে। কেউ বলেছে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে রাজকন্যা ঐ একই ভাবে ঘুমিয়ে আছে। কেউ সন্দেহ করেছে, দেবতা ওর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে ভুলে গেছে।

যুগে যুগে এই রাজকন্যার কাহিনী শুনেছে বসে পৃথিবীর ছেলে-মেয়েরা।

তার পর এসেছেন ঐতিহাসিক। এই রূপকথার মূলে কোনো সত্য আছে কি না যাচাই করে গেছেন তাঁরা। রাজকন্যা স্থান পেয়েছে ইতিহাসে।

ইতিমধ্যে কত যুগ পার হয়ে গেল, পৃথিবীর চেহারা গেল বদলিয়ে, কত ইতিহাস লেখা হল নব নব যুগের, কিন্তু রাজকন্যাকে আজও ভোলা গেল না।

অবশেষে এক অভাবনীয় ঘটনায় রাজকন্যার চিরনিদ্রার পালা হল শেষ।

কাহিনী সংক্ষিপ্ত কিন্তু রোমাঞ্চকর।

এক দুঃসাহসী বাঙালী যুবক যাত্রা করল রাজ-কন্যার প্রাসাদের পথে। যুগ যুগ ধরে অভিযান চলেছে সেখানে, কিন্তু বাঙালী অভিযাত্রী এই প্রথম। সে ভাগ্যান্বেষী চতুর বাঙালী, কয়েক বছর ধরে সে বুদ্ধি-বলে বহু কাজেই সাফল্য লাভ করেছে, তাই তার ধারণা, রাজকন্যাকেই বা সে জাগাতে পারবে না কেন? শুভ-দিন দেখে সে রওনা হল, কিন্তু এবারে সে শুদ্ধমাত্র বুদ্ধির উপরেই ভরসা না করে হাতে একটি সর্বসিদ্ধি কবচ (বিশেষ ফলপ্রদ, মূল্য ৭৫০৲) বেঁধে নিয়ে অরণ্য-পথে প্রবেশ করল। তার কাঁধে একটি বড় থলে, তার মধ্যে কিছু কাগজ-পত্র, কিছু খাদ্য এবং পথের মানচিত্র।

বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পৌঁছল এসে সে সেই রাজকন্যার পাষাণ-প্রাসাদে। স্তম্ভিত হল সে রাজকন্যার রূপ দেখে। প্রাসাদ-কক্ষের আকাশ-রঙা পরিবেশে অদ্ভুত স্বপ্ন, অপূর্ব মাদকতা! তার সম্মুখে চোখ-ঝলসানো হীরা-খচিত লৌহ-কাষ্ঠের পালঙ্কে ভেলভেটের বিছানায় কাঁচা সোনার একটি দেহ পড়ে আছে—জীবন্ত দেহ, শুধু চেতনাহীন!

বাঙালী যুবকের বিমূঢ় ভাব কেটে যেতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল, তার পর সে ভাবতে লাগল কি করা যায়। সে রাজকন্যার কানে কত কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল, তার হাত ধরে কত মিনতি জানাতে লাগল, কিন্তু কোনো ফল হল না। যে ভাবপ্রবণতা বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং যা এই যুবকের মধ্যে কোথায় কোন্ অতলে অস্তিত্ব গোপন রেখেছিল, তা তার নিজেরই এত দিন জানা ছিল না। সে রাজকন্যার রূপে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল, তার মেঘবর্ণ চুলের শোভায়, তার মুদিত চক্ষু-পল্লবের রহস্যপূর্ণ শোভায়, তার ধনু-আকৃতি ভ্রূযুগলের শোভায়, তার ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ পল্লবপক্ষ্মের শোভায়, যে সে নিজেই চেতনাহারা হয়ে রাজকন্যার পাশে লুটিয়ে পড়ল।

সুদীর্ঘ একটি দিনের পর তার ঘুম ভাঙল ধীরে ধীরে। ঘুম থেকে উঠেই সে বুঝতে পারল ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে এক খণ্ড পাঁউরুটি বের করতে ব্যাগের ভিতরকার অনেক কিছুই ছড়িয়ে পড়ল বিছানায়, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বাঙালী যুবককে বিস্ময়ে অভিভূত করে রাজকন্যা চোখ মেলে চাইল।

বাঙালী যুবক আনন্দে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলল, রাজকন্যা জেগেছ? রাজকন্যা জেগেছ?

রাজকন্যা উঠে বসল। বলল, হ্যাঁ, জেগেছি, আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?

নিশ্চয় নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি কেন ঘুমিয়ে ছিলে, আর কেমন করে জাগলে?

রাজকন্যা একটু ভেবে বলল, সে আমার কিছু মনে পড়ছে না এখন। —বলতে বলতে রাজকন্যা ব্যাগ থেকে পড়া এক খণ্ড ভাঁজ করা কাগজ হাতে নিয়ে বাঙালী যুবককে দেখিয়ে বলল, বোধকরি এই কাগজের স্পর্শেই আমি জেগেছি।

যুবক খপ করে সেখানা নিয়ে দেখল—সেখানা সে কিছু দিন আগে বিহার থেকে সংগ্রহ করেছে।—বিশ হাজার মণ চিটে গুড়ের পারমিট।

যুবক বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কত রাজপুত্র তোমাকে জাগাতে চেষ্টা করেছে—অথচ—

রাজকন্যা মৃদু হেসে বলল, জমিদারী প্রথা লোপ পেতে বসেছে, নির্বোধ রাজপুত্রদের কি দাম থাকবে এর পরে? তাই আমি জাগিনি। জেগেছি চতুর বুদ্ধির স্পর্শে। যে ব্যক্তি আজকের দিনে বিশ হাজার মণ চিটে গুড়ের পারমিট সংগ্রহ করতে পারে তার বুদ্ধির কাছে রাজকন্যাকে নত হতেই হবে, তার পারমিটের স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যা জাগতে বাধ্য।

বাঙালী যুবক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিগলিত হয়ে শুকনো পাঁউরুটি চিবোতে লাগল। সম্মুখে পড়ে রইল চিটে গুড়ের পারমিট।

(বসুমতী, ১৯৪৮)

স্বাধীনতার প্রথম রূপ যে এমন বিপজ্জনক, তা কি আমরা আগে কেউ ভেবেছি? বৃন্দাবন কি ভেবেছিল? কিন্তু ১৫ই অগষ্ট যত কাছে আসতে লাগল, ততই সেই রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পূরো একটি বছর ধরে স্বাধীনতা দাঙ্গার প্রথম দফা আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় দফা বঙ্গ-বিভাগের পর থেকে শুরু হবে এ কথা কে না জানে? ঐ দিন থেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তো কচুকাটা হয়ে যাবে। খবরের কাগজেও সে কথা লিখছে দিনের পর দিন। পাড়াগাঁ থেকে দলে দলে হিন্দু পালাচ্ছে। এমন অবস্থায় দুর্দান্ত সাহসী লোকটিও সবাইকে সাহস দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবার পাঠিয়ে দেয় বাইরে। পালিয়ে যাবার প্রেরণার অভাব থাকে না। খবরের কাগজে একটি পরিবারের স্থানত্যাগের খবর এমন ভাবে ছাপে, যাতে মনে হয় একশো পরিবার পালাচ্ছে, এবং সে-খবর প'ড়ে পাঁচশো পরিবার পালায়। তারপর ঐ পাঁচশো পরিবারের খবর ছাপা হয় পাঁচ হাজার ব'লে—এবং তাতে দশ হাজারের বাস্তু ত্যাগ সহজ হয়ে আসে।

১০ই অগষ্ট। পূর্বপাকিস্তানভুক্ত বৃন্দাবন কলকাতার এক মেসে খবরের কাগজ সম্মুখে ছড়িয়ে নিয়ে একটার পর একটা বিড়ি টেনে

চলেছে। রবিবার, অফিসে যাবার তাড়া নেই, উপরন্তু গত এক সপ্তাহের পূর্বশ্রুত এবং অশ্রুতপূর্ব যাবতীয় গুজব আজ রীতিমতো ছাপার অক্ষরে বিভীষিকার মূর্তি ধ'রে সম্মুখে হাজির।

কি করা যায় ?

দেশের বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলে মেয়েরা। ১৫ই অগষ্ট তো নির্ঘাৎ মৃত্যু। যদি পরিবার না থাকে, তাহলে বৃন্দাবনের ভবিষ্যৎ কি ? কার জন্যে আর সে কলকাতার মেসে কষ্ট ক'রে থাকবে ?…

কিন্তু বাঁচানোই বা যায় কি ক'রে ? পাঠানোর জায়গা নেই কোথায়ও। শ্বশুরবাড়িটিও আবার ঠিক পূর্ব-পাকিস্তানেই। সীমানা নির্ধারণে দু'চারটে থানা টানাটানি হ'লেও শ্বশুরবাড়িটিকে তো কোনো-মতেই পাবনা থেকে চব্বিশ পরগণায় আনা যাবে না। এই শ্বশুরবাড়ি ভিন্ন বৃন্দাবনের যে আর কোনো আত্মীয় বাড়িই নেই।

আচ্ছা, মেসে যারা থাকে তারা কি তাদের সব পরিবার মেসে আনতে রাজি হবে না ? তা'লে সেও চেষ্টা করতে পারত। ঘরগুলো দু'ভাগে ভাগ ক'রে একদিকে পুরুষরা আর একদিকে মেয়েরা—সে মন্দ হয় না। কিন্তু কলকাতায় আনা কি সহজ কথা ? বিপদ তো এখানেও কম নয়। তা ছাড়া আর সবাই রাজিই বা হবে কেন ? তাদের পরিবারবর্গ সুখেই আছে, নইলে তারা এত নিশ্চিন্ত থাকত না।

ভাবতে ভাবতে বৃন্দাবন যখন কোনো দিকেই কোনো আলোর রেখা দেখতে পেল না, তখন তার সমস্ত চুল হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল, খবরের কাগজের পূর্ববঙ্গীয় খবরের শিরোনামাগুলো চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল, তার বিড়ি বারবার নিবে যেতে লাগল, তিন চারটে ক'রে দেশালাইয়ের কাঠি খরচ হতে লাগল প্রত্যেকটির পিছনে।

এইভাবে পুরো একটি ঘণ্টা কাটার পর মাথার চুল কিছুটা শান্ত হল। কারণ ইতিমধ্যে একটি সমাধান তার মাথায় এসে গেছে।

অফিসে যখন ক'দিন ছুটি আছে, তখন সে চরম সঙ্কটের দিনটি দেশে গিয়েই কাটাবে। যদি মরতে হয় একসঙ্গে মরাই ভাল।

বৃন্দাবন অতি সতর্কতার সঙ্গে, একটাকা দামের একটি ক্যানভাসের থলে বাঁ-পাশে ঝুলিয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলো পার হয়ে শিয়ালদ গিয়ে পেঁছিল।

১৫ই অগষ্ট এল এবং গেল। দেশে কোনো গোলমালই হয়নি। বৃন্দাবন সঙ্গে একখানা খবরের কাগজও নিয়ে গিয়েছিল এবং তা থেকে সবাইকে বেছে বেছে দরকারী খবরগুলো পড়েও শুনিয়েছিল, কিন্তু কোনোটাই জমল না। সম্পূর্ণ নিরাপদে ১৫ই অগষ্ট কেটে গেল। পরদিনও নিরাপদে কাটল।

১৭ই অগষ্ট। বৃন্দাবন খুশি মনে কলকাতা ফিরছে। অবশ্য এ খুশিভাবটা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এর পর কলকাতার মেস পর্যন্ত যেতে আত্ম-রক্ষার বড় প্রশ্ন আছে। শহরে থাকলে পরিচিত পথে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার বেশ একটা অভ্যাস হয়ে যায়, কিন্তু শহরে যে অবস্থা সে দেখে গেছে তাতে বাইরে থেকে ফিরে এসে স্টেশন থেকে শহরে ঢুকতে গা ছম ছম করবেই। সুতরাং বৃন্দাবন বেশ একটু ভীত-ভাবেই সার্কুলার রোডের দিকে পা বাড়াল। বিশেষ করে সময়টা হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা।

দুরু দুরু বুকে নানা শ্রেণীর দেবতার নাম মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে বৃন্দাবন এসে দাঁড়াল সার্কুলার রোডে। এইখান থেকে চোখ-কান বুজে একবার বৌবাজার ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়তে পারলেই হয়। তার পরের গলিগুলো তার জানা আছে। কিন্তু সার্কুলার রোডকে তার মনে হল যেন বর্ষাকালের পদ্মানদী। তার বিস্তার যেন সীমাহীন। এত দীর্ঘ পথ তাকে পার হতে হবে এক নিশ্বাসে। এ পথের অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যে একদিন হয়েছে। সে আজ এক বছরের কথা, তখন বন্দেমাতরম্ আর আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে কলকাতা কাঁপছিল।

বড় বিপদে পড়েছিল সে একদিন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির প্রতিধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখে, একদল মুসলমান ছুটে আসছে তার দিকে। তখন সবে সে "বন্দে"—টুকু উচ্চারণ করেছিল, বিপদ আসন্ন দেখে কোনো কাল্পনিক লোককে "বন্দে আলি" "বন্দে আলি" বলে ডাকতে ডাকতে বিদ্যুৎ-বেগে এক গলিতে ঢুকে প্রাণরক্ষা করেছিল। "বন্দে-আলি" শুনে আক্রমণকারীরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। আত্মরক্ষার জরুরি তাগিদে অনেক সময় তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাগে।

কিন্তু এ কি! একদল মুসলমান না? তাই তো বটে! কিন্তু ওরা যে বৃন্দাবনের দিকেই ছুটে আসছে! সর্বনাশ তো হল! বৃন্দাবন তার সমস্ত বুদ্ধি এবং পায়ের শক্তি তড়িৎ গতিতে আহ্বান করল। একটানে কাঁধ থেকে থলেটি ছুঁড়ে ফেলে দিল পথের উপর। আত্মরক্ষার অদ্ভুত সংস্কার! দু'খানা পায়ে বিদ্যুতের স্রোত খেলে গেল।

বৃন্দাবন বুঝতে পারল সে বৌবাজারের দিকে ছুটছে না। কিন্তু আর তো কোনো উপায় ছিল না। হ্যারিসন রোডের বিপদের কথা সে জানত। কিন্তু তার পা দু'খানাকে তখন থামায় কে?

দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছে বৃন্দাবন, অসম্বৃত হয়ে ছুটছে বৃন্দাবন, পিছনের অনুসরণকারীর পদশব্দে উন্মাদ হয়ে ছুটছে বৃন্দাবন।

একগলি থেকে আর একগলি, সেখান থেকে আর একগলি, এবং কিছু পরেই দেখে, প্রথম যে গলিতে ঢুকেছিল সেই গলিতেই আবার এসেছে ঘুরতে ঘুরতে। এইখানে এক বীভৎস দৃশ্য চকিতে তার চোখে পড়ল। এক বৃদ্ধ মুসলমান এক বৃদ্ধ হিন্দুকে পিষে মারছে। তার

পাশ কাটিয়ে বহু গলি পরিক্রমণ ক'রে যখন সে নতুন পথে এসেছে ভাবছে, তখনই বুঝতে পারল, সে ধাঁধায় প'ড়ে গেছে, দশ মিনিট ধ'রে সে একই পাড়ার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। এটা বুঝতে পারল কারণ ঐ বীভৎস দৃশ্যটিকে ছুটন্ত অবস্থায় সে ইতিমধ্যে অন্ততঃ তিনবার দেখতে পেয়েছে—ঐ একই জায়গায় ঠিক একই ভাবে। দুষ্কার্যটি এখনও শেষ হয়নি, দু'জনেই সমান বলপ্রয়োগ করছে, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না।

কিন্তু বৃন্দাবনের আত্মরক্ষার তাগিদ যত উগ্রই হোক, তার দৈহিক শক্তির একটা সীমা আছেই। ইতিমধ্যে সে তার শেষ উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করেও কোনো ফল পায় নি। তার পকেটে যে মনিব্যাগ ছিল সেটি পকেট থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল আক্রমণকারীদের উদ্দেশে কিন্তু কোনো ফল হয়নি তাতে। অবশ্য তাতে কয়েক আনা মাত্র পয়সা ছিল।

বৃন্দাবন হঠাৎ সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ল। একেবারে বসে পড়ল পথের উপর। তখনও তার যেটুকু চেতনা অবশিষ্ট ছিল তা একটিমাত্র আবেদনে নিঃশেষিত হ'ল—ধরণী দ্বিধা হও।

এর পর মিনিট পাঁচেকের কথা তার কিছুই মনে নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা অবস্থা নয়, কেমন যেন একটা স্তম্ভিত স্থূল ভাব। মৃত্যুর পূর্বে যেমন হয়। বৃন্দাবন আসন্ন আঘাতের জন্যে অর্ধনিদ্রিতের অবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল বহু মুসলমান তাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে চলেছে, কিন্তু সে এখন সকল সুখ দুঃখের অতীত।

পাশের একটা বাড়ির উপরতলা থেকে কয়েকজন লোক চেঁচিয়ে উঠল, ভদ্রলোক কি?

নিচের থেকে এরা জবাব দিল, হিন্দু।

তখন তারা ছুটে নেমে এল নিচে। এসে বলল, ওঁকে দূরে নিয়ে যাওয়ার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে আসুন। আমরা সারাদিন একটি হিন্দুকে পাইনি।

হিন্দুকে পেয়ে নিস্তব্ধ পাড়ায় একটা সাড়া জেগে উঠল।

এরা বলল, ঠিকই তো, দূরে নেবার দরকার কি, আপনাদের সঙ্গে মিলেই কাজ শেষ করি।

সবাই তখন বৃন্দাবনকে ধ'রে একটা ঘরে তুলে নিল।

বৃন্দাবনের পায়ে কেনো জোরই ছিল না, তাকে সবাই ধরাধরি ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখে, আনন্দ-কোলাহল করতে করতে তার গায়ে গোলাপ-জল ঢালল, সমস্ত গায়ে আতর ছিটিয়ে দিল এবং তাকে জোর ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখেই তার সঙ্গে একে একে সবাই কোলোকুলি করল। তারপর সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—জয় হিন্দ্।

বৃন্দাবনের চোখে আরও একটুখানি আঁধার নেমে এল। সে বসে পড়ে চোখ বুজে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করতে লাগল, আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর—তার অন্তরের অর্ধচৈতন্য তাকে পরামর্শ দিল, ওতে যদি শত্রুর কিছু করুণা জাগে।

কিন্তু আতর মাখানো আর গোলাপ জলে স্নান! এই কি ছোরা বসাবার পূর্ব লক্ষণ?

বৃন্দাবন দম বন্ধ ক'রে আঘাতের অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ আঘাত করল না।

একটি ছোট মেয়ে কিছু সন্দেশ নিয়ে এসে বলল, খান।

খেল বৃন্দাবন প্রাণের ভয়ে, কম্পিত হাতে। কিন্তু শুকনো গলায় মনে হল ধুলো খাচ্ছে।

মুসলমানেরা আবার চেঁচিয়ে উঠল, জয়হিন্দ।

বৃন্দাবন নির্বোধের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইল তাদের দিকে। তারা সবাই হাসছে!

ব্যাপার কি?

ইতিমধ্যে পাড়ার আরও অনেক মুসলমান সেখানে এসে বৃন্দাবনের সঙ্গে কোলাকুলি করল। এই ভাবে মিনিট পনেরো অঙ্গচালনায় এবং মাথায় গোলাপজল পড়ায় বৃন্দাবনের হাত পায়ের বল একটুখানি ফিরে এল। নিচে তখন এক শোভাযাত্রা চলেছে ধ্বনিত করতে করতে—হিন্দু মুসলমান এক হো।

বৃন্দাবনের চোখ একটুখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চিন্তার জড়তাও কেটে গেল অনেকখানি। সব ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হলেও সে নিজের বুদ্ধিতে মোটামুটি এটুকু বুঝতে পারল যে প্রাণের ভয় আর নেই। তাই সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সাহস ক'রে—এবং মুক্ত কিনা পরীক্ষা করার জন্যে দু'এক পা ক'রে দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

কেউ বাধা দিল না।

সমস্ত দিনে একটি হিন্দুকে পেয়ে তখনও অনেকে আসছে তার সঙ্গে কোলাকুলি করতে। বৃন্দাবন এবারে অনেকখানি উৎসাহিত হয়ে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে করতে এগিয়ে চলল।

এবারে সে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য। কিন্তু তবু যেন সব স্বপ্ন।

কিন্তু সেই বীভৎস দৃশ্যটি এখনও ঠিক সেইখানেই! সেই বৃদ্ধ মুসলমান আর হিন্দু এখনও পাশাপাশি-মস্তকে পরস্পরকে চেপে ধ'রে আছে।

বৃন্দাবন কাছে এগিয়ে এসেই বুঝতে পারল, তারই ভুল। এটা হত্যাদৃশ্য নয়। দুই বৃদ্ধ নব মিলন-আনন্দে এত উচ্ছ্বসিত যে চক্ষুলজ্জা বশত কে কাকে আগে ছাড়বে এই সমস্যায় প'ড়ে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

(বর্তমান, ১৯৪৭)

এক ছিল গোরু, সে একদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরে ঢুকে দেখে এক কুকুর তার নৈশাহারের জন্যে রক্ষিত বিচিলির গাদার উপর শুয়ে আছে। তা দেখে গোরু কুকুরকে বলল সরে যেতে, কিন্তু কুকুর গেল না। গোরু দুঃখ করে বলতে লাগল—যা নিজে খাবে না, তা অন্যকেও খেতে দেবে না, এ বড়ই অন্যায়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

মূল গল্পে এইটুকুই মাত্র আছে, কিন্তু এটুকু সম্পূর্ণ গল্প নয়। সম্পূর্ণ গল্পটির চেহারা অন্য রকম।
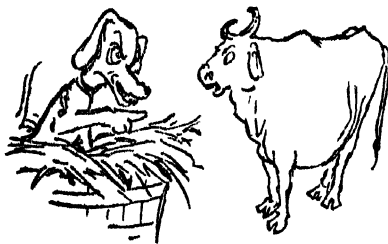
সেই পুরো গল্পটিতে দেখা যায়, গোরু সহজে কুকুরকে ছাড়েনি। সে তার সঙ্গে নানারকম তর্ক করেছে এবং তার অন্যায়টি কোথায় তা বুঝিয়েছে এবং শেষে হতাশ হয়ে বেরিয়ে গিয়ে মানুষকে ডেকে এনেছে বিচারের জন্যে।

কিন্তু তাতে তার কিছু সুবিধা হয়েছিল কি?

আসল গল্পে সেই কাহিনীটিই বর্ণিত হয়েছে।

গোরু প্রথম যাকে ডেকে আনল তাকে দিয়েই গল্প হল শুরু।

সে একজন চাষী, বৃদ্ধ শীর্ণ চাষী।

সে এসে সব শুনে বলল কুকুরের বড়ই অন্যায়। তারপর তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হল।

কুকুর। কেন অন্যায় ?

চাষী। গোরুকে তার ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করছ তুমি।

কুকুর। তাতে আমি অন্যায় করছি না, এবং তোমার মতে যদিও করে থাকি তাহলে জেনো যে, তোমাদের মানুষের সমাজের একটি শক্তিশালী দল আমার পক্ষে আছে।

চাষী। সে আমি জানি না, তুমি অন্যায় করছ, তোমার উচিত ওখান থেকে উঠে যাওয়া।

কুকুর। যদি না যাই ?

চাষী। তা হলে তোমার পাপ হবে।

কুকুর। পাপপুণ্যের পুরনো অর্থ এখন অচল। আর অচল না হলেই বা ক্ষতি কি ?

চাষী। পাপ করলে ক্ষতি নেই ? ভগবান যে অসন্তুষ্ট হবেন।

কুকুর। আমি এখানে শুয়ে যথেষ্ট আরাম পাচ্ছি, আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট, কে অসন্তুষ্ট হল তা ভেবে আমার কি হবে ? কেউ তা ভাবে ?

চাষী। ন্যায় অন্যায় বলে একটা কিছু আছে তো ?

কুকুর। থাকতে পারে। থাকে তো মানুষের বিচারেই আছে। কিন্তু আমি তাদের রীতিনীতি দেখেই বলছি, বোধ হয় নেই। তুমি এসব কথা মানুষের কাছে শুনিয়েছ ?

চাষী কথাটা ভাবতে লাগল।

কুকুর বলল, তুমি কি কাজ কর ?

চাষী। চাষ করি।

কুকুর। কার জমি ?

চাষী। মনিবের।

কুকুর। মনিবের জমি চাষ করে যা পাও তাতে তোমার পেট ভরে ?

চাষী নিরুত্তর রইল।

কুকুর বলতে লাগল, পেট ভরে না আমি জানি। জমি চাষ করে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি পাওয়া উচিত তোমার। এমন কি জমির মালিকই হওয়া উচিত তোমার—তোমাদের গান্ধী মহারাজ বলেছেন এ কথা।

চাষী খুশী হয়ে উঠল কথাটা শুনে।

কুকুর বলতে লাগল, তোমার মনিব তোমার ন্যায্য পাওনা অংশ তোমাকে দিচ্ছে না। অথচ সে যতটা নিচ্ছে ততটা তার দরকার নেই। আর আমিও ঠিক তাই করছি। এই বিচিলি আমার দরকার নেই, কিন্তু তবু আমি তা দখল করে আছি।

চাষী। আমার মনিব তার অন্যায় স্বীকার করে না, তাই তার কাছ থেকে আমার ন্যায্য পাওনা আমি পাই না। কিন্তু তুমি যখন অন্যায় স্বীকার করছ তখন তোমার উচিত গোরুর আহার গোরুকে দেওয়া।

কুকুর। আমি স্বীকার করছি তোমার ভালর জন্যে, গোরুর ভালর জন্যে নয়। তুমি যদি তোমার মনিবকে তার অন্যায় স্বীকার করাতে পার, তা হলে সে এবং আমি একযোগে আমাদের দখল ছেড়ে দেব।

চাষী ভাবতে লাগল।

গোরু অসহিষ্ণুভাবে বলল, তোমাদের মীমাংসা না হলে যে আমি মারা যাই।

কুকুর হেসে বলল, সেটা নতুন কথা নয়। মানুষরাও দলে দলে মারা যাচ্ছে। তাদের কেউ কোথায়ও তাদের হ্যায্য পাওনা পাচ্ছে না। অবশ্য যারা তাদের বঞ্চিত করছে তাদের আমি মানুষ বলছি না। তারা অপাততঃ আমার আত্মীয় কিংবা আমি তাদের।

চাষী কুকুরের কথাগুলো গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে চলে গেল।

হতাশ গোরু পুনরায় বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল আর একজন লোককে। কারণ সে তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেও আশার বিরুদ্ধে আশা করে যাচ্ছে।

এ লোকটি একজন স্কুলের শিক্ষক। বয়সে প্রবীণ, পরিধানে জীর্ণ বাস। সে এসেই বলল, কুকুরের ঘোর অন্যায় এবং তার কথা প্রমাণের জন্যে বহু শাস্ত্রবাক্য আওড়াল।

কুকুর বলল, তোমার নীতি উপদেশ বৃথা হল, শিক্ষক।

শিক্ষক। কেন?

কুকুর। দেখছি তুমি নিজে ক্ষুধায় কাতর। তোমার মতো পুরাতন নীতিবাদে বিশ্বাসী ক্ষুধার্তের জীবন দর্শনের সঙ্গে আমার জীবন দর্শন মিলবে না। তাছাড়া তুমি আত্মপ্রবঞ্চক।

শিক্ষক বিস্মিত হল এ কথায়। কুকুর বলল, তুমি ছাত্রদের বলে থাকো লেখপড়া করলে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু তুমি নিজেই সে কথার প্রতিবাদ। তুমি নিজে লেখাপড়া শিখে সুখী হতে পারনি। তুমি নিজে ক্ষুধার্ত, অথচ খেতে পাও না।

শিক্ষক। খেতে পাইনা কিন্তু আমি অসুখী নই। কারণ আমি জানি হ্যায়ের পথে চলছি।

কুকুর। তুমি জান অধিকাংশ লোক অন্যায়ের পথে চলছে?

শিক্ষক। জানি।

কুকুর। তার প্রতিকার চেষ্টা করেছ কিছু?

শিক্ষক। আমার সাধ্য কি? আমি শুধু নিজে ন্যায়পথে চলাই যথেষ্ট মনে করি।

কুকুর। তুমি আত্মপ্রবঞ্চক। তুমি ভীরু, অক্ষম, তাই তোমার মুখে এই কথা। জান না, অন্যায় সহ্য করা আরও বেশি অন্যায়? সমাজের কোন্ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি রুখে দাঁড়াতে পার?

শিক্ষক ভাবতে লাগল কথাটা।

কুকুর বলতে লাগল, কালধর্ম মান না বলেই তুমি ক্ষুধার্ত।

শিক্ষক। কালধর্ম কি?

কুকুর। চুরি। বিস্তীর্ণ ব্ল্যাকমার্কেট পড়ে আছে সম্মুখে। হয় এর প্রতিকার চেষ্টায় প্রাণ দাও, না হয় ওতে লেগে পড়। মৃতবৎ পড়ে থাকা ন্যায়ধর্ম নয়, কালধর্ম তো নয়ই।

শিক্ষক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কথাটা শুনে।

কুকুর বলতে লাগল, আত্মবঞ্চনা তুমি ইস্কুলেও করছ। ছেলেদের ভুল শেখাচ্ছ। তাদের বই মুখস্থ করাচ্ছ, জ্ঞানকে জাগিয়ে দিচ্ছ না, কারণ তোমার নিজেরই সে ক্ষমতা নেই। অথচ শিক্ষকতার সঙ্গে যদি আজ কাপড়ের ব্যবসা করতে, তা হলে তাতে পেটও ভরত, পড়াতেও পারতে ভাল করে। অনেক শিক্ষক কাপড়ের ব্যবসা করছে। ব্যবসায় বেশি মুনাফা করা কোনো দেশেই পাপ নয়, এদেশেও নয়। পি.সি.রায়ের বক্তৃতা পড়ে দেখো। অজ্ঞানতঃ ঠকানোর চেয়ে জ্ঞানতঃ ঠকানো ঢের ভাল বলেই তোমাকে এসব কথা

বলছি। তুমি অজ্ঞানতঃ ছেলেদের ঠকাচ্ছ, অথচ নিজে অনাহারে আছ। আমি নিজে সজ্ঞানে গোরুকে ঠকিয়ে বেশ আরামে আছি, এবং আমি জানি আমি যুগধর্ম পালন করছি।

শিক্ষক ছটফট করতে লাগল এসব কথা শুনে।

এদিকে গোরুও ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারছে কুকুর ওখান থেকে আর উঠবে না, সুতরাং তার খাওয়াও জুটবে না। তাই সে কম্পিতপদে বেরিয়ে গেল বাইরে—যদি অন্য কোথাও কিছু আহার জোটে। কিন্তু বেরিয়েই দেখে একটি লোক জুড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। দেখে ভয় জাগে, ভক্তি হয়। গোরু মরিয়া হয়ে তার পায়েই গিয়ে লুটিয়ে পড়ল, বলল, প্রভু একটি বিচার আছে।

লোকটি একজন ধনকুবের এবং বণিক। শত শত অধীনস্থ লোকের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং বিচারে তার জন্মগত অধিকার। বিচারের কথায় সে আত্মমর্যাদায় স্ফীত হয়ে উঠল। সাড়া দিল সে গোরুর প্রার্থনায়।

কিন্তু গোরুর ঘরে প্রবেশ করেই সে দেখতে পেল কুকুর অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। কি তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, চোখ দুটি সঙ্কীর্ণতর, এবং তাতে দৃষ্টির তেজ অগ্নির তেজে পরিণত হয়েছে। বণিক সে দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে মূঢ়বৎ চেয়ে রইল কুকুরের নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে। তার চোখ অন্যদিকে ফেরাবার উপায় ছিল না।

এইভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর কুকুরের দৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিশেষ ইঙ্গিতটি ধনিকের চোখের ভিতর দিয়ে অবিরাম প্রবেশ ক'রে তার মর্মস্থানে আঘাত হানতে লাগল। ধনিকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। সে উপলব্ধি করল কুকুর তারই সগোত্র। অতএব কুকুরের বিচারক সে হতে পারে না।—কুকুরকে অপরাধী সে করতে পারে না।

তার মুখে ক্রমশঃ হাসি ফুটতে লাগল, দেখা গেল কুকুরের চোখও খুশিতে উজ্জ্বল।

ধনকুবের গোরুকে সম্বোধন করে বলল আমার বিচার শেষ হয়েছে।

ভীত কম্পিত গোরু প্রশ্ন করল, কি বিচার হল, প্রভু?

ধনিক বলল, কুকুর নিরপরাধ।

ধনিক সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হল, এবং কুকুর এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে গোরুকে বলল, খাও এবারে তোমার বিচিলি। কারণ আমার অপরাধ প্রমাণ করিয়ে আমার কাছ থেকে ওটা তুমি পেতে না, আমি নিরপরাধ প্রমাণ হওয়াতে সহজেই পেলে। এখন এ দান হল আমার অনুগ্রহ দান। আমি এখন চললাম ভাই, এই দানের খবরটি কালই যাতে সব খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় তার বন্দোবস্ত করিগে।

(পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ১৯৪৮)।

দেশের দুর্দশা মোচনের কথা গোবর্ধন গুহ এবং প্রদ্যোত পাল তাদের বয়স চল্লিশের কোঠায় গিয়ে পেঁছিনর আগে পর্যন্ত কখনো স্মরণ করার সুযোগ পায়নি, কিন্তু সুযোগ তারা পেল অপ্রত্যাশিত-রূপে। বাদা অঞ্চলে একটা প্লটে পঁচিশ বিঘে পতিত জমি ওরা নিতান্তই মাটির দরে পেয়ে দেশের দুঃখমোচনের কাজে আত্মোৎসর্গ করবে বলে ঠিক করল। জমিটা পেয়ে গেল ওরা মাত্র পাঁচশো টাকায়।

এই দুই উৎসাহী দেশসেবীকে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো অনেকেই চেনেন না, কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠিত অর্ডার সাপ্লাই কম্পানি—অর্থাৎ গুহ এণ্ড পাল, পোষ্ট বক্স নম্বর ০০১, কলিকাতা—অনেকেরই পরিচিত। এরা অনেকদিন ধ'রেই ক্রেতার আদেশমতো নানা রকম জিনিস সরবরাহ ক'রে দেশবাসীকে সেবা করে আসছে। তার মানে এরা দেশেরই সেবা করেছে এতদিন। তাই জমি পেয়ে এদের প্রথমেই মনে হয়েছে দুর্ভাগা বাংলা দেশের কথা।

এই জমিকে কেন্দ্র ক'রে এদের মাথায় যেসব পরিকল্পনা জন্মলাভ করল তার প্রত্যেকটি দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত। প্রথমত এই জমির উপর একটি বড় পুকুর কাটাতে হবে। তাতে চলবে মাছের চাষ। এই মাছ বাংলার মৎস্য সমস্যাকে বহু পরিমাণে সরল করে আনবে। জমির কিছু অংশে নারকেলের চাষ হবে। সেই নারকেলের

শাঁসে শাঁসহীন বাঙালীর দেহ পুষ্ট হবে। তাছাড়া তরিতরকারী সব্জী প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব মেটাবে। এক অংশে গোশালা প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে দুধ ছানা মাখন এবং ঘি'র অভাব ঘুচবে। ঐ জমিতেই ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা করা হবে। অন্য অংশে হাঁস মুরগী পাঁঠা এবং শূয়োর পালন করা হবে।

বাংলাদেশে খাদ্যেরই অভাব এবং সেই অভাব পুরিপূরণই হবে এদের একমাত্র কাজ। এবং একাজ দেশের কাজ, সুতরাং দেশের সবার সহ-যোগিতা চাই। অর্থাৎ দি গ্রেট বেঙ্গল পরিপুষ্টি কম্পানি লিমিটেডের দশ টাকা মূল্যের শেয়ার দেশবাসীরা যত কিনবেন, তত তাঁরা নিজেদেরই পরিপুষ্টির সাহায্য করবেন। ধনী-দরিদ্র সবাই কিনুন শেয়ার এবং এক মাসের মধ্যে লাখ টাকার লক্ষ্যভেদ করুন।

কিন্তু হায়রে দেশের দুর্ভাগ্য! হায়রে আত্মবিস্মৃত বাঙালী! এই আবেদনে কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু বাঙালীর দোষ দিয়ে লাভ কি? নারকেল জোড়া দু-আনা, রুইমাছ আট আনা সের, ডিম একজোড়া তিন পয়সা এবং দুধের সের তিন-চার আনা। পাঁঠার মাংসের যে লোভ দেখানো হয়েছিল তাও খুব শস্তা এবং যত ইচ্ছা পাওয়া যায়। বাকী থাকে শূয়োর, কিন্তু যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সেদিকে কারো আকর্ষণ আছে বলে মনে হল না। জনসাধারণের তরফে আরও যুক্তি ছিল। তারা দেশসেবী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে তা থেকে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ডিভিডেণ্ড ভোগ করা খুব পছন্দ করতে পারেনি।

ফলে যা হবার তাই হল। অর্থাৎ আটজন ডাইরেক্টর যে টাকার শেয়ার কিনেছিলেন সেই টাকাটা গুহ এণ্ড পাল ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে হজম করার সঙ্গে সঙ্গে কম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং উক্ত পতিত জমির সাহায্যে বাংলাদেশের পরিপুষ্টিবিধানের যে পরিকল্পনা ছিল তাও মাঠে মারা গেল।

মারা গেল না শুধু গোবর্ধন গুহ এবং প্রদ্যোত পাল। তারা আপন হাতে গড়া পতিত জমির স্বর্গে বাস করতে পারল না বটে, কিন্তু পূর্ব অভ্যাস মতো জব চার্নকের গড়া শহরেই নানারকম দালালির কাজ ক'রে আত্মরক্ষা ক'রে চলল। ডাইরেক্টরেরা এদেরই বন্ধু লোক। তারা এদের ব্যর্থতা ক্ষমার চোখে দেখলেন এবং দি গ্রেট বেঙ্গল পরিপুষ্টি কম্পানি লিমিটেডের কথা ভুলে গেলেন।

গোবর্ধন ও প্রদ্যোতও কি ভুলে গেল ? না। আদর্শবাদের ঐখানেই ত্রুটি। কম্পানি গড়ার সময় ঐ যে এক লক্ষ টাকার আদর্শ ওদের মাথায় ঢুকেছিল তা ওদের মস্তিষ্কে স্থায়ী বাসা বাঁধল। ওরা এত বড় একটা পরাজয়ের হাত থেকে আহত অবস্থায় বেরিয়ে এসে পরাজয়ের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করল মনে মনে।

কিন্তু কিই বা করবার আছে শুধু প্রতিহিংসা দিয়ে। ওরা অবিলম্বে কোনো একটা সহজ পথে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ওরা সফল হয়নি। সুতরাং ধৈর্য ধ'রে থাকা ভিন্ন আর উপায় কি ?

এমন সময় এল যুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হঠাৎ আশা জেগে উঠল ওদের মনে, কিন্তু পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেহারা অত্যন্ত কঠোর হওয়াতে ওরা তেমনি হঠাৎ দমে গেল। কিন্তু সবই ঠিক হয়ে গেল অল্প দিনে। শত্রু-বেশে যে এসেছিল সে ছিল তার ছদ্মবেশ। ওরা কদিন পরেই বুঝতে পারল এই কঠোর মূল্য নিয়ন্ত্রণই ওদের সব চেয়ে বড় রক্ষা-কবচ। কন্‌ট্রোলের নিরাপদ আশ্রয়ে ওরা অতি অল্প পরিশ্রমে

দ্রুত কাঁপতে লাগল। সম্পূর্ণ বিনা মূলধনে শুধু দালালি ক'রে ওরা মাত্র ছ'টি বছরের মধ্যে এমন স্ফীত হয়ে উঠল যার ফলে ওদের শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। ওরা রীতিমতো শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল শহরের মধ্যে। ওরা নিজেরা ছিল দালাল, এইবার ওদের দালাল জুটে গেল অনেক। কিন্তু শুধু টাকায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয় একথা স্বীকার করতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের আটকায়। কিন্তু তবু "অর্থমনর্থম্" নিত্য চিন্তা ক'রেও দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা ক্রমশ অর্থকেই সম্মানের মান হিসাবে মেনে চলতে অভ্যস্ত হচ্ছি।

এতে গোবর্ধন এবং প্রদ্যোতের মনেই দুঃখটা বেজেছে সব চেয়ে বেশি। ওরা লোককে যত বোঝায় টাকা কিছু না, আমাদের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ। লোভ কিছু না, আমাদের আদর্শ হচ্ছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" কাড়াকাড়ি নয়, লোলুপতা নয়, প্রশান্তমনে বসে থাকা এবং হাতের কাছে "তিনি" যা নিক্ষেপ করেন প্রসন্নমনে তাই গ্রহণ করা। লোকে ততই এসে টাকার কথা পাড়ে।

ত্যাগের আদর্শ ওদের মনে প্রভাব বিস্তার করার কারণ হচ্ছে যুদ্ধশেষে বাজারের তেজ ও তৎপরতা কিছুটা কমে গেছে, পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং এ পথে ফেরিওয়ালা থেকে শুরু করে যত চুনোপুঁটি সবাই এসে ভিড় করেছে। আর একটা কারণ হচ্ছে ওদের মূল লক্ষ্যবিন্দুকে ওরা বহু পূর্বেই অতিক্রম করে গুহ এণ্ড পালকে দশ লাখের কোঠায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তাই ছোটখাটো অঙ্ক আর ওদের আকর্ষণ করছে না।

কিন্তু এক লাখের লক্ষ্য যদি হঠাৎ দশ লাখের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায় তা হলে লক্ষ্য ভেদকারী কি শুধু সেই কারণেই তার অগ্রগতি থামিয়ে পরম নিশ্চিন্তমনে পরকালের চিন্তা করতে থাকবে?—না। বরঞ্চ

সংসারের রীতি এর বিপরীতিই। কারণ মানুষ নিজের সুপ্ত ক্ষমতা যখন উপলব্ধি করে তখন সেই ক্ষমতার শেষ না দেখা পর্যন্ত তার কোনো শান্তি থাকে না। বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে কাজ করছে এই রীতি। মানুষ একটার পর একটা সত্য আবিষ্কার করে চলেছে, একটার পর একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করে চলেছে, সে কোথায়ও থামতে পারে না। এ চলায় সাময়িক বিরাম আছে, কিন্তু তা পরবর্তী চলাকে আরও বেগবান করার জন্থেই।

কিছুকাল গুহ এণ্ড পালেরও বিরাম নেওয়া প্রয়োজন ছিল। অভাবিত সৌভাগ্যপথে আশাতীত লক্ষ্যে পৌঁছে সাময়িকভাবে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল। নিজেদের শক্তি ওজন করার প্রয়োজন ছিল। এসব শেষ হলে তবে দ্বিতীয় দফা যাত্রা।

ঐ পঁচিশ বিঘে জমির কথা ওদের সবসময়েই মনে হয়েছে। যুদ্ধের মধ্যেও ওটা কোনো কাজে লাগল না। সৈন্যদের ছাউনি কিংবা বিমানক্ষেত্র হিসাবেও যুদ্ধবিশারদেরা ওটাকে আমল দেননি। ও জমি আগেও যেমন পতিত ছিল, এখনও তেমনি পতিত রইল। যুদ্ধ উপলক্ষ্যে কত পতিত লোক কুলীন হয়ে গেল, কিন্তু পতিত জমিকে উদ্ধার করা গেল না, এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আচ্ছা, নিজেরা টাকা খরচ ক'রে কি আগের সেই পরিকল্পনাটা কার্যকরী করা যায় না?

গোবর্ধন বলল, ক্ষতি কি?

প্রদ্যোত বলল, ক্ষতি আছে। কারণ অনিশ্চিত পথে যাবার শিক্ষা আমাদের নেই।

গোবর্ধন বলল, তবু—

প্রদ্যোত বলল, শোন। মুনাফা করার দুটি প্রসিদ্ধ রীতি আছে। এক হচ্ছে ঘরের টাকা খরচ ক'রে মুনাফার অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া,

আর হচ্ছে এক পয়সা খরচ না ক'রে নিশ্চিত মুনাফা ঘরে তোলা। আমাদের মাত্র দ্বিতীয়টিতে অভ্যাস এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অনভ্যস্ত পথে গেলেই আমরা মারা পড়ব। এটি আমাদের সইবে না।

কিন্তু তবু ঘুরে ফিরে ঐ পতিত জমির চিন্তা ওদের মনকে অশান্ত ক'রে তুলতে লাগল। ছ-বছরের জয় ঐ প্রথম পরাজয়টিকে কোনো-মতেই ঢেকে রাখতে পারে না। উপরন্তু মনে হয় ঐ একটিমাত্র কলঙ্ক তাদের সফলজীবনে চিরদিন কাঁটার মতো বিঁধে রইবে, তাতে ওরা শান্তি পাবে না কোনো দিন। উন্নতির পথে চলা যখন শুরু হয়ে গেছে তখন গোড়ার দিকের একটুখানি খুঁৎ রেখে আর লাভ কি? আগুন আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

যুদ্ধের পর থেকে গুহ এণ্ড পাল ভাবছে। ভাবতে ভাবতে ১৯৪৫ কেটে গেল। ১৯৪৬ এল। ভাবনার শেষ হল না। উপরন্তু হঠাৎ ১৬ অগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা শহরে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হল। এমন অবস্থায় আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন, যা পাওয়া গেছে তাই রাখাই দায়, পতিত জমির কথা তখন কে ভাবে?

তারপর কলকাতা শান্ত হতে না হতে আগুন জ্বলল নোয়াখালিতে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল বিহারে। এইভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে সবাই মোটামুটি এই গুরুতর অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পাওনার আশা ছেড়ে, যা আছে, তাকে প্রাণ-পণে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিছু ঘরে এলো না বলে কারো অনুতাপ নেই, শুধু আত্মরক্ষার নব নব কৌশল আবিষ্কারে সবাই বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োগ করছে।

গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে চলছে দেশের স্বাধীনতার আলোচনা।

ভারত ভাগ অনিবার্য হওয়াতে বাংলা আর পঞ্জাব ভাগের জন্যে চলছে জোর আন্দোলন। জিন্না বলছেন পাকিস্তান চাই, অধিবাসী বিনিময় চাই, করিডর চাই। হিন্দু বাংলা বলছে, বঙ্গ-বিভাগ চাই। একদিকে ভারতভাগের দাবী অন্য দিকে প্রদেশভাগের দাবী উত্তরোত্তর জোরালো হয়ে উঠছে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বঙ্গবিভাগ দাবীর যারা সমর্থক, তাদের সুরে গুহ এণ্ড পাল সুর মেলাচ্ছে। ওদের সুরই যেন একটু বেশি চড়া। শুনে মনে হয় না যে, এ সুর অনভ্যস্তর সুর। যেন ওরা বহুদিন থেকে এরই জন্যে গলা সেধে আসছে, যেন ওরা বহু দিন থেকেই এজন্যে প্রস্তুত ছিল।

কথাটা কি মিথ্যা? দি গ্রেট বেঙ্গল পরিপুষ্টি কম্পানি তো ওরাই একদিন স্থাপন করেছিল বাংলাদেশের কল্যাণে। আর উক্ত প্রতিষ্ঠান কলকাতার কাছাকাছি হওয়াতে একথাও প্রমাণ হয় যে, পশ্চিম-বঙ্গের পরিপুষ্টিই ওদের লক্ষ্য ছিল।

এলো ৩রা জুনের ঘোষণা। এ ঘোষণায় গুহ এণ্ড পাল উল্লসিত। এ উল্লাসের ঢেউ ভেঙে পড়ল গিয়ে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ খণ্ডে। সেখানকার অবস্থাপন্ন অনেকেই বুঝে দেখলেন প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। এখনও সময় আছে। এখনও পশ্চিমবঙ্গে পালাবার ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়তো সম্ভব। এর পরে তো আর জমি পাওয়া যাবে না সেখানে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পালাবার সময়ই বা কোথায়? সব কচুকাটা হয়ে যাবে। আর না হয় ধর্মত্যাগ। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, কারণ আমাদের মতে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। গুহ এণ্ড পালের দালালেরা পাকিস্তানের এক বীভৎস চেহারা ফুটিয়ে তুলল হিন্দুদের কাছে।

যে শোনে একথা সেই বোঝে যুক্তি অকাট্য। পলায়ন শ্রেষ্ঠ।

ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনছে, জমির দর বেড়ে যাচ্ছে হু হু ক'রে। এর পরে টাকা দিলেও আর পাবেন না তা আগে থাকতেই বলে রাখছি।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ উত্তম কথা, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, স্বধর্ম বজায় রাখার জন্যে, মশায়, শখ ক'রে মারা যাব। দেশে একেই তো হিন্দু কমে আসছে, বিশেষ ক'রে বাঙালী হিন্দু। এ অবস্থায় যেন তেন প্রকারে আত্মরক্ষাই হচ্ছে গিয়ে পরম ধর্ম। বিশ্বাস না হয় দেখুন পড়ে এই পুস্তিকা। এর সঙ্গে প্লটের নক্সাও ছাপা আছে। পঁচিশ বিঘে

জমি—৫০০ খণ্ডে ভাগ করা। প্রতি খণ্ডে এক কাঠা। প্রতি কাঠা চারশ টাকা। এ জমির দর না মাটির দর আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন। ৫০০ পরিবারের স্থান করে দেওয়া হয়েছে—তার মানে এই পঁচিশ বিঘে জমিতে কম করেও পাঁচ হাজার হিন্দু বাঁচবে। এখনই কিনলে চারশো টাকাতেই পাবেন, কিন্তু দেরি করলে কি সর্বনাশ হবে ভেবে দেখুন। মশাই, শেষকালে পালিয়ে যেতে পারলেও তো, শুধু ফাঁকা জমির উপর বাস করতে পারবেন না ? দু'খানা ঘরও তো চাই। সে এখন থেকে চেষ্টা না করলে কি করে হবে ? ভেবে দেখুন কথাটা। ঘর ক'রে দেওয়ার ভারও গুহ এণ্ড পাল নিতে রাজি আছেন।

কি রকম ঘর ?

কেন, সাতদিনে যে ঘর তোলা যায় তাই। বাঁশপাতার চাল। খড় এবং খোলার চালও কিছু কিছু হতে পারবে। শালপাতা দিয়েও বেশ হয়! কোনো রকমে বর্ষাকালটা কাটিয়ে দেওয়া—তারপর ভেবে চিন্তে পাকা বাড়ি করা যাবে।

এ রকম ঘরে একদিনও বাস করা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? প্রাণ যায় মশায়, এখন কি ঘরের বাহার দেখার সময়? কথাটা আরও একটু ভাবুন।

পঁচিশ বিঘে জমি।

প্রতি বিঘা ২০ ভাগ অর্থাৎ ২৫ × ২০ = ৫০০০ ভাগ।

প্রতিভাগের দাম ৪০০ টাকা, অর্থাৎ ৫০০ × ৪০০ = ২০০০০০ দুলাখ টাকা।

এই দুই লাখ টাকা পনেরো দিনের মধ্যে হাতে এল গুহ এণ্ড পালের। তাছাড়া আরও হাজার কুড়ি টাকা ঘর তোলার কণ্ট্রাক্টে। পূর্ববঙ্গের পাঁচ শতটি পরিবার ভূতপূর্ব পরিপুষ্টি কম্পানির জমির উপর প্রকাণ্ড এক উপনিবেশ গড়ে তুলল। তারা প্রথম দিন এই সৌভাগ্যের জন্যে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, কিন্তু ১৫ই অগষ্টের পর পূর্ববঙ্গে যখন কোনো গোলমাল হল না তখন তাদের মনে সন্দেহ জাগল তারা প্রতারিত হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তালপাতা, শালপাতা আর বাঁশপাতার ঘরে বসে ভিজতে ভিজতে তারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগল। এর চেয়ে দেশে থাকা কি ভাল ছিল না?

তারা গুহ এণ্ড পালকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাল, তারা দেশেই ফিরে যেতে চায়, অতএব কিছু লোকসান দিয়েও তারা জমি ফিরিয়ে দিতে পারলে এখন বাঁচে।

গুহ এণ্ড পাল স্তম্ভিত হয়ে বলল, বলেন কি! ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ''

এই আদর্শ যতদিন ধ'রে থাকবেন ততদিন আপনাদের ধ্বংস অনিবার্য। দেশে থেকে অকারণ মরার কল্পনা ক'রে তো লাভ ছিল না। আদর্শ বদলান। ও আদর্শ চলবে না।

তবে কোন্ আদর্শ গ্রহণ করবে ?

শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে স্ব ধ র্মী নি ধ নং শ্রে য়ঃ।

(যুগান্তর, ১৯৪৭)

পরাধীনতার ফল

সংসারের যে সব ঘটনাকে আকস্মিক ব'লে মনে করি, তা সত্যিই আকস্মিক নয়, এমন কথা বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় ব'লে থাকেন। কিন্তু কার্যকারণ যোগ প্রত্যেক ঘটনাতেই থাকতে বাধ্য এ কথাটা তাঁরা বিশ্বাস করেন মাত্র, প্রমাণ করতে পারেন না। হয় তো কোনো দিন পারবেন, কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের মীমাংসাসাপেক্ষভাবে আমার এই কাহিনীটি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারে না।

বলছি মহাদেব বিশ্বাসের কথা। কিন্তু আপনারা যদি এটাকে অবিশ্বাসের কথা ব'লে উড়িয়ে দেন, আমি নিরুপায়, কেননা আমি বৈজ্ঞানিক নই, আমি ঘটনাটিকে আকস্মিক ব'লেই মনে করি। কিন্তু তাই ব'লে মহাদেব বিশ্বাসকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কেননা তিনি আপনাদেরও পরিচিত।

বলতে পারেন, তাঁর কথাকে এতটা প্রাধান্য দিয়ে তাঁকে এতটা বড় ক'রে তোলার দরকার কি?

আমি বলি তিনি নিজগুণেই বড়, বড় হওয়ার জন্যে তিনি আমার কোনো প্রচারের উপর নির্ভর করেন নি। তিনি যে অন্যত্র পরিচিত নন, সে কেবল তাঁর বিনয়ী স্বভাবের জন্যে। নিজেকে প্রচার করতে তিনি কুণ্ঠিত, তিনি তাঁর উচ্চাদর্শের কথা, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা

দেশের যাবতীয় সমস্থার কথা, কেবলমাত্র বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করেন, সভায় দাঁড়িয়ে বলেন না।

আমি তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি এবং তাতে এমন একটা তৃপ্তি পাই যা আর কারও কাছে পাই না।

আমাদের দেশে কজন লোক এমন ক'রে দেশের কথা ভাবে? দেশ সম্পর্কে সবাই প্রায় উদাসীন। অথচ ভাবিয়ে দিলে দেখা যায় ভাববার অনেক কিছু আছে, দেখিয়ে দিলে এমন অদ্ভুত সব জিনিস চোখে পড়ে যা আগে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

একটি দিনের ঘটনাই বলি। বছরখানেক আগের কথা। মহা-মন্বন্তরের উগ্র মূর্তি তখনও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছে,

তখনও বাংলাদেশের লেখকেরা দুর্ভিক্ষের উপর গল্প লিখছেন। তাঁদের কাছে যাবার উপায় নেই, তাঁরা বিচলিত। অচিন্ত্য-কুমারের নায়কের মন মফঃসলের করুণ দৃশ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে; তারাশঙ্করের চোখে শহর জীবনের ভিত্তি কাঁপছে; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নায়ক দুর্ভিক্ষের দৃশ্যে উন্মাদ হয়ে গেছে; সরোজ কুমারের গৃহস্থ নায়ক, কয়লার অভাবে সপরিবার মারা যেতে বসেছে; প্রবোধকুমারের নায়ক দূরে পালিয়ে যাচ্ছে; মনোজ বসুর ভিখারী -মাঝির মাথায় পড়ছে ভাগ্যবানের লাঠি।

এঁদের কারও কাছে যাবার উপায় নেই।

আমি কলেজের ছাত্র, মন স্বভাবতই আবেগপ্রবণ, চিন্তাশক্তিও সেই পরিমাণে কম। হয় তো সেই কারণেই মহাদেবাবুর সঙ্গ খুব ভাল লাগত। তাঁর ঘটনা-বিশ্লেষণে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ দুই-ই আমার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়, আর এ দুটিই পেতাম আমি মহাদেববাবুর কাছে। তাই মহাদেববাবু আমার কাছে ছিলেন এক মহা আকর্ষণ।

সেদিন বিকেলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি আমারই এক বন্ধু, বিভূতি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করছে। আমিও তার সঙ্গে যোগ দিলাম।

মহাদেববাবু প্রশ্ন করলেন, দেশের এই দুর্দশার কারণ কি? কিছু ভেবেছ এ নিয়ে?

দুর্দশার কারণ খবরের কাগজে যেটুকু পড়া ছিল তাই বললাম। বর্মার চাল আসছে না, দেশে লোকবৃদ্ধি হয়েছে, ফসল ভাল জন্মে নি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাদেববাবু তা শুনে একটু হাসলেন। বললেন, এ সমস্তই তো দৈব ঘটনা, এর উপর আমাদের কোনো হাত নেই, কিন্তু এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

এর বেশি কি দেখা উচিত তা জানতাম না, দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, আমাদের দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, তাই তো আপনার কাছে আসি।

মহাদেববাবু বললেন, চিন্তা কর। নিজে চিন্তা করতে না শিখলে কোনো দিনই দৃষ্টি খুলবে না।

তারপর তিনি নিজে ছাত্রজীবনে কি ভাবে স্বাধীন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন তার দীর্ঘ কাহিনীটি বললেন। আরও বললেন, তিনি বর্তমানে কতকগুলো কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই এখন

আর আগের মতো দীর্ঘ সময় ধ'রে আলাপ করার সময় পাচ্ছেন না, তবে কয়েক মাস পরেই তাঁর বঞ্ঝাট মিটে যাবে, তখন আমাদের সঙ্গে আবার প্রাণখুলে মিশতে পারবেন।

আমাদের অন্যায় বুঝতে পারলাম। যখন তখন আসছি, একবারও ভাবি নি যে এতে তাঁর ক্ষতি হতে পারে।

মহাদেববাবু বললেন, তোমাদের মতো বন্ধুকে কাছে না পেলে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু কাজের সময় কাজ তো করতেই হবে। কিছু মনে ক'রো না তোমরা।

না, মনে করবার তো কিছু নেই, বরঞ্চ আমরা বড়ই লজ্জিত হচ্ছি—

মহাদেববাবু জোরের সঙ্গে বললেন, কিছু না, কিছু না—তোমাদের কাছে যে প্রশ্নটি করেছি তার উত্তর আমাকেই তো একদিন দিতে হবে তোমাদের কাছে। কয়েকটা মাস গেলেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হব, তখন তোমরা আমাকে ত্যাগ ক'রো না কিন্তু। এসো, বুঝলে ?

আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

মাস ছয়েক আমরা তাঁর কাছে আর যাই নি, ইতিমধ্যে দেশের দুর্দশার মূল কোথায় তা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি। আমাদের গবেষণায় যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা যে মহাদেববাবুর মতের সঙ্গে মিলবে না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। তাই ঠিক করলাম, তাঁর কাছে গিয়ে আমরা আগে কিছুই বলব না, তাঁর কথাগুলোই আগে শুনব ; তারপর নিজেদের চিন্তাধারার নমুনা দেখাব।

মহাদেববাবু বললেন, আমাদের দেশের যে দুর্দশা তোমরা দেখছ তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের পরাধীনতা এবং পরাধীনতারও কারণ হচ্ছে দুর্দশা।

কথাটা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু মহাদেববাবু কোন্ পথে চিন্তা

করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরাধীনতাই আমাদের দুর্দশার কারণ—এ কথা নীরবে মেনে নিলাম।

মহাদেববাবু বললেন, আমি কিন্তু সত্য কথাই বলেছি। ইতিহাস পড়ে দেখ, দেশের এমন একটা অবস্থা এক সময় এসেছিল যখন তার শক্তি সব দিকেই নষ্ট হয়ে গেছে, আর ঠিক এই কারণেই বিদেশীরা এসে সহজে এ দেশকে অধীন ক'রে ফেলেছে। সুতরাং পূর্ব-দুর্দশাই যে আমাদের পরাধীনতার কারণ এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিভূতি বলল, দেশের লোক কি কোনো বাধাই দেয় নি? তাদের কি কোনো শক্তিই ছিল না?

যে বাধা তারা দিয়েছে, তা বাধাই নয়। কেননা দেশ তখন বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। দেশের মধ্যে একতা ছিল না। মাঝে মাঝে কারও মাথায় দেশরক্ষার কথা জেগেছে, কিন্তু সেই একা লোকের পিছনে সমস্ত লোক দাঁড়ায় নি

সে কথা ঠিক। আমি স্বীকার করলাম।

বর্তমান যুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই দেখছ তো? সে রকম সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই তখন সম্ভব ছিল না।

বিভূতি একটু চিন্তা ক'রে বলল, কিন্তু আমরা তাই ভেবেই কি নিরাশ হয়ে ব'সে থাকব? দুর্দশার মূলে যদি পরাধীনতাই হয়, তা হ'লে তা দূর করাব চেষ্টা কি আমরা করব না?

দেশের দুর্দশার কারণ কি তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে তোমার প্রশ্নটি হবে তার পরবর্তী প্রশ্ন। অর্থাৎ মুক্তির চেষ্টা আমরা করব কি না। খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। এর উত্তরে বলি, মুক্তির চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। চেষ্টা শুরু হয়েছে। বহুদিনের জড়তা থেকে দেশ আস্তে আস্তে জাগছে।

কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন ছিল, দুর্দশার কারণ কি, তার উত্তর আমি দিয়েছি। তার পরবর্তী কাজ তোমাদের।

কিন্তু আপনি বলছেন, দেশ আস্তে আস্তে জাগছে। আমরা চেষ্টা করলে কি দ্রুত জাগাতে পারব না?

হয় তো পারবে না। হঠাৎ জেগে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি হেসে বললাম, আমরা যে কত নির্বোধ তাই প্রমাণ করার জন্যে আপনি কথাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, আর কথাগুলো ততই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। দেশ হঠাৎ জাগতে পারে না কেন?

পারে না তার কারণ, ব্যাধি বহুদিনের, সারতেও বহুদিন লাগবে। দেখতে পাচ্ছ না, দেশ কোথায় নেমে গেছে?

আমি তর্কটা জোরালো করার জন্যে বললাম, আপনার কথা ঠিক নয়, দেশ সম্পূর্ণ জেগেছে, অন্তত যেটুকু জাগলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে সেটুকু জেগেছে।

আমার কথায় কাজ হ'ল। মহাদেববাবু জোরের সঙ্গে বললেন, না। সমস্ত দেশ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, সবাই হীন হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় স্বাধীনতার অর্থই দেশের লোকের কাছে স্পষ্ট হয় নি।

কেন হয় নি, বুঝিয়ে দিন।

ঠিক এমনি সময় ভৃত্য এসে খবর দিল, এক বাবু এসেছেন দেখা করতে।

মহাদেববাবু আমাদের অপেক্ষা করতে ব'লে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পরে ফিরে এসে বললেন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, আজ যে লোকটি দশ টাকা পেয়ে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, সে ক্রমাগত ভাবছে কুড়িটি টাকা পেলে সে বর্তে যাবে। সে জন্যে, সে যদি কোনো

মতে ঐ কুড়িটি টাকা পায় তা হ'লে সে ঐখানেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দেশের কথা তার মনে জাগবে কেন? স্বাধীনতার কথায় তার দরকার কি?

আমি বললাম, স্বাধীনতার কথায় তারই তো আরও উৎফুল্ল হওয়া উচিত।

মহাদেববাবু প্রশ্ন করলেন, কেন উৎফুল্ল হবে?

আমি বললাম, স্বাধীনতা পেলে দেশের প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সে এখন যে-টাকার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করছে, তখন সহজেই তার চেয়ে বেশি আয় করতে পারবে, দেশের লোকের সাধারণ অবস্থা এর চেয়ে ঢের বেশি ভাল হয়ে যাবে।

মহাদেববাবু হেসে বললেন, তাই হওয়া উচিত, কিন্তু হয় না।

বহুদিন কোনো জাতি পরাধীন থাকলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তার নষ্ট হয়ে যায়, আপাত-লাভটাকেই সে সবচেয়ে বড় মনে করতে থাকে, কেননা হীনতার মধ্যে থেকে, সাময়িকভাবে যা পায় তাই পেয়েই খুশি হওয়া তার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়।

ভৃত্য আবার এসে দাঁড়াতেই, মহাদেববাবু বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসছি, ব'লে বেরিয়ে গেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তাঁর ঝঞ্ঝাট দূর হওয়ার আগেই আমরা এসে পড়েছি।

তিনি এবার মিনিট পাঁচেক পরে ফিরলেন এবং দেরির জন্যে কোনো রকম কৈফিয়ৎ না দিয়ে বললেন, এ অবস্থায় সে স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিতে পারে না।

বিভূতি বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনার সময় আমরা নষ্ট করছি, এ আমাদের অন্যায়।

মহাদেববাবু বললেন, না না, আমার এখন কোনো কাজই নেই।

কিন্তু বার বার আপনার কাছে সব লোক আসছেন—

ওঁরা অকাজের লোক, তোমরা তাতে ভয় পেয়ো না।

আমি সাহস পেয়ে বললাম, তা হ'লে স্বাধীনতা ভোগেরও অভ্যাস দরকার ?

ঠিক তাও নয়। কারণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলে দেশের প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সুতরাং অভ্যাস হ'তে দেরি হবে না। সে জন্যে স্বাধীনতা আমাদের চাই। এই হীনতা আর সহ্য হয় না।

মহাদেববাবু মহা উৎসাহে একে একে আমাদের হীনতার একটা ফিরিস্তি দিলেন :

আমরা যাদের মধ্যে বাস করছি তারা সব অসাধু। দু'টি পয়সা দিয়েও কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, তার মধ্যে থেকেও একটি পয়সা সে চুরি করবে।

বাজারে যাও দেখবে প্রত্যেকটি জিনিসে ভেজাল।

শুধু তাই নয়, ওজনেও ঠকাবে। দাম বেশি দিয়েও খাঁটি জিনিস পাবে না।

খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে নাকে কাপড় দিতে হয়।

দোকানের ভেজাল-শাসনের জন্যে ইন্‌স্‌পেক্টর আছে, কিন্তু তাদের চোখের সামনেই ভেজাল চলছে।

অন্য বিভাগও দেখ। পুরুষ মেয়েদের সম্মান করে না, তাদের মর্যাদা রক্ষা করে না, পথে কোনো মহিলা আক্রান্ত হ'লে আশেপাশের লোকেরা এগিয়ে আসে না, তাঁরা অপমানিত হন আমাদেরই দেশের লোকের হাতে।

আচ্ছা এ কথাও থাক। পড়াশোনার দিকে দেখ।

ছাত্রেরা ফাঁকি দিচ্ছে, শিক্ষকেরা ফাঁকি দিচ্ছে। শিক্ষকেরা ক্লাসে-

ভাল পড়ায় না, প্রাইভেট ট্যুইশনের বাজার গরম রাখার জন্যে। অনেক শিক্ষক পড়াতেই জানে না।

আর এক দিক দেখ।

শহরে যারা যানবাহন চালনা করে তারা নির্দিষ্ট ভাড়ায় কোথায়ও যায় না, অনেক বেশি আদায় করে। রেল গাড়িতেও অনেক সময় ঘুস না দিলে যাওয়া যায় না।

ধর্মের নামে এদেশে কি জোচ্চোরি চলে তা তোমাদের জানা আছে।

তা ছাড়া হালের চোরা বাজারের কথা ভেবে দেখ। এখানে পরাধীন দেশের চরম রূপটি দেখতে পাবে। চোরা বাজারে লাভের অঙ্কটা মোটা হওয়ায় স্বাধীনতার কথা এরা আর এখন ভাবতেই পারবে না। বরঞ্চ মনে করবে স্বাধীনতা এলেই চোরা কারবারের এমন চমৎকার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে, অতএব বেশ আছি।

তা ছাড়া আরও একটি মজা এই যে এরা জানে চুরির ব্যাপারে কতখানি ভয়, এবং কতখানি বিপদের সম্ভাবনা—অথচ দেশের এমন একটি অবস্থা এরা চায় না যখন চুরির দরকারই থাকবে না, দেশের সকল লোকের সকল অভাব মিটে যাবে।

এ রকম হয় কেন?—আমি প্রশ্ন করলাম।

মহাদেববাবু বললেন, হয় এই জন্যে যে ওতে শিকারের আনন্দ আছে। রেস্ খেলে টাকা জেতায় যে আনন্দ এবং উল্লাস, চোরা কার-বারে আইনকে এড়িয়ে মুনাফা করাতেও সেই আনন্দ এবং উল্লাস। তাই এরা মনে করে, চুরির দরকারটাই যদি না থাকল, তা হ'লে জীবন ধারণেরই বা দরকার কি? অর্থাৎ চুরির সুবিধা না থাকলে জীবন স্বাদহীন এবং অর্থহীন।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি হয় তো একটু নৈরাশ্যবাদী হয়ে

পড়েছেন তাই আমাদের জীবনের সব বিভাগেই কেবল বিকারই দেখছেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখলে কি আরও একটা দিক চোখে পড়ে না?

মহাদেববাবু ঈজি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আলাপ করছিলেন, এবারে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। এতক্ষণ তাঁর মর্মে আঘাত দিচ্ছিলাম, কিন্তু নৈরাশ্যবাদী কথাটাতে যেন তাঁর ধর্মে আঘাত দেওয়া হ'ল। তিনি জোর গলায় ব'লে উঠলেন, আমি নৈরাশ্যবাদী! তোমরা তা হলে এতদিন বৃথাই আমার সঙ্গে মিশলে। আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আমি ঘোর আশাবাদী ব'লেই এই বয়সেও মনের শক্তি আমার নষ্ট হয় নি।

বিভূতি বিস্মিতভাবে বলল, আপনি এখনও আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু আশা করেন?

করি না? দেশ স্বাধীন হবে, দেশের লোক এই হীনতা থেকে মুক্তি পাবে, এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় ব'লেই আমি দেশের সমস্ত দোষ ত্রুটি এমন ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারছি। নৈরাশ্যবাদী হ'লে মনের এতখানি সক্রিয়তা থাকত না।

আমি বললাম, আপনি দেশের ভবিষ্যৎটা কি ভাবে চিন্তা করেছেন, বলুন।

আমার কথায় মহাদেববাবু অনেকটা শান্ত হ'লেন এবং বললেন, আমি দেশের লোকগুলোকে একে একে তোমাদের কাছে ছোট-লোকের চেহারায় প্রকাশ করলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এদের দোষ দিচ্ছি না। পরধীনতাই এদের একেবারে নিচের ধাপে নামিয়ে এনেছে, চোর জোচ্চোর হওয়া ছাড়া এদের আর গতি নেই।

বিভূতি প্রশ্ন করল, ইচ্ছে করলে কি এরা ভাল থাকতে পারত না?

না। এরা হচ্ছে পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফসল। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে এরাই ধীরে ধীরে বদলে যাবে।

এ কথা আগেও একবার বলেছি। হঠাৎ এরা আলো দেখে ভয় পেয়ে যাবে, এরাই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। চুরি জোচ্চোরির মূলোচ্ছেদ হবে এই ভয়ে তারা ছটফট করবে, কিন্তু সে আর কদিন? আলোয় তাদের চোখ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে আসবে, তারাই তখন হবে স্বাধীনতার বাহক এবং রক্ষক।

আলোচনায় যোগ দিয়ে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল; এই ধরনের আলোচনায় অনেক ঝাপসা জিনিস স্পষ্ট হতে থাকে, মনের দৃষ্টি খুলে যায়। আমি আলোচনাটা আরো কিছুদূর টানতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এবারে দুজন ভদ্রলোক সোজা আমাদের কাছেই এসে উপস্থিত হ'লেন, তাতে আমাদের আলোচনা সহসা বন্ধ হয়ে গেল।

মহাদেববাবু তাঁদের অভ্যর্থনা করতে একটু অতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক দুজন বয়সে প্রবীণ, দেখে ধনী ব'লেই মনে হয়, তাঁরা এসে পড়াতে মহাদেববাবুর মনোযোগ সে দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় আমরা দুজন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম।

পথে বেরিয়ে বিভূতি বলল, মহাদেববাবুকে আমি বুঝতে পারি না।

আমি বললাম, কথাটা তোমার মুখেই মানায়।

কেন?

কারণ আমি জানি, সহজ জিনিস তুমি কোনো দিনই বুঝতে পার না। এক এক সময় মনে হয়, না-বোঝাটা তোমার একটা ভান মাত্র।

বিভূতি বলল, না, তা নয়। তুমিই সব কথা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা কর না। মহাদেববাবু মুখে যতই বলুন, তিনি যে ঘোর নৈরাশ্যবাদী এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কেন নেই?

সে কথা বুঝিয়ে বলা যায় না, কিন্তু আমার তাই বিশ্বাস। আমার মনে হয় তিনি দেশের লোকের জঘন্য প্রবৃত্তিগুলো যতই বিশ্লেষণ

করছেন, ততই বুঝতে পারছেন বহুকাল লাগবে এ থেকে উদ্ধার পেতে।

যদি তিনি তা বুঝে থাকেন, তা হ'লে ঠিকই বুঝেছেন।

বিভূতি বলল, তবু যেন মনে হয় তিনি ঠিক বোঝেন নি। আষাঢ় মাসের টিপটিপ বৃষ্টি, সমস্ত আকাশ ঘননীল মেঘভারে নত, এ রকম আবহাওয়ায় মনও আকাশের মতোই বেদনায় ভারী হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশের কবিদের বিরহ বেদনার সুর তাঁরা তো আমাদের মনেও সঞ্চার করে দিয়েছেন—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, মেঘের ছোঁয়া লেগে তোমারও যুক্তির খেই হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু—

মোটেই না। এই রকম আষাঢ় সন্ধ্যায় ব'সে ব'সে আমাদের মহাদেববাবু স্বপ্ন রচনা করেছেন। তাঁর মনে বেদনা জেগে উঠেছে—এ রকম দিনে তাঁর মন নৈরাশ্যে ডুবতে বাধ্য।

বরষার এমনই মহিমা যে কথাটায় যুক্তি না থাকলেও, মনে মনে আমিও মানতে বাধ্য হলাম। প্রতিবাদ না ক'রে বললাম, তা হবে।

বর্ষাকালের কথা হচ্ছিল। মন ভাবপ্রবণ হ'লে এরই প্রভাবে মন-গড়া বহু সত্য মিথ্যা হয়ে যায়, বহু মিথ্যা সত্যের রূপ গ্রহণ করে। দেশের লোক এত হীন হয়ে গেছে, স্বাধীনতার অভাবে প্রত্যেকে ছোটলোক হয়ে গেছে, এবং ব্যক্তিগতভাবে এদের উপর বিরূপ হয়ে লাভ নেই, এই সব ভাবতে ভাবতে দুজনে ফিরছিলাম, এমন সময় পথের পাশে দেখি একটা কি গোলামাল বেধে উঠেছে। পুলিসও দেখা দিয়েছে ঘটনাস্থলে।

একটু এগিয়ে যেতেই বোঝা গেল নতুন কিছু নয়, একটা কাপড়ের দোকানে বহু কাপড় পাওয়া গেছে, দোকানীকে সেই অপরাধে ধরা হয়েছে। কাপড়ের দুর্ভিক্ষের বাজারে বহু কাপড় ব্যবসায়ীই আইনকে ফাঁকি দিয়ে মোটা মুনাফা লাভের আশায় দোকানে

কাপড় মজুত ক'রে রাখে এবং গোপনে বেশি দামে বিক্রি করে।

আজকের দিনে এই রকম ঘটনা সব জায়গাতেই হচ্ছে। চালের দুর্ভিক্ষে হয়েছিল, কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মোটেই বিস্মিত হলাম না, কিন্তু এতে আমাদের নীরবতা ভঙ্গ হ'ল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বিভূতি বলল, এ রকম ঘটনা আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, দূর ভবিষ্যতের লোকেরা এ সব শুনলে কি বিশ্বাস করবে?

আমি বললাম, কেন করবে না? ভবিষ্যতের লোকেরা যদি চিন্তাশীল হয় তা হ'লে তারা সহজেই বুঝতে পারবে মানুষ চিরকাল যে সব পাপাচার ক'রে আসছে এটা তা থেকে কিছু ভয়ঙ্করও নয়, স্বতন্ত্রও নয়।

বিভূতি বুঝতে পারল আমার কথাটা ঠিক। কিন্তু তবু তার কথাটাও যে মিথ্যা নয়, এই রকম কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। আমি বললাম এই মজুতদারী মুনাফা-খোরদের কাজে তারা কিছু বিস্ময় বোধ করবে না। যদি করে, তা হ'লে এই ভেবে করবে যে দেশে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কি ক'রে।

বিভূতি খুশি হয়ে বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম। কাপড়েরও যে দুর্ভিক্ষ হতে পারে, কাপড়ের অভাবে যে এ দেশের লোকেরা আত্মহত্যা করতে পারে, এ কথা শুনে তারা চমকে যাবে। কিন্তু যখনই জানতে পারবে এমন অবস্থাতেও এ দেশের মুনাফা-শিকারীরা ঘরে কাপড় মজুত ক'রে রেখেছে, তখন আর বিস্ময় থাকবে না। ব'লে বিভূতি চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, কিন্তু একটা কথা ভাবছি—

কি, বল।

ভাবছি পৃথিবীর স্বাধীন দেশের লোকেরাও তো চোরা কারবার করেছে ব'লে শোনা গেছে।

আমি বলিলাম, হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। কিন্তু তার মূলে মুনাফার যে প্রবৃত্তি তা দু'ক্ষেত্রে এক হ'লেও দুয়ের চেহারা পৃথক। অন্য দেশে, লোককে অনাহারে রেখে কিংবা তাদের বিবস্ত্র ক'রে লোকে চোরা কারবার করতে পারে নি, করা সম্ভব নয়, করলে তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'ত। তা ছাড়া স্বাধীন দেশে চোরা কারবার নেই, এ থিয়োরি আমার নয়, মহাদেববাবুর।

বিভূতি বলল, দেশের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে মুনাফা লোভের প্রবৃত্তিই থাকবে না।

পরদিন বিভূতি আমাদের বাড়িতে এসে খবর দিল পুলিসে উঠে পড়ে লেগেছে, এবারে বোধ হয় চোরা কারবারীরা মুশকিলে পড়বে।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি ক'রে বুঝলে ?

এক দিনে তারা পনেরো-ষোলটি জায়গায় হানা দিয়ে বহু কাপড় উদ্ধার করেছে। এমনিভাবে চললে জোচ্চোরদের দফা নিকেশ হবে।

এখন আর বিশেষ কিছুই হবে না, অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া চোরা কারবারীর কৌশলের সঙ্গে পুলিস পারবে বলে মনে হয় না।

বিভূতি বলল, কৌশল তাদের খুব বেশি নেই। কিন্তু তারা বেপরোয়া। জানে, ধরা পড়লে যে লোকসান, তা লাভের তুলনায় তুচ্ছ। ওদের যদি ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা থাকত তা হ'লে বোঝা যেত ওদের দৌড় কতখানি। আমার বিশ্বাস, মহাদেববাবু এই কথাগুলো ঠিক এই রকম ভাবে ভেবে দেখেন নি।

আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার এ ধারণা কি ক'রে হ'ল ?

হ'ল এই জন্যে যে চিন্তাশীল হ'লেও বিষয়বুদ্ধি তাঁর নেই। তিনি

সমস্ত দিন নানা জাতীয় চরিত্রের সংস্পর্শে আসেন, তাদের অনেককে অবশ্য তিনি প্রভাবান্বিত করেন, কিন্তু তারাও কি মহাদেববাবুর উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করে না?

হয় তো করে। কিন্তু তাতে কি তাঁর সত্যকে দেখার চোখ নষ্ট হয়?

হবে না কেন? ধর, কাল যে দুটি ভদ্রলোককে তাঁর কাছে আসতে দেখলাম, তাঁদের একজনকে আমি চিনি। তিনি প্রচুর টাকার মালিক, এবং একজন বড় মহাজন। তাঁর সঙ্গে মহাদেববাবুর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

কেন থাকবে না? যে যতবড় পাপী সে তত সাধুসঙ্গ লাভ করতে চায়। উদ্দেশ্য, দুটো ভাল কথা শুনে পুণ্য লাভ করা—তাতে সাধুর কোনো লোকসান নেই, অসাধুর কিছু লাভ আছে।

মহাদেববাবুর কথা উঠতেই খুব ইচ্ছে হ'ল তাঁর কাছে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক।

বিভূতি বলল, সেখানে যাবে ব'লেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

দুজনে তখনই উঠলাম। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ঘটনাটি আকস্মিক কিনা, কাহিনীর গোড়াতেই সে প্রশ্ন করেছি।

পুলিসে মহাদেববাবুর বাড়ি ঘেরাও করেছে, এবং মহাদেববাবুকে গ্রেফতার করেছে। উপস্থিত জনতার কাছ থেকে জানা গেল তাঁর বাড়িতে সাত গাঁট মজুত-কাপড় পাওয়া গেছে।

সবই স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ল। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম মহাদেব-বাবুর কাছে। তাঁকে তখন পুলিসে ধ'রে নিয়ে গাড়িতে তুলছিল।

আমাদের বিস্মিত এবং স্তম্ভিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে তিনি পূর্বেরই মতো দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, সমস্তই পরাধীনতার ফল। দেশ স্বাধীন হ'লে আপনা থেকেই এ ব্যাধি দূর হ'য়ে যাবে। প্রার্থনা কর, সেদিন আসুক।

ী, ১৯৪৪)

নতুন পরিচয়

ট্রেনে চলছিলাম কলকাতার বাইরে।

আজ সাত বছরের শহুরে একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সত্য কথা?

চলছিলাম গয়া, ভাবী শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে দেখতে। মৃগয়াও বলতে পারেন।

কটা বছর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাববারই সময় পাই নি, অথচ চুল-গুলো আমার অপেক্ষা না করেই পেকে উঠছে, দাঁতও অনেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটিস্ দিয়েছে। বয়সটা যে চলছে সে কথাটা যুদ্ধান্তে হঠাৎ বেশি অনুভব করছি। আর দুটো বছর পার হ'লেই চল্লিশে গিয়ে উত্তীর্ণ হব, সুতরাং আব বিলম্ব করা যায় না।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। অন্তরে আমি যাই হই, বাহিরটা কি ইতিমধ্যেই পরিণয়-কার্যের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে না? শুধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বেড়ে গেছে। এখন কি ক'রে আমার ভাবী শ্বশুরকে বোঝাব যে আমার অন্তর-বাহির এক নয়? আমার এই অকাল-পক্কতাই বা কে বিশ্বাস করবে? আমার অন্তর-বাহির এক নয়, এবং আমি অকালপক্ক, এই দুটি কথা আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি ব'লে আমার একটা গর্ব ছিল। অথচ

আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি এই প্রার্থনাই করছি—আমার ভাবী শ্বশুর-কুল যেন ঐ দুটি কথা আজ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে আমি খুব নিশ্চিন্তচিত্তে ট্রেনে উঠি নি। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানটি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগের একটি প্রধান স্টেশন, সেখানে অভিপ্রেতের সন্ধানে যাওয়াটাই কেমন যেন একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার। সে জন্যেও মন ভাল নেই।

সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের একটা বার্থ রিজার্ভ করে চলেছি। গাড়ি হাওড়া ছাড়বার মুখে আমাদের কামরায় মোট যাত্রী সংখ্যা হলাম পাঁচ। আমার বিপরীত দিকে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক। আমার নিচে মোটা শাল জড়ানো এক বাঙালী দন্তহীন বৃদ্ধ। মাঝখানে আর এক বাঙালী বৃদ্ধ, গায়ে কালো কোট, গলায় কম্ফর্টর। ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নিচে পশ্চিম জেলার পুষ্টকায় এক ভদ্রলোক। দুর্দান্ত শীত। সবাই বিছানা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছেন। আমি আগেই শুয়েছি।

কেউ কারো পরিচিত নন, সুতরাং কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ইউরোপীয় ভদ্রলোক শুয়ে পড়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন। তার পরেই লেপচাপা দিলেন পশ্চিমা ভদ্রলোক। দুই বৃদ্ধ বাঙালী তখনও ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না, শীতে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছে সবারই।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখি কালো-কোটধারী বৃদ্ধ উস্‌খুস্‌ করছেন। আমার নিচের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হ'ল তিনিও জেগে আছেন।

কালোকোট লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না, মাথা বের করে হাই তুললেন।

এতক্ষণ পরে শালধারী প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, —"মহাশয়ের ঘুম আসছে না বুঝি? আমারও তাই।"

"না তা ঠিক নয়।" ব'লে কালোকোট চিন্তাবিষ্ট হলেন।

শালধারী প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?"

কালোকোট বললেন, "গয়া।"

গয়া শব্দটি আমাকে বিচলিত করল। এঁদের আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। কে জানে, ইনিই যদি আমার ভাবী শ্বশুরের পদ অলঙ্কৃত করেন? নানা রকম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা মুখের উপর আরও টেনে দিয়ে কৌশলে চোখ দুটো বের ক'রে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম কালোকোটধারীর উপর। ভদ্রলোক যেন দাগী আসামী, আর আমি যেন ডিটেকটিভের লোক।

ইনিও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কতদূর?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "ধানবাদ।"

ইতিমধ্যে কালোকোট উঠে বসেছেন। এইবার কি তবে আলাপ ভাল করে জমবে? কথায় কথায় কি কন্যার বিবাহের কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে বাঁচি। ভাবী জামাতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুর এ সময়ে কলকাতা আসবেন কেন? কিছুই বলা যায় না, হয় তো আমার সম্পর্কে সন্ধান নিতে এসেছিলেন গোপনে। হয় তো গত কাল ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো কারণে যাওয়া হয়নি তাই আজ চলেছেন। মনের সন্দেহ আমার দূর হ'ল না, বরঞ্চ ক্রমশই ধারণা হতে লাগল যে কাল এঁকেই গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করতে হবে। সুতরাং আমার কৌতূহলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি।

কালোকোটের মনে কি আছে কে জানে?

কিন্তু তিনি ও কি করছেন? ব্যাগ খুলছেন কেন? সবিস্ময়ে চেয়ে

দেখলাম ব্যাগ থেকে চওড়া-মুখ তরল পদার্থপূর্ণ একটা বেঁটে শিশি বের করলেন। তারপর শিশির কর্ক খুললেন। তারপর ফস ক'রে তাঁর বাঁধানো দাঁত দুপাটি খুলে সেই শিশিতে পূরলেন এবং পুনরায় কর্ক এঁটে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন।

শালধারী বলে উঠলেন, "আপনার তো মশাই সব বন্দোবস্তই বেশ পাকা। ভাল করেছেন দাঁত খুলে রেখে।"

কালোকোটের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ছিলেন প্রায় ষাট বছরের, এখন আশী বছরের মতো হলেন। তাঁর উচ্চারণও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, বললেন, "মশাই, নাচ্য হয়ে বণ্ডোবস্ট করটে হয়েছে"—দাঁত খুলে নেওয়াতে দন্ত্য উচ্চারণ-গুলো আর হ'ল না।

শালধারী বললেন, "বাধ্য হয়ে কি রকম?"

"শীতে বড় কষ্ট পাই, দাঁত ঠক্ ঠক্ করতে থাকে, এই যুদ্ধের বাজারের চতুর্গুণ দামে কেনা বাঁধানো দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়ে লাভ কি?" বলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

শালধারী বললেন, "দামের কথা যদি বললেন, তা হলে দাঁতে আমার যা লোকসান হয়েছে সে আর বলবার নয়।"

কোট সে কথা জানবার জন্যে উৎসাহিত হলেন।

শালধারী বললেন, "আর বলেন কেন! শস্তার বাজারে কিছু সোনা কেনা ছিল, তাই দিয়ে দুপাটি দাঁত করিয়ে নিলাম যুদ্ধের বাজারে। খরচ একই পড়ল, কারণ বাজারের দাঁতের দামও তখন সোনার মতোই। গত মাসে এই গাড়ির মধ্যেই ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে সে দাঁত চুরি হয়ে গেছে, তাই এখন বিনা দাঁতেই কাটাচ্ছি।"

"বলেন কি! এ তো সাংঘাতিক চুরি।"

"সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক!"

মিনিট তিনেক চুপচাপ কাটল। কালোকোট ব'লে উঠলেন,

"দুঃখ করবেন না মশাই, শুধু বিনা দাঁতে তো নয়। যা দিন-কাল পড়েছে, বিনা অন্নে, বিনা বস্ত্রে, বিনা বহু জিনিষে কোনো রকমে টিকে থাকা মাত্র।"

এ কথা শুনে আমার মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল। শুনেছি আমার ভাবী শ্বশুর শ্রীযুক্ত অন্নদা মজুমদার খুব ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বাড়ি আছে, দেশের বাইরে গয়াতে বাড়ি আছে—এবং কন্যা মাত্র একটি। তথাপি এ কি কথা? "কোনো রকমে টিকে থাকা" তো কোনো ধনী ব্যক্তিরই কথা হতে পারে না। ওঁর দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে এই সব কথা ভাবছি—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ব্যাগের উপরকার দুটি অক্ষরের উপর। ইংরেজী এ, এম, দুটি অক্ষর। আর সন্দেহ রইল না লোকটি কে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে লেপের মধ্যে ভাল ভাবে আত্মগোপন ক'রে রইলাম। ক্রমশই আমার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হতে লাগল আমার নিজের চেহারা সম্পর্কে। আমার পাকা চুলই আমাকে পরাভূত করবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভাবী শ্বশুর যদি ধনী না হন তা হলে অযথা এ পরীক্ষার মধ্যে নামি কেন? তার চেয়ে এখনই আত্মপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

কিন্তু অবুঝ মন আশা ছাড়তে চায় না।

শালধারী বললেন, "মশাই ছত্রিশ বছর জায়গার মধ্যেও যে সব ঘটনার স্থান হয় না, তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেল এই ছটা বছরের মধ্যে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি।"—কোট উৎসাহিত হয়ে বললেন। "ঠিক তুবড়ি বাজির মতো। এক-আঙুল খুপরীর মধ্যে এমন সব জিনিষ ঠেসে পুরে দেয় যার মুক্তি পেতে জায়গা লাগে পঞ্চাশ হাত।"

"তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার। ছত্রিশ বছরের জীবন ছ বছরের খুপরীর মধ্যে কাটানো কি সোজা কথা ?"—বলে শালধারী ঐ কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

হাহুতাশের হাওয়ায় আলোচনা হুতাশনের মতোই জ্বলে উঠতে লাগল।

কোট বললেন, "মশাই ভেবে দেখুন ১৯৩৯ থেকে আমাদের নার্ভের উপর মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে কি না ?"

শালধারী বললেন, "আপনার মতো ভাষার জোর নেই, কিন্তু আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে।"

"শুধু দুশ্চিন্তা ? দুশ্চিন্তা করতে গেলেও তো মনের খানিকটা সক্রিয়তা দরকার হয়। এ যে একেবারে বেঁধে মারা !

মন কিছু ভাববার সময়ই পায়নি—পড়ে পড়ে কেবল মার খেয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অতটা বোঝা যায় নি, কিন্তু এই মার খাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে।"

"ঠিক কোন্ সময়টার কথা বলছেন ?"

"বলছি যখন থেকে আলো-ঢাকা শুরু হ'ল। অন্ধকারে গুঁতো খেতে খেতে পথ চলতে হ'ল।"

শালধারী একটু চিন্তা করে ববলেন, "কিন্তু আপনি একটি বড় কথা

বাদ দিচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম তার আগে থেকেই বাড়তে শুরু করেছে।"

"বাদ দেব না কিছুই—সবই বলছি একে একে"—ব'লে কোটধারী লেপটা গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে বসলেন।

কি সর্বনাশ, এই ছ-বছরের দুঃখের ইতিহাস শুনতে হবে পড়ে পড়ে! কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর-দুজন যাত্রী বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাবী শ্বশুরকে এতক্ষণ ঐ শালধারী উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এমন একটা বিষয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন যা মনে হ'ল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নানা রকম উপমা দিয়ে যে রকম ফলাও ক'রে তিনি এ সম্পর্কে দু-চারটে কথা এতক্ষণ বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যুদ্ধজনিত দুর্দশাকে তিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতোই আপন মনে বিশ্লেষণ করে এসেছেন এতদিন। এ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ একটু বেশিই মনে হ'ল। তা না হলে তিনি ঘুরে ফিরে আলোচনাটা এর মধ্যেই টেনে আনতেন না। তা ছাড়া রাত্রি গভীর। চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ, চারিদিকের অন্ধকারের বুকে একমাত্র শব্দ। এই শব্দের পটভূমিতে, এমন গভীর রাত্রে, এমন সহানুভূতিশীল শ্রোতার সম্মুখে যে-কোনো লোকেরই মর্মবেদনা আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম কোটধারী বৃদ্ধ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর স্নায়ুর উপর ছ-বছর ধরে মিনিটে দশটা করে হাতুড়ির ঘা পড়েছে, এই ছ-বছরে স্প্রিঙের মতো তাঁর মনের চারদিকে যে শ্বাসরোধকারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে খুলবেন এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হতে হ'ল তাঁর কথা শোনবার জন্তে।

শালধারীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "শুনবেন সব?"

শালধারী জোর গলায় বললেন, "শুনব না মানে? নিশ্চয় শুনব। এ সব কথা যত শোনা যায় ততই মনটা হাল্কা হয়। তা ছাড়া, দুঃখ-দুর্দশা তো শুধু আপনার একার নয়, আমাদের সবার, এবং ব'লে আপনি যত আরাম পাবেন, আমরা শুনে তত আরাম পাব।"

"সে তো বটেই। কিন্তু সব শেষে এমন একটি কথা প্রকাশ করব যা শুনে হয় তো আপনি চমকে যাবেন—আর হয় তো কেন, আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় চমকে যাবেন।"

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই কথাটি শুনে। আমার সন্দেহ হ'ল উনি সর্বশেষ যে বিস্ময়ের কথা বলবেন সেটি নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে। বলবেন—"ছ-বছরের দুর্দশা কাটিয়ে যদি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি বা কন্যাটির বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম, কিন্তু প্রথমেই যে পাত্রটিকে পেয়ে খুশি হব ভাবলাম সে একটি অপাত্র। একেবারে বুড়ো, আমারই বয়সী; এই ভাবে মশাই ধাক্কার পর ধাক্কা, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে চলেছি।" অথবা এই কথাই অন্য ভাষায় বলবেন।

এই কাল্পনিক অপমানে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে বেঁকে দাঁড়াল। আমি গয়া নামব না ঠিক করে ফেললাম। গাড়ি-ভাড়াটা গেল, যাকগে। বিয়ে যদি করতে হয়, ঘরে বসে করব। আরও অনেক রকম শপথ করলাম মনে মনে।

শালধারী একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। বোধ হয় এই যুদ্ধের কয়েকটি বছরের মধ্যে চমকে যাবার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না। বললেন, "বলুন না আপনার কথা—খুবই অদ্ভুত না কি?"

"একেবারে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত। দাঁড়ান দাঁত লাগিয়ে-

নিই আগে—নইলে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।" ব'লে ব্যাগ থেকে দাঁত বের করতে লাগলেন।

কথা আরম্ভ হ'ল। শুরু হ'ল ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে। কি রকম দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়তে লাগল, কি ভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণ শুরু হ'ল, জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা হ'ল, তার পর জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল—সব একে একে বললেন। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খবর কি ভাবে মানুষের নার্ভের উপর ঘা মেরেছে তা শোনালেন। তার পর জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া—জিনিস দুষ্প্রাপ্য হওয়া—লোকের দুর্গতির কথা, শোনালেন। দুর্গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাপানীরা বর্মা প্রবেশ করল, কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালাল, আবার ফিরে এল, তারপর ৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমা পড়ল, দ্বিতীয় বার শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হ'ল। এইভাবে শহরবাসীরা নানা ভাবে নাস্তানাবুদ হতে লাগল। জাপানীরা আন্দামান দখল করল। যখন তখন কলকাতা আক্রমণের ভয়। এই অবস্থায় আবার একে একে শহরে ফিরে আসা এবং দ্বিতীয়বার সর্বস্বান্ত হওয়া—এই সব কথা একটি একটি করে তাতে অতি ভয়ঙ্কর রং ফলিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য আমিও স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। এ রকম বিভীষিকা বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি নি। তাই তাঁর একটানা একটি পর্বের বক্তৃতা শেষে যখন তিনি হঠাৎ তাঁর শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন, "শুনছেন ?"—তখন আমিই হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আগে বলে উঠলাম, "খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছি।"

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময় শালধারীও উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "নিশ্চয় শুনছি—আপনি থামবেন না।" তাই

আমার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতে পারি নি।

আধ মিনিট বিরামের পরেই কোটধারী আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। এ কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই—এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিটি দিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি যেভাবে সব কিছুর ব্যাখ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এগুলো আমাদের স্নায়ুর উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে—তা আমার কাছে অন্তত সম্পূর্ণ নতুন। যুদ্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের সর্বনাশ করে গেছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

১৯৪৩-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখের বোমার আক্রমণটা তিনি বর্ণনার ভঙ্গীতে আবার বাস্তব করে তুললেন। এত দিন পরে তা শুনে আবার বুক কাঁপতে লাগল। তার পর নিপুণ-ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহর ছেড়ে পালানোয় স্নায়ুর উপর যে পরিমাণ ঘা লেগেছিল, দ্বিতীয় বারের পলায়নে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি ঘা লেগেছে। উপরন্তু এ অবস্থাতে যখন ৩০ মার্চ তারিখে গোটা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হ'ল তখন থেকে শহরের কোনো মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নি—সহজ-ভাবে কেউ আর নিশ্বাসও নিতে পারে নি।

বৃদ্ধের বলবার ভঙ্গি সত্যই অতি চমকপ্রদ। যখন কথা শুরু করেন তখন কণ্ঠ কিছু ক্ষীণ থাকে। তার পর সে কণ্ঠ ধাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। তিনি না থামা পর্যন্ত মাঝখানে আর কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না। তাই এতক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনে গিয়েছি, কখনও বিরক্তি বোধ

করিনি—জানা কথার পুনরাবৃত্তি এক মুহূর্তের জন্যেও একঘেয়ে গনি।

বৃদ্ধ দ্বিতীয় বার একটু থামতেই শালধারী নিতান্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যেই তাঁর কতকগুলো কথা নিজেরই কথা বলে আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং জানালেন দুবার শহর ছেড়ে পালানোর ব্যাপারে তিনিও প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

কোটধারী আবার অনুপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হতেই হবে, কারোই নিস্তার নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, আর ছুটোছুটিতেই তো সব শেষ নয়, শুধু কাল্পনিক ভয় তো নয়, বিভীষিকা মূর্তি ধরে এল একেবারে চোখের সম্মুখে। ডাইনে বামে নিরন্নের হাহাকার—ডাইনে বামে মৃত্যু দৃশ্য! পথ চলতে হচ্ছে মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মানুষের এমন মৃত্যু তো কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি নি! এ রকম নিষ্ঠুর করুণ মৃত্যু, এমন অসহায় নীরব মৃত্যু!—শত শত নরনারী শিশু বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী—শূন্য দৃষ্টি মেলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে চোখের সামনে—এ কি দেখা যায়? চোখ খুললে এই বেদনার দৃশ্য, চোখ বুজলে গভীর আতঙ্ক। পায়ের নীচে যেন মাটি নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়, আকাশে চাঁদ উঠলে বোমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। এমনি অবস্থাতেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, পাগল হইনি এ খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিংবা হয়েছি কি না কে জানে!"

শালধারী বললেন, "এমন কি খবরের কাগজ খুললেও কেবলই বীভৎস সব ছবি দেখতে হয়েছে—জাপানীদের অত্যাচারের সব ছবি।"

"ঠিক কথা। এইভাবে শহরের লোকের হাত পা বেঁধে ছ-বছর ধ'রে তার উপর যেন লাঠি চালানো হয়েছে। মনে আতঙ্ক, চোখে বিভীষিকা, কানে করুণ ক্রন্দন—এতদিন ধ'রে কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? কিন্তু আজও কি মুক্তি পেয়েছি? যুদ্ধ শেষে যে মুক্তি

আশা করেছিলাম, সে আশা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সাইরেন নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আরও কতদিন থাকবে? কে জানে ?"

এই পর্যন্ত ব'লে বৃদ্ধ চুপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি বেদনাচ্ছন্ন, উদাস। যেন ভবিষ্যৎ কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একবার সে দৃষ্টি চালনা করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আছি। এতক্ষণ তাঁর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছি এবং আমিও যে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ছটি বছর কাটিয়ে এসেছি তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন চলেছি। এমন সময় শালধারীর কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন কানে এলো "আপনি সর্বশেষ কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন ?"

এই প্রশ্নটি আবার আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলল। নিশ্বাস রোধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে রইলাম সেই কথাটি শোনবার জন্যে, যেন এইবার আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি শুনতে পাব।

কিন্তু যা শুনলাম সে তো মৃত্যুদণ্ডাদেশ নয় ! অত্যন্ত সাধারণ একটি কথা এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। বললেন, "মশাই, শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমি এই শক্ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।"

তা হ'লে কি বৃদ্ধ উন্মাদ ? কে জানে ! হয় তো তাই। কারণ তিনি উন্মাদের মতোই পলকহীন দৃষ্টিতে শালধারীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এই দেখছেন চুল ? এর একটিও কালো নেই। এই দেখছেন মুখ ? মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দাঁতের কথা তো আগেই জানেন। কিন্তু কেন, আমার এই দুর্দশা ? এই যুদ্ধের আঘাতে, স্নায়ুর উপর অবিরাম ধাক্কায়।

আমার আয়ু শেষ করে দিয়েছে এই ছুটি বছর! আমি—আমি সম্পূর্ণ অকালে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি—সম্পূর্ণ অকালে, আপনি বিশ্বাস করুন।"

শালধারী মাত্র একটি বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন, তাঁর মুখ থেকে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। আমার মনে সহসা নতুন আলোকপাত হ'ল! আমি এই সুযোগে একেবারে উঠে বসলাম। বৃদ্ধের কথা আমার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়নি! তাঁর কথায় আমারই আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলে গেল, হয় তো মুক্তিও এতেই মিলবে। এখন একমাত্র ভাবনা রইল, ভাবী শ্বশুরের কন্যাকে কি ব'লে ভোলাব? তবু পকেট থেকে ডায়েরি বের করে কয়েকটা পয়েণ্ট নোট করে নিতে লাগলাম।

এমন সময় আমার সমস্ত আশা নির্মূল ক'রে কোটধারী বলে উঠলেন, "মশাই বিশ্বাস করতে পারেন আমার বয়স আটত্রিশ বছর? বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে কি অমানুষিক বেদনায় একখানি কাঁচা মন ব'য়ে বেড়াচ্ছি একখানা পাকা দেহের মধ্যে?"

আমার আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না। এঁর যদি বয়স আমার সমান হয়, তাহলে ইনি যে আমার ভাবী শ্বশুর নন সে কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ আমার কিছু আরাম বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরে যাঁকে অন্তর থেকে পূজনীয় করে তুলেছি—মনে হ'ল তিনি যেন আজ আমাকে নানাভাবে ঠকাবার জন্যেই উদ্যত হয়েছেন। হঠাৎ একটা আশাভঙ্গের বেদনার চেয়েও নিজের অনুমানশক্তির এতখানি দারিদ্র্য উপলব্ধি করে বেশি বেদনা পেলাম। সমস্তই কেমন যেন একটা ধাঁধাঁ বলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিয়া চলছে—যেন সমস্তই অবাস্তব, সমস্তই মায়া।

সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল যখন শালধারী বললেন, "মশাই কে

কাকে অবাক করবে তাই ভাবছি। আমার বয়স কত মনে হয়? বিশ্বাস করবেন, আপনার চেয়ে আমি মাত্র দু-বছরের বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ দরকার হয়নি। কাউকেই বলি না, চুপ করে থাকি, কৌতুক বোধ করি মাঝে মাঝে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে।"

কোটধারী একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বললেন, "তাহলে দেখছি আমার নিজের কথা সত্যিই সবার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে! এ যুদ্ধের ধাক্কায় তা হলে ক্ষীণজীবী সব বাঙালী যুবকেরই এই দশা ঘটেছে!—আমি একা অনুকূল মুখুজ্জেই শুধু বুড়ো হইনি!"

শালধারী তড়িৎগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে অনুকূল মুখুজ্জেকে জাপটে ধরলেন, এবং গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, "তুই অনুকূল? তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি সন্তোষ!"

এইবার আমার পালা। আমার হাত-পায়ে প্রকৃত যৌবন-শক্তি ফিরে এলো, আমি এক লাফে নিচে পড়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম—"আর আমি যে বিনয় রে! চিনতে পারছিস তোরা?"

এর পর যা ঘটল তা অকথ্য। চলল বেপরোয়া চীৎকার। তিন অকালবৃদ্ধের কোলাহলে ইউরোপীয় ভদ্রলোক রক্তচক্ষু খুলে কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন "হোয়াট্স আপ্ দেয়ার?"

"নাথিং সাহেব, উই ওল্‌ড ফ্রেণ্ডস্ মীট আণ্ডার নিউ সারকামস্ট্যা-

পেস্‌"—বলে আমি সাহেবকে আশ্বস্ত করলাম। সাহেব পাশ ফিরে শুলেন।

সাহেবকে সত্য কথাই বলেছিলাম। আমরা তিন জনেই সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু—মাত্র ছ-সাত বছর আমাদের দেখা হয়নি।

এত কোলাহলেও পঞ্চম যাত্রীটির কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল বহু বাঙালীকে মেরে ইনি সম্প্রতি স্ফীত হয়েছেন, তাই তাঁর নাক ডাকা একই ভাবে চলতে লাগল।

(প্রবাসী, ১৯৪৬)

মানুষ শিকার করার বিপদ তার জানা ছিল, কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি আছে? প্রাণভয়ে দ্রুত ধাবমান হরিণ কিংবা গোরুকে তাড়া ক'রে ধরা তার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব। বয়স হয়েছে, আর সেই সঙ্গে হাত পায়ের জোরও অনেক কমে গেছে।

কিন্তু তবু কিছু তো খেতে হবে!

সুন্দর বন থেকে বাঘ বেরিয়ে লোকালয়ের দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারে যদি কোনো মানুষ পাওয়া যায় এই আশাতে সে আজ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতেও কাতর নয়। যদি মানুষের হাতে তার মৃত্যু ঘটে তাতেও তার আপত্তি নেই, এ রকম না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে হঠাৎ মৃত্যু ঢের ভাল।

বাঘ চলেছে ধীরে ধীরে এগিয়ে। অন্ধকারের নিরাপদ আশ্রয়ে আপাতত তার আর কোনো ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু রাত্রি ফুরিয়ে যাবার আগে যদি কিছু না জোটে, তা হ'লে দিনের বেলা কোনো একটা জঙ্গলেই পড়ে থাকতে হবে—যতক্ষণ না আবার রাত্রি আসে।

কিন্তু অদৃষ্টে যাই থাক, চুপ ক'রে সে থাকবে না, কোনোমতে একটা শিকার জোটাতেই হবে। কিন্তু কোথায় শিকার? এ দিকে রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এল।

এমন সময় হঠাৎ সে দেখতে পেল বহুদূরে একটি মানুষের মূর্তি—তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

বাঘ তাড়াতাড়ি পথের পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। উৎসাহে তার হাতে পায়ে হঠাৎ যৌবনের শক্তি ফিরে এলো, তার চোখ দুটি যেন জ্বলতে লাগল—বহুদিনের ভুলে যাওয়া স্বাদ সে আজ প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারবে এই আশায় তার সমস্ত শিরা উপশিরায় রক্ত নেচে নেচে ফিরতে লাগল।

কি সৌভাগ্য তার। দিনের আলো এখনও ফুটে ওঠেনি—এমনি সময়ে নির্জন জায়গার একলা মানুষকে সে ধরতে পারবে, এ একেবারে আশাতীত।

সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার শিকারের দিকে। মানুষটি যত কাছে আসতে লাগল ততই সে তার মূর্তিটি ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে লাগল। তার বয়স খুব বেশি নয়, পঁচিশ বছর হবে। স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে লড়াই অনিবার্য। কিন্তু বাঘের দৌর্বল্য এখন সম্পূর্ণ ঘুচে গেছে—ও রকম তিনটি যুবককে সে এখন একা কাবু করতে পারে প্রথম আক্রমণেই।

কিন্তু ঐ যে শিকার এসে পড়েছে দশবারো হাতের মধ্যে। সমস্ত দেহ তার চরম মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত—আর একটি মাত্র ধাপ।

কিন্তু এ কি ?

লড়াই কোথায় ?

মানুষ প্রথম ধাক্কায় পড়ে গেল বটে কিন্তু আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই তো করল না ?

তবে কি এ মরা মানুষ ?

বাঘ কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে গেল। বহুদিন পরে মনের মতো শিকার পেয়েও শিকারের আনন্দটাই তার মাটি হয়ে গেল।

সে স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করল, "মরতে যাচ্ছ, ভয় করছে না?"

মানুষ শান্তভাবে উত্তর দিল, "না।"

"কেন?"

"আমি মরতেই বেরিয়েছি। ভেবেছিলাম অনেক কষ্ট ক'রে মরতে হবে, কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, তোমার দেখা পেয়ে গেলাম মাঝ পথে।"

বাঘ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের দুঃখে মরতে যাচ্ছ? তোমার চেহারায় তো দুঃখের কোনো ছাপ নেই?

"চেহারায় হয় তো নেই, কিন্তু মনে আছে।"

"কি ব্যাপার, খুলে বল তো।"

"তিন বছর এম এ পাস করেছি, কিন্তু কোথায়ও চাকরি জুটছে না। কাল একটা জায়গায় আবেদন পত্র নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছি।"

"এই দুঃখে মরতে যাচ্ছ?"—বলে বাঘ হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বলল, "চাকরি পাওয়া মানে তো পেটের ভাত জোটানো? এ বিষয়ে আমার ইতিহাস জানলে বুঝতে পারতে অত সহজে হতাশ হ'লে চলে না। নইলে এই বুড়ো বয়সে আমাকে শিকারের খোঁজে এতদূর আসতে হত না।"

মানুষ বলল, "দুঃখটা ঠিক চাকরি না পাওয়ার জন্যেই নয়, দুঃখ এই জন্যে যে আমি এম এ পাস করেছি বলেই চাকরিটি পেলাম না, আমার জায়গায় যে পেল সে আই এ পাস।"

বিস্মিতভাবে বাঘ বলল, "সে কি কথা? এ রকম হ'ল কি ক'রে? ওদের কি মাথা খারাপ?"

"না, এজন্যে তাদের যুক্তি ছিল। আমি তাদের মতে সব চেয়ে যোগ্য বটে, কিন্তু আর একটি ভাল চাকরি পেলেই নাকি আমি অন্যত্র

চলে যাব। মাত্র ত্রিশ টাকায় কোনো এম এ স্থায়ীভাবে এক জায়গায় টিকে থাকতে পারে না।"

"কিন্তু ওটা কি যুক্তি? কেননা আরও ভাল চাকরি পেলে আই এ পাস ছেলেটিও তো অন্যত্র চলে যেতে পারে।"

"ভাল চাকরি পাবার সম্ভাবনা এম এ পাসের বেশি, আই এ পাসের কম।"

"তা হ'লে তোমার দুঃখ হ'ল কেন?"

"দুঃখ হ'ল সব ব্যাপারটা বিশ্লেষণ ক'রে। দুঃখ হ'ল চাকরি সম্পর্কে আমার এম এ পাস করাটা তাদের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হ'ল ব'লে। তার মানে আমাকে তারা অগ্রাহ্য করল আমার বিদ্যা বেশি আছে জেনে। তা ছাড়া—"

বাঘ বাধা দিয়ে বলল, "সকাল হয়ে গেছে, এ সময় এই পথ আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, চল পাশের জঙ্গলে গিয়ে তোমার সব কথা শুনি।"

মানুষ বাঘের কথা যুক্তিযুক্ত মনে ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বাঘের আক্রমণে তার পায়ে চোট লেগে পা প্রায় ভেঙে গেছে। অগত্যা বাঘ তার ঘাড় কামড়ে ধ'রে তাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল, এবং সেখানে একটা পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দিল।

একটুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে মানুষ বলতে লাগল, "শুধু এই একটা বিষয়

হলেও দুঃখ ছিল না, প্রত্যেকটি বিষয়ে আমি সাধারণের বিচারে পরাজিত হয়েছি।"

খুব আগ্রহের সঙ্গে বাঘ বলল, "আর কি হয়েছে বল।"

মানুষ বলতে লাগল, "স্বাধীন ভাবে উপার্জনের চেষ্টা করেছি এর আগে। শুনেছিলাম লিখে কিছু উপার্জন করা যায়। লেখার অভ্যাসও ছিল। কিন্তু সেখানেও ঐ এক কথা।"

"কি রকম?"

"একখানা নাটক লিখেছিলাম। সবাই বলল চমৎকার, নাট্য পরিচালকও বলল চমৎকার, কিন্তু চমৎকার বলেই তা না কি চলবে না। কোনো জিনিষ ভাল বলেই অচল হয়, এ অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না, তাই হঠাৎ সব বুঝতে পেরে আমার মন বিষিয়ে উঠেছে।"

"সামান্য এই দুটি ব্যাপারে এতখানি হতাশ হওয়া কি তোমার উচিত?" বাঘ জিজ্ঞাসা করল।

মানুষ বলল, "দুটি মাত্র নয়। আমাদের দেশের রীতিই এই। আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু বহু বিচ্ছিন্ন টুকরো ঘটনা এই কদিন ধরে আমার মনে একটা অবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি এ সমাজে আমার মতো মন নিয়ে টিকে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমার পছন্দ এবং অপছন্দ দুটোই খুব উগ্র, কারো খাতিরে আমি আমার রুচিকে বদলাতে পারি না, রুচির সঙ্গে রফা করতে পারি না। যে দেশে বলি দেবার জন্যে পাঁঠাকেও অক্ষত এবং সুস্থ হতে হয়, সে দেশে নির্দোষ মানুষের কি অবস্থা হয় তা সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু এ সব কথা থাক, তুমি তোমার কর্তব্য শুরু করে দাও। আমাকে ধরেছ যখন, তখন পেটে পুরতে আর দেরি কেন?"

বাঘ এ কথার কোনো উত্তর দিল না। সে কি যেন ভাবতে লাগল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

মানুষ বিস্মিত হ'ল সে কথা শুনে। কিন্তু বাঘের মুখ-চোখের একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখে দ্বিতীয় কোনো কথা বলতে আর সাহস করল না। সে ধীরে ধীরে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল—তারপর কোথায় গেল তা আর জানা গেল না।

বাঘ পড়ে পড়ে ভাবতে লাগল। সেও তো ঐ একই রীতিতে এতকাল শিকার ধরে খেয়েছে। যাদের সে খেয়েছে তাদের তো কোনো অপরাধ নেই। তা হ'লে বাঙালী বাঘও কি বাঙালী মানুষের মতই অবিবেচক?...

এই সব ভাবতে গিয়ে বাঘ জাতির উপরে তার ঘৃণা জেগে উঠল। কাউকে হত্যা করা বিষয়ে বাঙালী-মানুষদের চেয়ে যদি কোনো উন্নত-তর রীতি সে না খুঁজে পায় তা হ'লে সে বরঞ্চ না খেয়ে মরবে, তবু অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করবে না।

সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি, অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে বৃদ্ধ বাঘ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তার মাথা ঘুরছে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন মুখের মধ্যে বহুকালের ধুলো জমে আছে। একটু জল না খেলে তো আর চলে না।

একটু দূরে ছোট্ট একটি নদী, জঙ্গলের ধার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনো রকমে গিয়ে পৌঁছল সেই নদীর ধারে। সেখানে গিয়ে দেখে একটি মেষশিশুও এসেছে সেখানে জল খেতে।

মুহূর্তে দুর্দান্ত লোভ জেগে উঠল তার। পেটে উগ্র ক্ষুধা—সম্মুখে উপযুক্ত খাদ্য।

কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল নিরপরাধকে সে খাবে না প্রতিজ্ঞা

করেছে। প্রাণ যায় সেও ভাল, কিন্তু আদর্শকে রাখতে হবে। বাঙালী-মানুষের মতো ব্যবহার সে করবে না।

অথচ খাওয়াটাও যে তার নিতান্তই দরকার।

বাঘের পেটের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। বাঘ ভাবতে লাগল। সময় বেশি নেই। মেষশিশু এখনই চলে যাবে। য' হোক একটা কিছু অবিলম্বে করা দরকার।

বাঘ তার প্রবৃত্তি এবং আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেল।

সে চেঁচিয়ে মেষশিশুকে বলল, "তুই আমার জল ঘোলা করছিস কেন ?"

মেষশিশু বলল, "কৈ, না তো। স্রোত তো তোমার দিক থেকেই আমার দিকে আসছে।"

বাঘ বলল, "তা হলে মাসখানেক আগে তুই এই জল ঘোলা করেছিলি।"

মেষশাবক বলল, "মাসখানেক আগে আমার জন্মই হয়নি। কিন্তু তুমি এ সব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ ?"

বাঘ বলল, "তোর অপরাধ খুঁজছি।"

"কেন ?"

"তোকে খাব ব'লে।"

"অপরাধ না পেলে কাউকে খাও না ?"

"আগে খেতাম, এখন আর খাব না।"

মেষশিশু বলল, "আমার কোনো অপরাধ আছে কি না আমি তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু দাঁড়াও। আচ্ছা—আমাকে তো তোমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ?"

"খুব।"

"তার মানে, তোমার খুব লোভ হচ্ছে ?"

"অতি সাংঘাতিক।"

"লোভ পাপ, জান ?"

'বিলক্ষণ জানি।"

"তা হ'লে আমি যে তোমার মনে লোভরূপ পাপ জাগাচ্ছি, এটা অবশ্যই আমার অপরাধ ?"

বাঘ একটু ভেবে বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। তুই আমার মনে লোভ জাগিয়ে অপরাধ করেছিস। অতএব এগিয়ে আয়।"

মেষশিশু এগিয়ে এল।

বাঘ সন্ধ্যা বেলা যখন ঘুম থেকে উঠল, তখন সে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করতে লাগল। বহুদিন পরে তার প্রতি স্নায়ুতন্ত্রী একটা সজীবতা লাভ ক'রে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তার সকল দেহে।

কিন্তু সমস্যা এইখানেই মিটল না।

বাঘ ভুলে গিয়েছিল সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-গত একটা আদর্শ অনুসরণ করায় বিপদ আছে।

আর সে কথা সে বুঝতে পারল দুদিন পরেই। সুন্দর বনের সমস্ত বাঘ এক সঙ্গে মিলে বৃদ্ধ বাঘের এই নব হত্যানীতির নিন্দা করতে লাগল। এই নীতিতে শিকার ধ'রে দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। সবাই যদি শিকার ধরার আগে শিকারের অপরাধ খুঁজতে যায় তাহলে পশুরা আস্কারা পেয়ে যাবে, আর তার ফলে অনেককেই না খেয়ে থাকতে হবে। কারণ, একে তো শিকার পাওয়াই দায়, তার উপর যদি হরিণ কিংবা ছাগলের সঙ্গে তর্ক করতে হয়, তা হ'লে ক্রমে এক একটি বাঘ তার বাঘত্ব ঘুচিয়ে হয়ে উঠবে এক একটা তর্করত্ন।

বৃদ্ধ বাঘ সব শুনল, কিন্তু তবু সে তার আদর্শ ছাড়তে রাজি হ'ল না।

বাঘ-সমাজ বলল, "তা হ'লে আমরা তোমাকে ছাড়লাম।"

বৃদ্ধ বাঘ বলল, "তথাস্তু।"

অতঃপর বৃদ্ধ বাঘ আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে দেশ ত্যাগ ক'রে সোজা চলে গেল গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানে গিয়ে সে আগে সবাইকে জিজ্ঞাসা করল সে তার নতুন মতবাদ নিয়ে বিলিতি সমাজে টিকতে পারবে কি না।

বিলিতি লোকেরা বলল, "নিশ্চয় পারবে, কারণ আমাদেরও ঐ একই নীতি, একই motto—আমরাও কোনো কুকুরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর আগে তাকে অপবাদ দিয়ে কুকুরহত্যার কাজটা সহজ করে তুলি।"

বৃদ্ধ বাঘ সে কথায় পরম নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের মধ্যে বাস করতে লাগল।

(দীপায়ন, ১৯৪৬)

গলায় হাড় আট্‌কে গিয়ে বাঘ বড় অসুবিধায় পড়ে গেল। সে সময় কাছে এমন কেউ ছিল না, যে গলার ভিতর থেকে হাড় খুলে বাঘকে [illegible]রতে পারে। নিরুপায় হ'য়ে বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের ধারে গিয়ে বসল ; উদ্দেশ্য, যদি কোনো পথিকের দেখা মেলে তবে তাকে দিয়ে হাড় খুলিয়ে নেবে।

ভাগ্যগুণে এক বৈদ্য সেই পথে যাচ্ছিল, বাঘ ছুটে গিয়ে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। বৈদ্য জাতিতে বক, চেহারায় সার্জন, এবং চলনে চালিয়াত।

বাঘের গলায় হাড়, সে মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারল না, একখানা পা দিয়ে গলা দেখিয়ে দিল। কিন্তু বক কিছুই বুঝতে পারল না। বাঘ তখন মাটিতে আঁচড় কেটে বুঝিয়ে দিল গলায় হাড় আট্‌কে গেছে।

বক আকাশের দিকে চেয়ে বলল, সমস্ত দিন বহু রোগী দেখে হাড়-ভাঙা পরিশ্রম হয়েছে, এখন হাড় খোলার সময় নেই।

বাঘ বকের দুখানা পা জড়িয়ে ধরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে

লাগল। বক বলল, দয়া জাগানোর চেষ্টা বৃথা, কত ফী দেবে বল, সার্জিক্যাল কেস্‌, হয় তো অস্ত্রপ্রয়োগ দরকার হ'তে পারে।

বাঘ আবার মাটিতে আঁচড় কেটে বুঝিয়ে দিল, তার মাত্র পাঁচটি টাকা আছে, তাই দেবে।

বক তা শুনে আশ্বস্ত হ'ল এবং তৎক্ষণাৎ পাখার নিচে বাঁধা রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের শিশিতে ঠোঁট ডুবিয়ে বাঘের গলা থেকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে হাড় খুলে দিয়েই পাঁচটি টাকার জন্যে হাত পাতল।

বাঘ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল কিন্তু বক বাধা দিয়ে বলল, কথা পরে শুনব, আপাতত টাকাটা দাও, এখন আমার সময় নেই।

বাঘ বলল, আমার কথাটা শেষ করেই তোমাকে তোমার প্রাপ্য দিয়ে দেব, তাতে তোমার সময় নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার মনটা হাল্কা হবে।

বক সন্দিগ্ধ চোখে বাঘের দিকে চেয়ে বলল, তোমার ব্যবহারটা কিন্তু আমার ভাল লাগছে না, তুমি জান আমি ক্লান্ত, এখন আমি কিছু শুনব না, তবু তুমি কথা শোনাবেই? তোমার মতলবটা কি বল দেখি।

বাঘ বিনীতভাবে বলল, আমি আগেই বলেছি, আমার পাঁচটি টাকামাত্র সম্বল—

—এবং বলেছ সেটা আমাকেই দেবে, অতএব অবিলম্বে সেটা দিলেই কথা ফুরিয়ে যায়।—এই কথাটি বলে বক ঘাড় কাৎ ক'রে বাঘের চোখের দিকে চাইল।

বাঘ নরম সুরে বলল, সবটা তোমাকে দিলে আমার যে কিছুই থাকে না, তুমি দয়া করে সাড়ে চার টাকা নাও, আমার আট আনা থাক।

বক উত্তেজিত হ'য়ে বলল, তুমি কৃতঘ্ন, তোমার উপকার করেছি, তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেছি, কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি।

বাঘ বলল, উপকারই যদি করেছ, তা হ'লে আর টাকার কথা ছ কেন? তুমি তো এমন কিছু কর নি যার জন্যে কৃতজ্ঞতা আর টাকা এক সঙ্গে দাবী করতে পার। যদি দয়া করে থাক তবে টাকা চেয়ো না, আর যদি ব্যবসা করে থাক তবে তোমার যা প্রাপ্য তাই নাও।

বক বাঘের কথা শুনে চমকে গেল। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, বেশ, ব্যবসাই করেছি, আমার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দাও।

বাঘ বলল, আমি তো টাকা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তুমি তা নেওয়ার গ বুঝিয়ে দাও যত টাকা চাও তত টাকা তোমার প্রাপ্য কি না।

বক বলল, কেন নয়? তুমি বিপদে পড়েছ, আমি বৈদ্য তোমার বিপদ দূর করেছি, আমার ফী আমি নেব।

বাঘ এ কথায় সোজা হ'য়ে বসে বলল, লোকের বিপদের উপর ব্যবসা চালাতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

বক বলল, ব্যবসামাত্রেই কারো না কারো বিপদের উপর দিয়েই চলে।

বাঘ বলল, একদিক দিয়ে তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু তোমাদের বসা লোকের অজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে, আর তোমরা সেই সুযোগে মুনাফা কর বেশি। এক জোড়া কাপড় লোকে শখ করেও কেনে, আবার বিপদে পড়েও কেনে, কিন্তু দুজনেই সমান দাম দেয়। কিন্তু মাথা ধরা সারাতে এলে তোমরা রোগীর কাছে যদি এক আনা নাও, বুকের ব্যথা সারাতে গেলে নাও দশ টাকা। মাথার ব্যথা সম্বন্ধে লোকের ভয় কম, বুকের ব্যথা সম্বন্ধে ভয় বেশি—রোগীর দিকে এইটুকু তফাৎ, কিন্তু চিকিৎসার দিকে কোনো তফাৎ নেই। কাঁটাটা আমার পায়ে ফুটলে পাঁচ টাকা চাইতে তোমার মতো ব্যবসায়ীরও লজ্জা হ'ত, কিন্তু গলায় ফোটাতে তুমি বললে এটা সার্জিক্যাল কেস্। ভাবলে না

আমার পাঁচ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য আছে কি না। আমার জন্তে যেটুকু করেছ তা সামান্ত মিস্ত্রীর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা তুমিই ভাল জান। তোমার উচিত ছিল প্রথমে আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করা, কিন্তু তুমি তা কর নি। তুমি প্রথমে বলেছ সময় নেই, তার পরেই টাকার কথা তুলেছ।

বক এবারে বেশ নরম স্থরে বলল, ওটা আমাদের ব্যবসায়ের একটা কৌশল মাত্র। টাকার দিক দিয়ে এই রকম একটা বাধা স্থষ্টি না করলে রোগীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে রোগীর চাপে বৈদ্যই মারা পড়ত। উপকার বিনামূল্যে করতে থাকলে উপকৃতের মনে কোনো বিবেচনা থাকে না, তারা তখন উপকারীর উপর রীতিমতো অত্যাচার চালাতে থাকে, কাজেই স্থবিধা মতো টাকার অঙ্ক বাড়াই বা কমাই, তাতে আর কিছু হোক না হোক নিজেরা বাঁচি।

বাঘ বলল, উপকারের কথাই তুল না, কেননা তোমরা পয়সা নিয়ে যা কর তাকে উপকার বলে বিশেষভাবে ঘোষণা করার কোনো মানে হয় না। যারা কাপড়-বিক্রেতা, যারা মাছ-বিক্রেতা, তারা তো ব'লে বেড়ায় না যে তারা সবার উপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, অথচ তারা তো লোকের উপকারই করে। তারা টাকা নিয়ে জিনিস বিক্রি করে, তোমরা টাকা নিয়ে তোমাদের কৌশল বিক্রি কর। তোমরা বলবে বৈদ্য না থাকলে লোকের দুঃখ-ভোগের সীমা থাকত না, আমি বলব চাষী না থাকলে মানুষের দুঃখ-ভোগের সীমা থাকত না। সংসারে সবারই দরকার, তবে একমাত্র তোমাদের ব্যবসার নাম পৃথকভাবে 'পরোপকার' হবে কেন?

বক বলল, আমাকে সাড়ে চার টাকাই দাও, আমার সময় নেই।

বাঘ বলল, কিন্তু তুমি যা করেছ তার জন্তে সাড়ে চার টাকাও তোমার পাওনা নয়।

তা হ'লে কত ?

আট আনার বেশি নয়।

মাত্র আট আনা ?

আট আনা কম হ'ল ?

আচ্ছা আট আনাই দাও।

বাঘ বলল, অত ব্যস্ত কেন ? একটু বস, আমার আরও কিছু কথা আছে। আমার কাছ থেকে ফী নেওয়ার আগে তোমাকে শপথ করতে হবে লোকের দুর্দশা আর বিপদের গুরুত্ব বুঝে পাওনা টাকার বাড়াবে না।

অনেকে যে ইচ্ছা করেই বেশি দিতে চায়।

সে তোমাদেরই দোষে। তোমরা সবার মনে এমন ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছ যাতে তারা মনে করে তোমাদের ক্ষমতা অসীম, তোমরা মরা মানুষ বাঁচাতে পার, সেই জন্যেই তারা তোমাদের উপর এতখানি নির্ভর করতে চায়। তোমরা তাদের কাছে তোমাদের সত্য পরিচয় গোপন কর, এমন কথা বল না যে তোমরা অতি সামান্যই জান। তোমাদের চিকিৎসায় রোগী নাও সারতে পারে, অনেক সময় ভুল চিকিৎসায় তার বিষম ক্ষতি হ'তে পারে,—এসব কথা তোমরা বল না।

বক বাঘের মুখ চেপে ধরে বলল, দোহাই তোমার, আর কিছু বলো না, তুমিও উপার্জন ক'রে খাও, আমিও উপার্জন ক'রে খাই, সুতরাং এ নিয়ে বেশি আলোচনা না হওয়াই ভাল। ব্যবসায়ের কৌশল বিশ্লেষণ করলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় সত্যি, কিন্তু ব্যবসা ভাল চলে না। বরঞ্চ আমি ঐ আট আনাও ছেড়ে দিলাম, এখন তুমি আমাকে ছাড়।

বাঘ হেসে বলল, ছাড়া সহজ নয়, আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি।

বক এ কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেল।

বাঘ তা লক্ষ্য করে বলল, ভয় পেয়ো না, আমি হৃদয়হীন নই, তুমি তোমার ব্যবসার বিষয়ে আমাকে যা বোঝাতে চাও তা আমি বুঝি, বৈদ্য-হিসাবে চিকিৎসা বিদ্যার চেয়েও ব্যবসাদারিটা শিখেছ বেশি, এতে ব্যক্তিগত ভাবে তোমার দোষ ষোল আনা নয় তাও জানি। আমার নিজের কথা যখন ভাবি তখন বুঝতে পারি আমিও তো পশু-পাখীদের শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়েই তাদের ধরে খাই।

বক সাহস পেয়ে বলল, তা হ'লে বুঝে দেখ মূলে তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ পার্থক্য নেই।

বাঘ বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, কিছু পার্থক্য আছে বলেই কিন্তু মনে হচ্ছে। আমরা যাদের ধরে খাই তাদের বলি না যে তোমাদের উপকার করছি। তারাও জানে আমরা তাদের বন্ধু নই। আমাদের শিকার আমাদের দেখলেই পালাতে থাকে—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেকে আমাদের মারতেও আসে, কাজেই আমাদের সঙ্গে আমাদের শিকারের সম্বন্ধ খুব সহজ, সেখানে কোনো লুকোচুরি বা ধাপ্পা নেই। কিন্তু তোমাদের সবটাই ধাপ্পা। তোমাদের শিকার তোমাদের পরম বন্ধু বলে মনে করে, তোমরা যখন তাদের রক্ত পান করতে থাক তখনও তারা মনে করে তোমরা তাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছ।

বক এ কথায় বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, সে বলল, বাঘ তুমি বিচার-শক্তি হারিয়ে ফেলছ, তুমি আগে যে সব কথা বলেছ তার মধ্যে যুক্তি ছিল, কিন্তু এখন তোমার কোনো যুক্তি নেই, তুমি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছ, ও কি তোমার চোখ দুটো ক্রমেই লাল হ'য়ে উঠছে কেন? তোমার জিব বেরিয়ে পড়ছে, জিব দিয়ে লালা ঝরছে, বাঘ, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?

না ধন্যবাদ, বাঘ বলল।—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, তবে একটু

ক্ষুধার্ত হ'য়ে পড়েছি, তা ছাড়া আহার সামনেই উপস্থিত সে জন্যে মনে হয় তো একটু চাঞ্চল্য জেগে থাকবে।

বক ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখল—পিছনে বাঘের উপযুক্ত অন্য কোনো আহার নেই। বক তৎক্ষণাৎ সব বুঝতে পেরে পাখা মেলে পালাবার চেষ্টা করতেই বাঘ একলাফে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

বক চীৎকার করে বলতে লাগল, বাঘ তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ, আমি এই মুহূর্তে তোমাকে আমার বন্ধু মনে করেছিলাম, আমাকে প্রস্তুত হওয়ার সময় দাও, তার পর আমাকে আক্রমণ কর।

বাঘ ততক্ষণ তার দাঁত বকের গলায় বিঁধিয়ে দিয়েছে। বকের কথা শুনে বাঘ মুখ তুলে বলল, এখন আর সময় নেই, একটা টেক্‌নিক্যাল ত্রুটির জন্যে আমার খাওয়া এখন আর বন্ধ করতে পারি না।

বাঘের কথা বকের কানে পৌঁছল না, তার ঘাড় ততক্ষণে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

(জনসেবা, ১৯৪৩)

ভোজবাজি

পঁচিশে অগস্ট, ১৯৪৭ সাল। দশ দিন আগে ভারত ও পাকিস্তান ডমিনিয়নের পত্তন হয়েছে।

কাশীপুরে গঙ্গার ধারে এক বস্তি।

একটা ভাঙা খোলার বাড়ি থেকে মাথায় ও গলায় চাদর জড়ানো এক প্রৌঢ় অতি ধীরপদে বেরিয়ে এল পথের উপর। চেহারা দেখে মনে হয় লোকটি অসুস্থ। শীতে কাঁপছে এই গ্রীষ্ম কালেও।

লোকটির চোখ দুটি ছলছল করছে। কিন্তু সেটা জ্বরের জন্যেই। ভাগ্যের নির্মমতায় মন তার বিষাক্ত, ভ্রূযুগল দৃঢ়কুঞ্চিত। তার পদপাত কম্পিত, কিন্তু দ্বিধাহীন। যেমন ক'রে হোক বাস্-এর রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে বাস্ ধরতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় কি সে হাওড়া পর্যন্ত যেতে পারবে?—কেবলি প্রশ্ন জাগছে তার মনে।

নিজের ভাগ্যের কথা কত বার তার মনে হয়েছে। সে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, কিন্তু তার মনে কোনো হীনতা নেই। মনে যেটুকু বেদনা তা নিতান্তই সাময়িক, তাকে সর্বদা ছাপিয়ে উঠছে একটা অহেতুক তৃপ্তি।

পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। জ্বর কি বাড়ছে? আজ ক'দিন খেয়ে আছে শুধু বার্লি। বস্তিতে থাকা অভ্যাস নেই, তাই ক'দিনেই

ম্যালেরিয়া ধ'রে গেছে। হৃদয়টা উদার ছিল, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা আবার সেই পরিমাণে দুর্বল। সে জন্যে এ রকম দুঃসাহসিক চলায় তার ভয় হচ্ছিল। কিন্তু উপায়ই বা কি?

নাঃ, জল খেতেই হবে। মাথায় কপালেও কিছু জল দিতে হবে। এই তো পাশেই নদী।

সে কোনো রকমে নিজেকে টানতে টানতে নেমে গেল জলের ধারে। কিন্তু সেইখানে গিয়ে একেবারে বসে পড়ল—উঠে দাঁড়বার আর ক্ষমতা নেই।

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। সূর্য অস্তমুখী। পশ্চিম আকাশে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে গলিত সোনা। তার উজ্জ্বল লাল প্রতিবিম্ব ঝলকিত হচ্ছে নদীর জলে। কত নৌকো চলছে নদীতে, কত লোক চলছে নদীর পাড়ে, শুধু সেই প্রৌঢ় লোকটির চলার ক্ষমতা লুপ্ত, শুধু তার চোখে আলো নিবে আসছে। দূরে মাঝে মাঝে "হিন্দু-মুসলমান এক হো" ধ্বনি—কিন্তু তার কানের মধ্যে শুধু ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ।

ঘাটে একখানা নৌকো বাঁধা ছিল। সূর্যাস্তের ঠিক পরেই একটা মুটে একটি মোট বহন ক'রে এনে তুলল সেই নৌকোয়। তার পিছনে াট বছর বয়স্ক এক মুসলমান। জলের ধারে মুমূর্ষু লোকটির দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞসা করল, "আপনি এখানে পড়ে আছেন, আপনি কি অসুস্থ?"

এই সহৃদয় প্রশ্নে রুগ্ন লোকটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে দুর্বল কণ্ঠে বলল, "আমি অসুস্থ।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

মুমূর্ষুর মনে একটা অভিমান ছিল, কিন্তু তা সে ত্যাগ করে বলল, "আমি নিরাশ্রয়।"

"নিরাশ্রয়! এবং হিন্দু!"—মুসলমান যাত্রীটি একটু চিন্তা ক'রে

বলল, "হোক, আপনি উঠে আসুন আমার সঙ্গে এই নৌকোয়। এক জন অসহায় হিন্দুকে ফেলে গিয়ে সুখ পাব না। চেহারায় মালুম হচ্ছে আপনি ভদ্রলোক।"

মুসলমান যাত্রীটি রুগ্ন লোকটিকে নৌকোয় তুলে নিয়ে মাঝিকে আদেশ দিল, "নৌকো ছাড়।"

নৌকোয় উঠে জল খেয়ে এবং পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার পেয়ে রোগীর অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে গেল। তার দেহের না হলেও মনের জোর ফিরে এলো অনেক-খানি। সে প্রশ্ন করল, "আপনি কে, এবং কোথায় চলেছেন?"

মুসলমান যাত্রীটি বলল, "আমাকে এক জন অতি সামান্য লোক বলেই জানবেন, কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না, আপাতত আপনি অসুস্থ।"

"আপনি কোথায় চলেছেন বললেন না তো?"

"চলেছি? এখন তো হাওড়া চলেছি, তার পর সেখান থেকে বর্ধমান যাবার ইচ্ছে আছে।"

মুমূর্ষু চমকিত হল। কি সৌভাগ্য তার! কি অদ্ভুত যোগাযোগ! সেও তো হাওড়া যাবে বলেই ঠিক করেছিল এবং তার পর বর্ধমান। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "হাওড়া যাবেন, তা হলে নৌকোয় চলেছেন কেন? অনেক তো দেরি হবে এতে।"

মুসলমান যাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "নৌকোয় চলেছি কেন সেকথা আর সুধোবেন না বাবুজি। সে এক ইতিহাস। আপাতত কাউকে না জনিয়ে গোপনে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই নৌকো আশ্রয় করেছি।"

মুমূর্ষু লোকটি চকিতের জন্যে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বক্তার দিকে চাইল, কিন্তু সে নিতান্তই চকিতের জন্যেই, এবং নিতান্তই গত এক বছরের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষাক্ত অভিজ্ঞতার জন্যে। কিন্তু তখনি সে তার মনের এই অহেতুক সন্দেহের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করা না গেলেও মুসলমান যাত্রীটি তা বুঝতে পারল।

সে বলল, "ভয়ের কোন কারণ নেই—আমার ইতিহাস শুনলেই সব বুঝতে পারবেন।"

বলবার মতো ইতিহাস রুগ্ন লোকটিরও ছিল, কিন্তু তার এই দুর্বল অবস্থায় কাহিনী বিবৃত করার প্রবৃত্তি ছিল না। সে শুধু বলল, "বলুন আপনার কাহিনী।"

"গত এক বছর ধ'রে শহরে যে শয়তানের রাজত্বটা চলল সে কথা আর নতুন ক'রে বলব না। কি বলেন?"

"না, দরকার নেই। সবই তো জানি।"

"বলতে ভালও লাগে না। কার দোষে হল তাও ভেবে লাভ নেই। আমি তো বলি, এ আমাদের সবারই নসীবের দোষ। অবশ্য তা ভেবেও কিছু লাভ নেই। একটি বছর ধ'রে জঙ্গলের জানোয়ারদের মধ্যে বাস ক'রে হাঁফিয়ে উঠলাম। এমনি অবস্থায় এলো পনেরোই অগস্ট। আর কলকাতা শহরে দেখলাম ভোজবাজির খেলা। কিন্তু ভোজবাজির খেলা বললে তো কিছুই বলা হয় না।"

মুমূর্ষু রোগী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "দামোদরে বান।"

"ঠিক বলেছেন বাবুজি, ঐ কথাটা আমার মনে আসেনি। বর্ধমান আমার বাড়ি, দামোদরের বানের কথাই আমার আগে মনে পড়া উচিত ছিল।"

এই সময় রুগ্ন লোকটির অবস্থা একটু খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ।

সে এক হাতে বুক চেপে অন্য হাতে মাথায় জল দিতে ইসারা করল। ভয় হ'ল মারা না যায়।

কিন্তু মারা গেল না। রোগী খুব খানিক ঘেমে উঠে অনেকটা শান্ত হল। দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা কিছু দিন ধরেই বেশ গোলমাল করছে, সে জন্যে রোগী সব সময় সতর্ক হয়েই চলাফেরা করত, কিন্তু গত ক'দিনে অত্যাচার চরমে উঠেছে। তবে আপাতত ফাঁড়াটা কেটে গেছে। খোলা হাওয়ায় সে বেশ আরাম অনুভব করতে লাগল একটুক্ষণ পরেই।

মুসলমান যাত্রীটি তখন তার কাহিনী বলতে শুরু করল। "বাবুজি, সে কি দেখলাম কলকাতা শহরে! হিন্দু আর মুসলমান যে কালো শয়তানের হাতে খেলা করছিল এত দিন, সে কালো শয়তানটা পালিয়ে গেছে, আর তার জায়গায় আসমান থেকে নেমে এসেছে খোদার দোয়া, তা যেন আলোর মতো ঝরে পড়ছে সমস্ত শহরের উপর—সারা দুনিয়ার উপর।—আচ্ছা বাবুজি, আপনাদের গান্ধী মহারাজ আর সহীদ সাহেব উপবাস দিয়ে এমন কাণ্ড ঘটালেন এ কথা বিশ্বাস করেন?"

"হতে পারে।"

"তবে শুনেছি না কি গান্ধী মহারাজের একটা রাত বড্ড কষ্টে কেটেছে। তিনি না কি দেয়ালের ফুটো দিয়ে সারা রাত সহীদ সাহেবের কামরায় তাকিয়ে ছিলেন, সহিদ সাহেব গোপনে কিছু খান কি না দেখতে?"

"না বোধ হয়। কথাটা কেউ ঠাট্টা ক'রে রটিয়ে থাকবে।"

"তাই হবে। কিন্তু তামাম শহরের হিন্দু-মুসলমান এক দিনে ক্ষেপে গেল কে কা'কে বেশি ভালবাসতে পারে বলে। এ দেখে আমার দুটি চোখ জলে ভরে উঠল, বাবুজি। স্পষ্ট দেখলাম, এক মহা সমুদ্র গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে, সে সমুদ্র খালি ভালবাসা আর দোস্তির ঢেউয়ে ভেঙে পড়ছে শহরের উপর। হিন্দু বুকে জড়িয়ে ধরছে

মুসলমানকে, মুসলমান বুকে জড়িয়ে ধরছে হিন্দুকে। আনন্দে নাচছে সবাই, চীৎকার করে আসমান ফাটাচ্ছে 'হিন্দু-মুসলমান এক হো'।

"বলুন তো, এমনি অবস্থায় কি মাথা ঠিক থাকে? সে ঢেউ এসে লাগল আমারও বুকে—আমারও কলিজায়, বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। একটি দিন ধ'রে যেখানে পাই হিন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমাদের পাড়া থেকে যে সব হিন্দু পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের খুঁজে খুঁজে ধ'রে নিয়ে এলাম, বললাম 'ভাই বোনেরা, তোমরা এসো, শয়তান পালিয়েছে আর ভয় নেই। জান দিয়ে তোমাদের রক্ষা করব—সমস্ত শয়তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব—

"আর সেই ঝোঁকে, পাড়ায় যাদের ঘর দিতে পারলাম না, তাদের আমার নিজের বাড়িটি ছেড়ে দিলাম। দিল্ তখন দরিয়া হয়ে উঠেছে, কে তাকে ঠেকায়? সে তখন বাদশা। খুবই আজব কাণ্ড মনে হবে, কিন্তু এ না করলে কি বাঁচতে পারতাম বাবুজি? অত আনন্দ, নিজের কিছু ক্ষতি না ক'রে কি কেউ সইতে পারে? তা ছাড়া আমি একা নই, আমার মতো সেদিন বহু হিন্দু-মুসলমান প্রেমের বানে ভেসে গেছে।— আপনি শুন্‌ছেন তো বাবুজি?"

"হাঁ, শুন্‌ছি বৈ কি।"

"বর্ধমানে আমার আর একটি বাড়ি আছে, কিন্তু কখন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম, দরকার হলে ওটাও ছেড়ে দেব। তখন থেকে প্রায় শ'খানেক হিন্দু আমার পিছনে লেগে রয়েছে। তাদের কোনো আশ্রয় নেই, তারা আশা করে আছে আমি কখন তাদের বর্ধমান নিয়ে যাব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম সে আর সম্ভব নয়। কলকাতার বাড়ির আসবাব-পত্র সবই বিলিয়ে দিয়েছি। ফকির হয়েছি। এখন খালি হাতে লুকিয়ে চলেছি বর্ধমান।"

মুমূর্ষু প্রশ্ন করল, "আপনার কি অনুতাপ হচ্ছে এখন?"

"না, না, কিছুমাত্র না। যা করেছি তা করেছি। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েছি হিন্দুদের মধ্যে—দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, বর্ধমানের বাড়িটা ছাড়তে পারছি না।"

বক্তা একটুখানি থেমে বলল, "কিন্তু বাবুজি, আপনার তো কোনো পরিচয় এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি। যদি আপত্তি না থাকে—"

মুমূর্ষু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আপত্তি কেন থাকবে খোন্দকার সাহেব?"

খোন্দকার সাহেব হঠাৎ চমকিত হলেন। "আপনি আমাকে চেনেন?"

"বর্ধমানে, আপনার আশ্রয়ই আমার শেষ ভরসা।"

খোন্দকার সাহেব হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলেন। তিনি যাদের গোপনে এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদেরই এক জন কৌশল ক'রে তাঁকে অনুসরণ করছে?

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। শুধু দু'খানা দাঁড়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ সেই নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগল।

ভাল লাগছিল না এই নীরবতা। খোন্দকার সাহেবের মধ্যে যে একটি সহজ মহত্ত্ব ছিল, সেই মহত্ত্বই আবার জেগে উঠল তাঁর মধ্যে—তিনি আশ্রয়-লোভী অনুসরণকারীকে বন্ধুর মতোই আবার প্রশ্ন করলেন, "বাবুজি, আপনার পরিচয়টা তো কিছু দেননি—যদি আপত্তি না থাকে—"

"আপত্তি কেন থাকবে?"

উত্তর সংক্ষিপ্ত, কষ্টকর, এবং একটা চাপা আনন্দ যেন বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

"আপনার নামটি?"

"বিজয় চট্টরাজ।"

"বিজয় চট্টরাজ!—নামটি যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে।"

"তা হয় তো হবে।"—খুব কষ্ট ক'রে বিজয় চট্টরাজ কথাটি উচ্চারণ করলেন।

খোন্দকার সাহেব বললেন, "আমার যেন মনে হচ্ছে, আমরা যখন মিলন উপলক্ষে নাচছিলাম তার মধ্যে আপনিও ছিলেন।"

"ছ-সাত দিন নেচেছি, হয় তো হবে।"

মনে হচ্ছে যেন আপনিও মুসলমানদের মধ্যে অনেক কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন।"

"দিয়েছি কিছু।"

"একখানা বাড়ি কি আপনিই দিয়েছেন? সেই সার্কুলার রোডের বাড়িখানা?"

"ঐখানাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল।" বলতে বলতে তিনি কখন অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন খোন্দকার তা টের পাননি।

খোন্দকার সাহেব যেন লাফিয়ে উঠলেন এ কথা শুনে। "আপনি মহাপুরুষ বিজয়বাবু, আপনি রাজা ছিলেন, ফকির হয়ে বস্তিতে উঠে-ছিলেন—সব শুনেছি আমি, সব মনে পড়ছে আমার। আপনার কথা মনে ক'রে কত বার আমি সালাম জানিয়েছি আপনার উদ্দেশে, আপনি আমার বড় ভাই, এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারিনি—"

ব'লে উচ্ছ্বসিত আবেগে খোন্দকার সাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, আর ঠিক সেই সময় তাঁর দাড়ি বিজয়বাবুর নাকে এবং কানে ঢুকে গন্ধ এবং শ্রবণ স্নায়ুকে যে সামান্য একটু উত্তেজিত করে তুলল তাতেই তাঁর মূর্ছা ভেঙে গেল—এবং তিনিও যথাসাধ্য ক্ষমতায় খোন্দকারকে জড়িয়ে ধরলেন।

(বসুমতী, ১৯৪৭)

বাতিল পরীক্ষার কাহিনী

কয়েক বছর আগে কোনো একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বই-টোকা অপরাধে সমস্ত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। কিন্তু কেন হয় তা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমি বহু চেষ্টা করে সেটি আবিষ্কার করেছি। ঘটনাটি যে রকম ঘটেছিল আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করছি।

পরীক্ষার প্রশস্ত হল। প্রায় দুশো পরীক্ষার্থী নিজ নিজ আসনে বসে গেছে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই। তাদের খাতা বিতরণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবারে প্রশ্নপত্র আসছে!—প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

কিন্তু কালের কি রকম দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, আশ্চর্য্য! যে, কোনো লোকই এটা বুঝতে পারবে, কারণ আজকের দিনের পরীক্ষার্থীরা যে রকম চিন্তাশূন্য, ভয়ভাবনাশূন্য, আসন্ন প্রশ্নপত্রের অব্যবহিত পূর্বেও যেমন উদ্বেগশূন্য এবং যে রকম বেপরোয়াভাবে স্ফূর্তিযুক্ত তা অন্ততঃ প্রবীণ দর্শকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়।

পূর্বে তো এ রকম ছিল না। তখন পরীক্ষার্থীরা ইষ্টদেবতাকে বা গুরুজনকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে জীবনের এই প্রথম ক্রান্তিমুহূর্তের জন্যে শান্ত গম্ভীর শুদ্ধচিত্তে এসে অপেক্ষা করত। তখন পরীক্ষার্থীদের অনেকেরই হাত বাঁধা থাকত সর্ব্বসিদ্ধি মাদুলী, আথবা কানে গোঁজা

থাকতো আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র। কিন্তু আজকের দিনে ওসব আর দরকার হয় না। এখন পরীক্ষার্থীদের পকেটে থাকে টোকার জন্যে বই আর জামার নিচে থাকে ছোরা। এখন পরীক্ষায় পাস করার জন্যে রাত জেগে পড়তে হয় না; ব্রাহ্মী ঘৃত, ফসফোলেসিথিন, মৃত-সঞ্জীবনী, এগফ্লিপ অথবা অশ্বান খেতে হয় না। এখন পরীক্ষার পূর্বদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সিনেমা দেখা চলে।

নিরপেক্ষ দর্শক বলবেন দুই-ই অভিশাপ। পরীক্ষার্থীরা একটিকে ত্যাগ করে আর একটিকে গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ একটির অনিবার্য পরিণতি অন্যটি, 'স্বর্ণ মধ্যমের' স্থান এর মধ্যে স্বভাবতই থাকতে পারে না, কেননা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কে জানে হয় তো পরীক্ষার্থীদের এই বেপরোয়া ঔদাসীন্য অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের ছাত্র-বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে!

এই কথাগুলো লেখকের নয়, পরীক্ষার হলের যাবতীয় হৈহল্লার মধ্যে সমীরণ একা গম্ভীরভাবে এই সব ভাবছিল। সে সম্মুখে খাতা নিয়ে প্রশ্নপত্রের জন্যে অপেক্ষা করছিল আর সবারই সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল সমীরণ তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু শুধু যে সেই কারণেই সে চিন্তাশীল তা নয়, চিন্তার অন্য কারণ ছিল।

যথাসময়ে প্রশ্নপত্র বিলি হয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষা-গৃহ যেন বাজারে পরিণত হ'ল। প্রথম ফিসফিস, তার পর একটু জোর, তার পর খোলাখুলি আলোচনা। নজরদারের চক্রাকার দৃষ্টি-পথকে অনুসরণ করতে করতে শব্দতরঙ্গ যেন সাইক্লোনের মতো সমস্ত হল-ঘরে চক্রাকারে ঘুরছে। নজরদারের দৃষ্টি বাহ্যতঃ অতি সতর্ক, কিন্তু কেন

যেন ঠিক দর্শনীয় মুহূর্তটি তার দৃষ্টি বার বার এড়িয়ে যেতে লাগল। নকল করা এবং নকল ধরার ব্যবস্থা, এ দুইয়ের মধ্যে এই রকম লুকো-চুরির সম্পর্কটাই শোভনীয়, এবং এটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু তবু যারা ধরা পড়ে তারা যেন ধরা পড়তেই এসেছে। নইলে সর্বক্ষণ কেউ বই খুলে রাখে সম্মুখে? রীতি মেনে চললে পরীক্ষার্থী নিরাপদ এবং নজরদারও নিশ্চিন্ত। এই রীতি লঙ্ঘন করলে নজরদার তাকে ধরবেই, এবং তাতে তার অপরাধও হবে না।

আর সবচেয়ে বিস্ময়, ধরা পড়ল সমীরণ! সে নজরদারকে আদৌ গ্রাহ্য করে নি। তাই ধরা পড়া সত্ত্বেও অন্য পরীক্ষার্থীরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাল না, কারণ তারা বহু আগে থেকেই তাকে অতটা দুঃসাহসী হতে নিষেধ করেছিল। কারণ এতে তাদেরও বিপদ ছিল। একজনের ধরা পড়া মানে তাদের কিছুক্ষণ টোকা বন্ধ। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঘটনাটি ঘটল প্রথমার্ধের শেষ ঘণ্টা বাজার কয়েক মুহূর্ত আগে। হয় তো নজরদার ইচ্ছে করেই দেরিতে ধরেছে। মাঝখানে ধরলে গণ্ডগোলে অন্যদের কিছু অসুবিধা হ'ত।

সমীরণের ধরা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বেজে গেল। পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে গেল একঘণ্টা বিরাম ভোগ করতে। অন্যদিকে খাতা বই এবং পরীক্ষার্থী-সমীরণ গেল অফিসার-ইন-চার্জ বা আবুক্ত আধিকারিকের ঘরে (পাঠক, কথাটি সরকারী পরিভাষা থেকে গৃহীত)। সেখানে সমীরণের পরীক্ষা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল তার কাছে এবং একজনকে ধরায় সমস্ত ছাত্রের বিদ্রোহ আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে থানার দারোগাকে ডেকে পাঠানো হ'ল।

সমীরণ গম্ভীর ভাবে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলল, "আমি তো কিছু অন্যায় করিনি।"

কথাটি এমন একটি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হ'ল যে আযুক্ত আধিকারিক হঠাৎ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না।

সমীরণ বলল, "আপনাদেরই অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তি দিতে চান ?"

এই বিশুদ্ধ বিদ্রূপের একমাত্র জবাব—সমীরণকে অবিলম্বে বের করে দেওয়া, কিন্তু তা পারা গেল না। কথাটার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিল যা অগ্রাহ্য করা হল না। তার উচ্চারণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে দায়িত্বহীন বালক মনে করা গেল না। তাই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এবং অশোভন হলেও আযুক্ত আধিকারিক তাকে

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলেন বললেন, "তোমার কি বক্তব্য ছ বল।"

সমীরণের মুখচোখের ভাব দীপ্ত হয়ে উঠল, নাকের নিচের হ্রস্ব গোঁফ জোড়া উৎসাহে কাঁপতে লাগল, মনে হ'ল সে যেন কিছু বলার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলক আযুক্ত আধিকারিকের চোখে বিঁধিয়ে প্রশ্ন করল, "আমার যা বলবার আছে শুনবেন সত্যিই ?"

আযুক্ত আধিকারিক গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, "তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু আমাকে এখনও একটু বসতে অনুমতি দেওয়া হয় নি।"

"তুমি বসতে পার।"

ইতিমধ্যে দারোগা এসে পৌঁছলেন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে। তিনিও বসে শুনতে লাগলেন ব্যাপার কি।

সমীরণ পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে বলল, "বেশ, তা হলে শুনুন। কিন্তু আমি প্রথমেই বলি, পরীক্ষার হল-এ নজরদারের ব্যবস্থাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অতি উৎসাহী হতে নিষেধ করা উচিত ছিল আপনাদের। কারণ এখানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাস করা, সে জন্যে তারা যথারীতি টাকা জমা দিয়েছে।"

"অতএব তারা কিছু না শিখে নকল করে পাস করবে?"—আযুক্ত অধিকারিক প্রশ্ন করলেন।

সমীরণ বলতে লাগল, "এ ভাবে পাস করে কেউ যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোক হয়েছে তার প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে যারা দেশের শত্রু তাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো নকল না করে পাস করেছে। সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে নোট মুখস্থ করে পাস করা সম্ভব হয় কি করে? বলতে পারেন সে কথা? পারেন না। কিছু শেখানোই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষার পদ্ধতি এ রকম থাকত না। না শিখে পাস করায় যদি আপনারা বাধা দিতেন তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে কবে উঠে যেত। কিন্তু সে কথা যাক। ধরা যাক, কিছু শেখাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তবু আজ যে ষাট হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে পাস করবে অনুমান চল্লিশ হাজার, এবং তাদের মধ্যেও বেকার হয়ে বসে থাকবে অন্তত বিশ হাজার। তারা নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে বেড়াবে এবং সেই চেষ্টার ফলে ঐ বিশ হাজার ছেলের মধ্যে দু চার শো ছেলে হয় তো চাকরি পাবে। কিন্তু

সে চাকরির সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক থাকবে না তাদের। সুতরাং এই যদি অবস্থা, তবে কিছু শেখার উপর অতিরিক্ত জোর কেন দিচ্ছেন আপনারা? আর এখন যদি কিছু শেখেও, তবে ক'দিন তা মনে থাকবে? এবং এ বিষয়ে শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন, যে-কোনো পূর্ব্বে পাস করা এম এ কে হঠাৎ আবার এম-এ পরীক্ষায় বসিয়ে দিন দেখবেন পাস করতে পারবে না। অবশ্য হাজার হাজার ছেলের মধ্যে দু' একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাদের কথা বলছি না। আজকের কিছু শেখা, চর্চার অভাবে কালই ভুল হয়ে যাবে। আর হাজার হাজার ছেলে বেকার বসে থেকে শিক্ষার চর্চা রাখবে কিসের গরজে?"

সমীরণ বলে যেতে লাগল, "যারা সমস্ত জীবন সাহিত্যব্যাকরণ নিয়ে থকেবে, তারা সাহিত্যব্যাকরণ শিখুক, কিংবা যারা ইতিহাস ভূগোল চর্চা করবে একমাত্র তারাই ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান লাভ করুক। তারা এদের মধ্যে শতকরা একজন কিংবা তারও কম। কিন্তু সেই অনিশ্চিত একজনের জন্যে এত ছেলের পাস করার আনন্দ নষ্ট করা কি উচিত? কারণ যারা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা শুধু বুঝে থাকে প্রবেশিকা পাস করলেই তারা দশ-বিশ টাকার চাকরি পেলে খুশি থাকবে এবং না পেলেও আর পড়বে না, তবে তারা যে শেখা দু'দিনের নিশ্চিত ভুলে যাবে সেই-শেখার জন্যে পরিশ্রম করবে কেন? তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কি বলেন নি যে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্ন লেখার জন্যে বিদ্যাকে কণ্ঠে বহন করাও যা, চাদরের নিচে বহন করাও তা? তবে এই আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? তবে এই ভণ্ডামি কেন? আপনি কি Stephen Leacock-এর মূল্যবান কথাটি জানেন না যে 'Every man has somewhere in the back of his head the wreck of something which he calls education?

"আপনি জানেন না নতুন ভারতবর্ষে শিক্ষার ধারা আগগোড়া না বদলালে দেশ উৎসন্নে যাবে? দেশে কর্মঠ স্বাস্থ্যবান লোকের দরকার এখন। দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলের সম্মুখে শত রকমের কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিতে হবে, দেশের বেকার সমস্যা মেটাতে হবে, এমনি অবস্থায় এই মিথ্যা শিক্ষার নামে আপনারা ঠিক উল্টোটাই করছেন—অকর্মণ্য ছেলে, স্বাস্থ্যহীন ছেলে এবং বেকার ছেলের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। এমনি অবস্থায় এই শিক্ষার যে কোনো দামই এখন নেই সে কথা অবশ্যই বোঝেন, সুতরাং এ শিক্ষার যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সার্টিফিকেট পাওয়া, তা যত সহজে পাওয়া যায় ততই ভাল নয় কি?"

সমীরণ এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল যে আযুক্ত আধিকারিক এর মাঝখানে কোনো কথা বলার সুযোগ পান নি, কথা খুঁজেও পান নি। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর কর্তব্য আরক্ষের (আমার কথা নয়, সরকারী পরিভাষা) হাতে সমীরণকে সমর্পণ করা। কারণ তাঁর মনে একটা ঘোর সন্দেহের উদয় হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মুখে এই সব কথা শুনে।

সমীরণের তা না বোঝবার কথা নয়। তাই সে তাঁর সন্দেহকে তার নিজের যুক্তির সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করাব সুবিধা পেয়ে গেল। সে বলল, "আমার কথা যে কত সত্য তা আপনার মুখের ভাব দেখে আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে। আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন। অর্থাৎ গৌণভবে আপনি এই কথাই বলতে চাচ্ছেন, যে প্রবেশিকা পরীক্ষা যে দেবে সে তো মূর্খ, সে আবার এত কথা বলবে কোত্থেকে। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী যে কিছুই জানে না, এ কথা এক রকম ধরেই নিয়েছেন। ভালই করেছেন, কিন্তু। আত্মপ্রবঞ্চনাটি ঠিক রেখে তাদের নকল করায় বাধা দিচ্ছেন, এটা কিন্তু ভাল করছেন না।"

এই কথাগুলো বলতে বলতে সমীরণ হো হো করে হেসে উঠল হঠাৎ। কিন্তু হাসতে গিয়ে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদয় হ'ল।

হঠাৎ তার নাকের নিচে থেকে গোঁফ জোড়া খুলে পড়ে গেল। স্তম্ভিত আযুক্ত আধিকারিক নিজেকে এই গুরুতর বিদ্রূপের সম্মুখে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু তথাপি কিছু বলবার তাঁর ক্ষমতা ছিল না, সমীরণের প্রবলতর ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি অভি-ভূত হয়ে পড়েছিলেন।

সমীরণ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতেই বলল, "আপনি সন্দেহ করছিলেন আমার বিদ্যা প্রবেশিকা বিদ্যার চেয়ে কিছু বেশি তাতে প্রমাণ হয় আপনি অন্ততঃ গ্রাজুয়েট। আপনার বিদ্যা ঐ টুকুই যা কাজের লাগল।"

আযুক্ত আধিকরিক আরও ঘাবড়ে গেলেন ওর কথা শুনে। তিনি দারোগার দিকে চাইলেন। দারোগা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

সমীরণ বলল, "কোন্ নীতি রক্ষার জন্যে পরীক্ষা ঘরে এই নজর-দারী? বরঞ্চ আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া উচিত এই শিক্ষাকে এই-ভাবে বিদ্রূপ করা—এর মূলে কুঠারাঘাত করা, এর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করে দেওয়া। সুতরাং সবাইকে নকল করতে দিন। অবশ্য অনেকে সুযোগ পেলেও করবে না, তারা ভাল ছেলে, কিন্তু তারা ষাট হাজারের মধ্যে ষাট জন। বাকী উনপঞ্চাশ হাজার ন'শো চল্লিশ জনকে বই খুলতে দিন।

আযুক্ত আধিকারিক ক্রমশই সমীরণের উপর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন এবং বললেন, "তুমি…ইয়ে…আপনি এত জেনে—অর্থাৎ আপনি নিশ্চয় অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন।"

সমীরণ বলল, "অবশ্যই দিচ্ছি। কারণ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এমনই নির্বোধ যে কোথায় ঢুকতে হবে তা জানে না, আর আমি এম-এ পাস

করেও না টুকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারব না জেনেই টুকছি। কোথায় টুকতে হবে এম-এ পাস করে এই চতুরতাটি লাভ করেছি, আমার এম-এ পাসের সার্থকতা এইখানে।"

পরবর্তী পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজল। আযুক্ত আধিকারিক নজরদারদের নির্দেশ দিলেন, "টুকতে কাউকে বাধা দিও না।" দারোগা বললেন, "আমারও তাই মত। যদি দরকার হয় আমার কনস্টেবল এ কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

আযুক্ত আধিকারিক বললেন, "ধন্যবাদ, সে আর দরকার হবে না।"

প্রথম জীবনে ইংরেজি গল্প অনেক পড়েছি। পাঠ্য জিনিষের মধ্যে গল্পটাই আমার বেশি ভাল লাগত। একবার মনে হয়েছিল নিজেই গল্প লিখতে আরম্ভ করব। ইচ্ছাটা অনেকদিন মনকে পীড়িত করেছে, কিন্তু লেখার সুযোগ ঘটেনি অনেকদিন, মানে পঁচিশ বছর।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমি ছাত্র ছিলাম, হাতে সময় যথেষ্ট ছিল, গল্প লিখব ব'লে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ ঠিক সেই সময়ে থেমে গেল এবং অদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই সময় থেকে আমার নিজের যুদ্ধ আরম্ভ হল—জীবন-যুদ্ধ।

হঠাৎ চাকরি পেয়ে গেলাম একটা স্কুলে। সেই থেকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বছরের পর বছর বহু ছাত্রকে স্কুলের সীমা পার করার কাজে নিযুক্ত আছি। জীবন রক্ষার জন্যে যে চাকরি আমাকে অবলম্বন করতে হ'ল তাকেই আমি বলছি জীবন যুদ্ধ, যাঁরা স্কুল মাস্টার তাঁরা আশা করি আমার কথাটা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষকতার মতো এমন গৌরবজনক অথচ এমন ইতর কাজ আর আছে কিনা জানি না। এর মধ্যে গৌরব যেটুকু তা উপলব্ধি করা যায় প্রথম কয়েক মাস, তারপর থেকে ক্রমে 'ঐতরেয়' ব্যবসাবুদ্ধি সমস্ত দিককে গ্রাস করতে থাকে, শিক্ষকতা যে মহৎ কাজ সে কথা আর

মনে থাকে না। সমস্ত দিন সুসাহিত্যকে বিশ্লেষণ ক'রে, ভাগ ক'রে, নিষ্পেষিত ক'রে, তার সঙ্গে জল মিশিয়ে, তার অতি অক্ষম একটি ব্যাখ্যা তৈরি ক'রে, অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের কাছে তাদের সম্পূর্ণ অরুচিকর এবং আরও বেশি দুর্বোধ্য ভাষায় তা পরিবেশন ক'রে তাদের পাস্ মার্ক রাখার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। শিক্ষকতার এই সরল পথে কাটিয়ে দিলাম সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর।

তারপর আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ চলতে চলতে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বেকার হয়ে পড়লাম, স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হ'ল বিমান আক্রমণের ভয়ে। হঠাৎ অনেকখানি সময় হাতে আসাতে পঁচিশ বছর আগের গল্পলেখার সেই দুষ্প্রবৃত্তিটি মনের মধ্যে আবার জেগে উঠল তার সমস্ত শক্তি নিয়ে—মাথার উপর আসন্ন বোমাও তাকে দমন করতে পারল না।

কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি লেখার সমস্ত ক্ষমতাই হারিয়েছি, কি নিয়ে গল্প লিখব, কি তার প্লট হবে, কিছুই মনে আসে না। পঁচিশ বছর আগে হ'লে হয়তো যে কোনো একটা গল্প কিছু পরিশ্রম ক'রে খাড়া করতে পারতাম, কিন্তু আজ সে দিনটিকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। আজ সেই দুঃখের ইতিহাসটিও সহজভাবে বলতে পারছি না, সবটা প্রায় বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে।

আমি যে গল্প লিখতে চাই এই খবরটি আমার মানসিক উত্তেজনা থেকে এবং আমার অস্বাভাবিক চালচলন থেকে বন্ধু মহলে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল, অর্থাৎ প্রকাশ করতেই হ'ল, এবং এটাও প্রকাশ হ'ল যে, আমি গল্পের প্লট খুঁজে পাচ্ছি না।

বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে মাস্টারী জীবনে বাইরের লোকের বোধ হয় কোনো আকর্ষণ থাকে না, সেজন্যে বাইরের কারো সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমার নিকট-বন্ধুরা সবাই আমার

সহযোগী শিক্ষক। বাইরে অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন কেউ ছিল না, শত্রুও তেমনি কেউ ছিল না, কেবল একজন ছাড়া। তার নাম চণ্ডীচরণ।

এই চণ্ডীচরণ অকারণ আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল। আমি যখন প্রথম হেডমাস্টারের পদ পেলাম তখন আমি আদর্শবাদী যুবক, আমার ছাত্রদের জীবন নতুন আদর্শে গড়ে তুলব, শিক্ষা-রীতিতে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলব—ইত্যাদি রূপ কল্পনা নিয়ে কাজে লেগেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীচরণের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল আমার ছাত্র।

হেডমাস্টার হিসাবে আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এলো চণ্ডীচরণের কাছ থেকে। আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠ্য পুস্তকের প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়ে অপাঠ্য পুস্তকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছি—এইটেই তার অভিযোগ। যা যথার্থ ঘটেছিল তা এখন আর বলে লাভ নেই, চক্রী চণ্ডীচরণের ভাষায় তার যা চেহারা দাঁড়িয়েছিল সেইটুকুমাত্র উল্লেখ করলাম। চণ্ডীচরণের নিপুণ প্রচারের ফলে অন্য অভিভাবকেরাও বিচলিত হ'য়ে উঠলেন এবং রীতিমতো একটা বিচার সভাও বসল।

আমি নিজেকে সমর্থন করতে গিয়ে হেরে গেলাম। প্রমাণ হ'ল আমার বয়স কাঁচা, অভিজ্ঞতা কম, হেডমাস্টার হওয়ার মতো শক্তি আমার কোনো দিকেই নেই। ষড়যন্ত্র পাকা, তা ছাড়া প্রবল দলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ান নিষ্ফল এমন কথা ইতিহাসে অনেক পড়া ছিল, তাই নিজেকে সামলে নিলাম। অর্থাৎ ক্ষমা চাইতে হ'ল। আমার এই স্বীকারোক্তিতে শিক্ষকমাত্রেই খুব বিরক্ত হবেন জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে মনে তাঁরা একথাও স্বীকার করবেন যে, শিক্ষার নামে তাঁরা যা করে থাকেন তাতে বর্তমানে আর কারো কাছে কিছু লুকোবার নেই।

জীবনে প্রথম স্বাধীন মত বিসর্জন দিতে সামান্য একটু দুঃখ হয়েছিল,

কিন্তু এ নিয়ে আমি আর কথনো অনুতাপ করিনি, শোকোচ্ছ্বাসও লিখিনি—চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার কথা তো কল্পনাই করতে পারিনি।

পঁচিশ বছর সবার মতে মত মিলিয়ে চিরাচরিত রীতিতে যথাসাধ্য সুনাম রক্ষা করে এসেছি। তবু মাঝে মাঝে চণ্ডীচরণ আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি সতর্ক থাকাতে পারেনি

চণ্ডীচরণের চিত্ত জয় করতে আমি পারিনি কেন সেটা অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলাম। তারই এক শ্যালক এই স্কুলের হেডমাস্টার হবে এমন নাকি প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং বিজ্ঞাপনের জবাবে যত দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোকে চেপে দিয়ে তার শ্যালকই নিয়োগ-পত্র পাবে এটাও ঠিক হয়েছিল, কিন্তু কৌতূহলবশতঃ আবেদনপত্রগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার আবেদনখানা সেক্রেটারিকে ভাবিয়ে তুলল। সমস্ত আবেদনকারীর মধ্যে আমিই

একমাত্র এম-এ এবং ইংরেজীতে এম-এ। এম-এ পাস হেড়মাষ্টার সেক্রেটারির কাছে লোভনীয় মনে হ'ল, তিনি চণ্ডীচরণের শ্যালকের দাবীকেও এজন্যে অগ্রাহ্য করতে কুণ্ঠিত হলেন না। ফলে আমি এলাম এবং চণ্ডীচরণ বোধ হয় মনে মনে আমাকেই তার শ্যালকপদে বরণ করল।

এর পর থেকে চণ্ডীচরণ নিয়মিতভাবে আমার পিছনে লেগে আছে। সেক্রেটারির পিছনে লাগেনি, কারণ সেক্রেটারির অন্নেই সে প্রতিপালিত হয়েছিল। কিন্তু এ সব কথা আর বলব না, বর্তমান গল্পের সঙ্গে এর যেটুকু সম্পর্ক তা যেটুকু বলেছি তাতেই শেষ হয়েছে।

বলা বাহুল্য আমার সহযোগী শিক্ষক সবাই বেকার এবং এর মধ্যে

একমাত্র আমিই গল্প রচনার চেষ্টা করে সীমাহীন দুঃসময়ের একপ্রান্তে একটু আনন্দ সৃষ্টির পরিকল্পনা মাত্র করছি।

হেড পণ্ডিত রামেশ্বর চক্রবর্তী (৬৫) বেশ শ্রদ্ধেয় চেহারার লোক। সুপুরুষ, দীর্ঘনাসা হ্রস্বকেশ, সদাপ্রফুল্ল—বেকার অবস্থাতেও তাঁর মনটা কিছুমাত্র দমেনি, তাঁকে দেখলে মনে হয় আরও পঁয়ত্রিশ বছর তিনি চাকরি করতে পারতেন।

রামেশ্বর পণ্ডিত মশাই কথায় কথায় বললেন, "মাস্টার মশাই, গল্প যদি লিখতেই চান তা হ'লে বড় গল্প লিখুন—একেবারে বঙ্কিম চাটুজ্জের মত উপন্যাস।"

"বড় গল্প বুঝি ভালবাসেন আপনি ?"

পণ্ডিত মশাই শুধু বললেন, "ছোট গল্প আমার ভাল লাগে না, বিশেষ করে আজকালকার গল্প। যাচ্ছে-তাই মশাই, যাচ্ছে-তাই—মনে হয় যেন আস্ত জীবনটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছে।"

পণ্ডিত মশাইয়ের মুখে এমন একটা কথা শুনব আশাই করিনি। এতদিন স্কুলের সম্পর্কে তাঁকে একমাত্র সংস্কৃতের পণ্ডিত হিসাবেই দেখেছি, তাই আজ স্কুলের বাইরে হঠাৎ তাঁর এই আলাপ শুনে আমি চমকে গেলাম—তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ছোট গল্পের সার্থকতা কোথায় এবং কি তা আমার ভালই জানা ছিল, কিন্তু সে-সব আর বলতে ইচ্ছা হল না।

বললাম, "আপনার প্রস্তাব খুব সাধু, আমি উপন্যাসই লিখব। কিন্তু কাদের নিয়ে লিখব বলুন।"

পণ্ডিত মশাই বললেন, "সে আমি জানি না।" তারপর কিছু চিন্তা করে অথবা চিন্তার ভান করে বললেন, "কাদের নিয়ে লিখবেন এটা সমস্যাই নয়, যাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিয়েই লিখুন। আমাদের নিয়েও তো লিখতে পারেন।"—বলে খুব হাসতে লাগলেন।

শুনে কথাটা বেশ ভালই লাগল, কিন্তু কেন জানি না আমার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। মনে হল যেন তিনি কৌশল করে আমার গল্পের মধ্যে ঢুকতে চান। হায়রে মানুষের দুর্বলতা! কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করলাম না, কেননা আমার নিজেরও দুর্বলতা ছিল—গল্পের প্লট খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পণ্ডিত মশাইয়ের ইঙ্গিতটা যদিও প্লট নয়, তবু মনে ধরল, মানুষের দুর্বলতার কথা ভুলে গেলাম। বললাম, "রাজি পণ্ডিত মশাই, স্কুলের শিক্ষকদের নিয়েই গল্প আরম্ভ করব।"

পরদিন সকালেই দেখি আমাদের স্কুলের বাকী সাতজন শিক্ষক দল ধ'রে আমার কাছে এসে হাজির।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার (৫৫) বললেন, "আমাদের নিয়ে নাকি গল্প লিখছেন?"

সেকেণ্ড মাষ্টার (৫০) বললেন, "আমার তো ভাবতেই ভারি মজা লাগছে।"

মৌলবী সাহেব (৪৫) বললেন, "মজা বলে মজা! আমরা হব গল্পের নায়ক! দেখা যাবে হেডমাস্টার মশাইয়ের হাতে আমাদের কি চেহারা দাঁড়ায়।"

বলা বাহুল্য এঁদের প্রত্যেকের মুখে একটা তরল খুশির ভাব ঝলমল করছিল। বাকী চারজন অর্থাৎ তৃতীয় শিক্ষক (৫৬), চতুর্থ শিক্ষক (২৮) দ্বিতীয় পণ্ডিত (৪৪) এবং ড্রইং শিক্ষক (২৩) অতি আনন্দে কিছুই বলতে পারলেন না, কেবল একটি অনির্বচনীয় কৃতজ্ঞতার হাসিতে আমার বৈঠকখানাটি উজ্জ্বল ক'রে তুললেন।

এমন সৌভাগ্য বোধ করি আর কোনো লেখকের হয় নি। যাদের নিয়ে গল্প তারা নিজেরাই দল ধ'রে এসেছে লেখকের বাড়িতে এবং তাদের চরিত্রের যে দিকটা এতদিন আড়ালে ছিল সেটাকে এমন অদ্ভুত সারল্যের সঙ্গে প্রকাশ করছে! গল্পকার এবং গল্পিতের এমন সহযোগিতার কথা ইতিপূর্বে আমি আর শুনিনি। কিন্তু আশ্চর্য মনে হ'ল এই যে, যাঁরা চাকরিশূন্য অবস্থায় চারিদিক শূন্য দেখছেন—তদুপরি সপ্তাহে প্রায় একবার ক রে যাঁদের স্লিট ট্রেঞ্চে ঢুকতে হচ্ছে তাঁরাও গল্পের নায়ক হিসাবে বেঁচে থাকার জন্যে কেমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন!—অথচ অনভিজ্ঞ আমি এমন কি গল্প লিখতে পারি যার মধ্যে তাঁরা অমর হ'য়ে থাকবেন!

কিন্তু তাঁরা মরুন বা বাঁচুন, সকাল বেলা তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে আমার কিছু খরচ হ'য়ে গেল। মনকে শান্ত করলাম শুধু এই ভেবে যে, প্রত্যেক বড় কাজেরই একটা শুভ আরম্ভ আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ভুল ভেঙে গেল। শিক্ষকেরা চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আধ ছাঁটা গোঁফ এবং ভাঁটা চক্ষু চণ্ডীচরণ "মাস্টার মশাই বাড়ি আছেন?" প্রশ্ন উচ্চারণ করতে করতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে পড়ল।—আরম্ভটা মোটেই শুভ মনে হ'ল না।

"কিছু মনে করবেন না মাস্টার মশাই, আমি চাঁচাছোলা লোক—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বলি না, করিও না—"

"হ্যাঁ আপাততঃ সোজা ঘরে ঢোকাতে সে কথায় কারো সন্দেহ থাকে না।"—কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু ভগবান জানেন, লোকটি যা ঠিক তার উল্টো পরিচয় দিল এবং বিপাকে প'ড়ে আমাকেও সেটা স্বীকার করতে হ'ল।

বললাম, "আপনার কি চাই বলুন, আমার এখন সময় নেই—"

"কি যে বলেন মাস্টার মশাই, ইস্কুল বন্ধ—এখনই তো যথেষ্ট সময় থাকা উচিত।"

"অন্য কাজ থাকতে পারে।"

"জানি, আর সেই জন্যই এসেছি। আগের সব ব্যাপার ভুলে যান, আপনি আর এখন হেডমাস্টার নন যে সম্পর্কটা আগের মতোই রাখতে হবে।"

"আমার সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"কি যে বলেন মাস্টার মশাই, ভাব্‌ব না কেন?"

"তা হলে ভাবুন।"

"বলছিলাম কি, আপনি নাকি আমাদের পাড়ার সবাইকে নিয়ে গল্প লিখছেন?"

"হ্যাঁ লিখছি, কিন্তু আপনি তার মধ্যে নেই, অতএব মানহানির ভয় নেই।"

"কি যে বলেন, আমাদের মতো লোকের আবার মানহানি! আপনি সব উল্টো বুঝছেন। আমি বলছি-কি, শুনে অবধি আমার বেশ একটা কৌতূহল হচ্ছে। ভাবছি আপনার সঙ্গে এই উপলক্ষে বন্ধুত্বটা ক'রে ফেলি।"

"কোনো দরকার আছে ব'লে মনে করি না।"

"সব শুনলে বুঝতে পারবেন দরকার আছে। আমাদের পাড়ার প্রত্যেকের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা আছে, আপনার গল্পের জন্যে সব দরকার হবে।"

"তাতে আপনার লাভ?"

"আমাকে তার দাম দেবেন, সোজা কথা।"

"কারো নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমার গল্পের জন্যে দরকার নেই।"

"সোজাসুজি বিবেকে বাধে তো কৌশল করুন। মানে আমাকে গল্পের মধ্যে ঢোকান এবং আমার মুখ দিয়ে সব ফাঁস করান।"

লোকটির মতলবের পরিচয় পেয়ে ক্রোধে ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল—অমি উত্তেজিতভাবে বললাম—"আপনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।"

"অতটা মাথা খারাপ করবেন না, আমার কথাটা, স্যার্, ভেবে, দেখুন। আপনার গল্পের মধ্যে দয়া ক'রে আমার নামটা কোনো রকমে ঢোকাতে পারেন না?"

"না না, না। আপনি যান, আমি আপনার কথা শুনতে চাই না।"

"আচ্ছা যাচ্ছি, আজ বড় উত্তেজিত হয়েছেন, আমি বরঞ্চ আর একদিন আস্‌ব।"—ব'লে চণ্ডীচরণ বিদায় হ'ল।

চণ্ডীচরণের কথায় অন্ততঃ মনে মনেও হাসা উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না, কেননা পৃথিবীতে একটিমাত্র লোককেই আমি আমার শত্রু হিসাবে এতদিন মনের মধ্যে পুষে এসেছি, এই চণ্ডীচরণই আমার প্রথম জীবনের আদর্শ পথে দুর্গম বাধা সৃষ্টি করেছে, আর তারই জন্যে আজ আমি আর-পাঁচজনের মতো একজন সাধারণ স্কুল মাস্টার—শিক্ষিত লোকের কাছে যে স্কুল মাস্টার করুণার পাত্র।

চণ্ডীচরণের কথায় আমি ধৈর্য হারিয়েছি। আমার সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের মাস্টারি-জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ধৈর্যচ্যুতি। অথচ যেদিন

এই চণ্ডীচরণ আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান করে সেদিন আমি ধৈর্য হারাইনি। সেদিন ধৈর্য হারালে আমার জীবনে হয়তো অনেক উন্নতি হ'ত। সেই ধৈর্য আজ হারাতেই হ'ল অথচ জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার পর এবং হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে। কেননা, আমার চির শত্রু আমারই অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছিল।...কিন্তু যাক, গল্পটা আমার মানসিক অবস্থা-বিষয়ের নয়।

একটা অখ্যাত মাসিকপত্রের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার উপন্যাস মাসে মাসে ছাপার বন্দোবস্ত করলাম এবং লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথম কিস্তি ছাপাও হয়ে গেল। প্রথম কিস্তিতে ন'জন শিক্ষকের প্রকৃতি এবং চেহারা বর্ণনা করলাম, আমাদের স্কুলের বর্ণনা করলাম এবং নিজেকে বানালাম প্রধান নায়ক।

প্রথম কিস্তি ছাপা হ'লে পাঠকেরা খুব তারিফ করতে লাগল, গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত, তাদের চেহারার বর্ণনায় তাদের স্পষ্ট চেনা যায় ইত্যাদি মন্তব্য শোনা গেল পাঠক মহল থেকে। আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় কিস্তি লিখতে গিয়ে বিপদে পড়লাম—গল্প যেন জমতে চায় না। দু'মাস ধ'রে যদি কেবল বর্ণনাই লিখি তা হ'লে পাঠকেরা বিরক্ত হবে। লিখতেই হবে অথচ কি ভাবে গল্প জমাব জানি না—এ এক বিষম বিপদ। মাথা প্রায় খারাপ হয়ে উঠেছে এমন সময় সেই লজ্জাহীন চণ্ডীচরণ বিনা আহ্বানে, বিনা ভূমিকায়, বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে আমার সামনের চেয়ারটায় এসে বসে পড়ল চোখে এক অদ্ভুত করুণ দৃষ্টি ফুটিয়ে।

আমার নিষ্ফলতার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল হতভাগাটার উপর। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে আবার তাকে বলে উঠলাম, "আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে।"

চণ্ডীচরণ অতি কোমল স্বরে বল্‌ল, "বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ, র, কিন্তু একটি কথা বলতে চেয়েছিলাম এই যে, আপনার গল্পের একটি কোণে এই হতভাগ্যটাকে একটু স্থান দিলে আপনার কি এমন লোকসান হবে?"

লোকটির যে লজ্জা নেই তা একাধিকবার বলেছি। ধূর্ততায় তাকে ছাড়িয়ে যায় এমন কাউকে আমি জানি না। তাকে অপমান করলে কোনো ফলই হবে না জানতাম, সে-ও জানত কেউ তাকে অপমান করতে পারে না, কিন্তু কেন জানি না সে আজ মাথা ঠিক রাখার জন্যে একটা কবিরাজি তেল মেখে এসেছিল, তার গন্ধ পাচ্ছিলাম। বিরাজি তেল সে মাখল কেন? সে কি মরীয়া হয়ে এসেছে? সে কি বুঝতে পেরেছে আজ তাকে কঠিন অপমান সহ্য করতে হবে?

আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তাকে তাড়াতে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'ল, তবে কবিরাজি তেলের ক্রিয়া তার মতো স্থির মস্তিকেও আধ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। যাবার সময় সে আমাকে রীতিমতো শাসিয়ে গেল। ব'লে গেল, "একদিন আপনার পিছনে লেগে আপনাকে জব্দ করেছিলাম—এবারে আর একবার লাগতে হবে—আমার কাছে হার স্বীকার করেনি এমন লোক এ এলাকায় তো কাউকে । না।"—আরও স্মরণ করিয়ে দিল যে তার নাম চণ্ডীচরণ।

কিন্তু তার শাসনবাক্যে আমি ভয় পেলাম না। চণ্ডীচরণের হাতে যেটুকু ক্ষমতা ছিল তা সে একবার দেখিয়েছে—পরে আর পারেনি—তাকে আমি ভয় করব কেন? তা ছাড়া আমার গল্পে কাউকে ঢোকানোর হাত তার নয়, আমার। উপরন্তু গল্পলেখা চাকুরি নয়, আর যে কাগজে ছাপা হচ্ছে তার স্বত্বাধিকারীও সে নয়, সম্পাদকও সে নয়।

দ্বিতীয় কিস্তি লেখা শেষ হ'ল যথাসময়ে, তা ছাপাও হল কিন্তু

এবারে আমার গল্পে পাঠককে খুশি করতে পারলাম না। জানতাম খুশি করতে পারব না। সবাই বলতে লাগল, "গল্প কোথায়? এক-শিক্ষকের বিপদে আর এক শিক্ষক সাহায্য করেছেন এক শিক্ষকের সঙ্গে আর এক শিক্ষক অবসর সময়ে আড্ডা জমিয়েছেন, শিক্ষকেরা সবাই একসঙ্গে ছাত্র পড়িয়েছেন, যথাসময়ে তাদের পরীক্ষা নিয়েছেন, প্রমোশন দিয়েছেন, ভাল ছেলেদের পুরস্কার দিয়েছেন, খারাপ ছেলেদের শাস্তি দিয়েছেন, শিক্ষকদের যা যা করা উচিত সবই করেছেন, কিন্তু গল্প কৈ?"

তৃতীয় কিস্তিতে গল্প জমানোর চেষ্টা করলাম সবাইকে পথে বসিয়ে। বিমান আক্রমণের ভয়ে স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ, কোনো শিক্ষকের চাকরি নেই, নতুন চাকরির আশা নেই, অনেকের বয়সও নেই, এমনি অবস্থায় দিন কাটছে। তা ছাড়া গল্পে অতিরিক্ত আর একজনকে ঢোকালাম—আমাদের বৃদ্ধ সেক্রেটারিকে। কিন্তু তবু পাঠকেরা বলল, "চাকরি নেই, বয়স নেই মানছি—কিন্তু গল্পও যে নেই!"

এবারেও গল্প জমল না কেন ভাবছিলাম। শিক্ষকদের কথা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছি, কারো দৈহিক বৈশিষ্ট্যও বাদ পড়েনি। সেকেণ্ড মাস্টারের কপালের বাঁ দিকটায় যে কাটা দাগ আছে, দ্বিতীয় পণ্ডিত মশাইয়ের চশমার পাওয়ার যে 'মাইনাস'-সাত, ড্রইং মাস্টারের গোঁফ যে ধনুকের বাঁকা রেখার মতো নাকের নিচে ঝুলে রয়েছে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার যে দৈনিক পঞ্চাশটি পান এবং তিন তোলা দোক্তা খান, উর্দু শিক্ষক যে দাড়ি গোঁফ কিছুই রাখেন না এ সমস্তই আমি উল্লেখ করেছি।

এই ধরনের বর্ণনায় আমি যেমন তৃপ্ত, যাঁদের নিয়ে লিখেছি তাঁরাও তেমনি খুশি, কেবল খুশি নয় পাঠকেরা।

এমন অবস্থায় শিক্ষকদের সঙ্গেই আর একবার আলোচনা করা দরকার। সবাইকে খবর পাঠালাম বিকেলে দেখা করতে, বিকেলে কেউই এলেন না। সন্ধ্যার পরে এলেন একমাত্র ড্রইং মাস্টার—তাঁর চেহারার মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কথা শুনে বুঝলাম তিনি এসেছেন ঝগড়া করতে। শুনলাম আমি গল্পের ভিতর কৌশলে সবাইকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছি। আমি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললাম, "কৈ পাঠকেরা তো হাসেনি—আপনারা সবাই মিলে দু'দিন আগেও আমাকে প্রশংসা করে গেছেন।"

ড্রইং মাস্টার বললেন, "আগে ভাল বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন াপনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হচ্ছে।"

"কি ক'রে বুঝলেন?"

"আমার কথাই বলি। আপনি লিখেছেন, আমার 'নাকের নিচে একখানা ধনুক ঝুলে আছে, এ রকম সযত্নে তৈরি গুম্ফধনু সচরাচর কারো নাকের নিচে দেখা যায় না।'—এর অর্থ কি? এর অর্থ যার বোঝবার সে বুঝেছে এবং আমার পথ চলা প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলেছে—সন্ধ্যার পরে ভিন্ন পথে বেরোনো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু এইখানেই তো শেষ হবে না। লোকে ধনুক হাতে রাম লক্ষ্মণের ছবি দেখলে বলবে, "ঐ দেখ ড্রইং মাস্টারের গোঁফ, আকাশে রামধনু উঠলে বলবে ঐ দেখ ড্রইং মাস্টারের গোঁফ।"

আমি বললাম, "তাতে লজ্জা হবে রামধনুর, আপনার গোঁফের নয়। দেখুন, আপনি, ড্রইং শিক্ষক, আপনি শিল্পী, কোনো লোকের স্কেচ আঁকতে হ'লে আপনারা যা করেন, আমিও ভাষার দিক দিয়ে তাই করেছি।"

ড্রইং মাস্টার জোরের সঙ্গে বললেন "একে স্কেচ বলে না, বলে [illegible]। কিন্তু ব্যাপার এমন হয়ে পড়েছে যে, এখন গোঁফ কামিয়ে

ফেল্‌লে লোকে কাপুরুষ ব'লে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করবে—অথচ রাখা হয়েছে আরও কঠিন।"

আমি দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু আপাততঃ করতে পারলাম না। ড্রইং মাস্টার আমাকে যা বলবার (এবং না বলবার) সংক্ষেপে বলে বিদায় হলেন, আমি তখুনি বেরিয়ে গেলাম হেড পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে প্রায় চমকে উঠলাম। হেড পণ্ডিত এক নবীন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন—খুব গভীর পরামর্শ। হেড পণ্ডিতের সে সদাপ্রফুল্ল ভাবটি আর নেই, আমাকে বসতেও বললেন না। কিন্তু গিয়ে পড়েছি যখন, হঠাৎ ফিরে আসাটা কেমন যেন সম্ভব হ'ল না। হেড পণ্ডিত আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন আমি তাঁর ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছি।

সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার পণ্ডিত মশাই?"

পণ্ডিত মশাই বললেন, "অদৃষ্ট! সেক্রেটারি পাওনা টাকার জন্যে নালিশ করেছেন।"

"কেন, আপনি মেয়ের বিয়ের জন্যে যে টাকা ধার নিয়েছিলেন তার সবই তো পরিশোধ করেছেন, শুনেছিলাম বাকী টাকাটা আর আপনাকে দিতে হবে না?"

হেড পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফল ফল্‌তে আরম্ভ করেছে। আপনাকে বলেছিলাম আমাদের নিয়ে গল্প লিখতে—আপনি গল্পের ভিতর সবাইকে বিদ্রূপের পাত্র করে তুলেছেন। সেক্রেটারি মনে করেছেন সব-কিছুর মূলে আছি আমি—আমারই প্ররোচনায় আপনি গল্প লিখছেন।"

আমি বল্‌লাম, "আমি এখনি যাই সেক্রেটারির কাছে—দেখি কোনো প্রতিকার করতে পারি কি না।"

পণ্ডিত মশাই ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন, "না না যথেষ্ট হয়েছে, দয়া ক'রে ঐ কাজটি আর করবেন না, আমাদের পক্ষ নিয়ে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।"

এতদিন যাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলাম, তাঁর মুখের এই রূঢ় ভাষা আমাকে আহত করল। পঁচিশ বছরের হেডমাস্টারির পদমর্যাদা যাঁর খাতিরে তুচ্ছ ক'রে বন্ধু হিসাবে মিশতে গেলাম তিনি তার সম্মান রাখলেন না, এক ধাক্কায় আমাকে দূর ঠেলে দিলেন! ড্রইং মাস্টারের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছেন সবাই নাকি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কথাটা তা হ'লে মিথ্যা নয়। কিন্তু আমার এখন কর্তব্য কি?

অভিমান-ক্ষুব্ধভাবে পথে বেরোতেই দেখি উর্দু শিক্ষক হেডপণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে আসছেন। পথের ক্ষীণ আলোতে আমরা উভয়েই উভয়কে স্পষ্ট চিনতে পারলাম, কিন্তু তিনি যেন আমাকে দেখেননি এমনিভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। বুকে আর একটা ধাক্কা অনুভব করলাম।

শিক্ষকদের ব্যবহার এমন অস্বাভাবিক কি ক'রে হ'ল সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, অথচ তাঁরা যে সবাই মিলে একসঙ্গে আমাকে অগ্রাহ্য করলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে আমার মনও কঠিন হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলো ডিগবাজী খেয়ে উল্‌টে গেল। ভাবলাম বিনা অপরাধে এরা যদি আমার উপর অন্যায় করতে পারে আমিই বা ছাড়ব কেন? যারা ছিল সদ্‌গুণের আধার তারা হঠাৎ প্রায় শয়তান হ'য়ে উঠল আমার গল্পে। এতদিন গল্প চলছিল একটানা (কিংবা একঘেয়ে) স্রোতের টানে ভেসে—সেই স্রোত যেন হঠাৎ বাধা পেয়ে পাক খেয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, তার কলধ্বনি [illegible]তি তালে উঠল বেজে—পাঠক মহলে জেগে উঠল প্রবল উৎসাহ।

বন্ধুদের সম্পর্কে যে মোহ ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে গেল। যাদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলাম তারা যে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, এবং কুটিলতায় যে-কোনো মানুষের মতো—এইটে উপলব্ধি করে আজ যেন একটা আরাম বোধ করলাম।

এই শিক্ষকদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই। তাঁরা এখন আমার বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। চণ্ডীচরণ সবার কাছে বলেছে—"তোমাদের হেডমাস্টারকে দেখলে তো!—তোমরা তাকে চিনতে পারনি, আমি কিন্তু বহু আগেই চিনেছিলাম!"

দু'মাস ধ'রে আমার গল্প এগিয়ে চলল নতুন পথে, কিন্তু দু'মাস পরে হল মুস্কিল। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগল। একজন লিখলেন, "এত-গুলো ভদ্রলোক অভদ্র হ'য়ে উঠেছে এই ঘটনাটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে—আপনার লেখা এই কারণে গত দু'মাস আমাদের কাছে খুব মুখরোচক হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন ঘটল। আপনি যে কারণ দেখিয়েছেন তাতে আমরা খুশি হ'তে পারছি না, তারা আপনার প্রতি রুষ্ট হয়েছে আপনাকে ভুল বুঝে, কিন্তু তার জের কি মশাই দু'মাস ধ'রে চলে? এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে গল্পটিকে উদ্ধার করুন।"

পাঠকের এই প্রশ্ন অবৈধ নয়। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেই এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু ভেবে কিছু পাইনি। সামান্য কারণে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এমন শত্রু হয়ে দাঁড়াল কেন!

ঘরের সংকীর্ণ সীমানায় ব'সে আর গল্প লেখা চলল না, কারণ অনু-সন্ধানের জন্যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গায়ে পড়ে গিয়ে মিশতে হ'ল। ফলে যা জানতে পারলাম তা অতি ভয়ানক। জানা গেল সব কিছুর মূলে রয়েছে চণ্ডীচরণ। সে-ই প্রথমে শিক্ষকদের মন খারাপ করে দিয়েছে গল্পের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে। সে-ই সেক্রেটারির-

কাছে গিয়ে হেড পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা কথা বলে তাঁকে দিয়ে নালিশ করিয়েছে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত অনেক কথা সে জানে—সেই সব কথা সে খুব চাতুর্যের সঙ্গে আমার কাছ থেকে শুনেছে ব'লে প্রকাশ করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে আমি ক্রমে আমার গল্পের মধ্যে সেই সব কথা প্রকাশ করব বলেই গল্প লিখতে আরম্ভ করেছি।

শুনে স্তম্ভিত হ'লাম, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও পেলাম কম নয়, কেননা গল্পের পরবর্তী কিস্তির যথেষ্ট মশলা এই উপলক্ষে সংগ্রহ করা গেল এবং স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এবারে পাঠকদের খুশি করতে পারব। চণ্ডীচরণ কিভাবে আমার হাতে ঠকছে তা সে এখন বুঝতে পারবে না। সে যা কিছু করছে আমাকে অপদস্থ করার জন্যে, সেই সবই আমার বিজয়স্তম্ভের ভিত্তি রচনা করছে। তার সমস্ত চালচলন, সাপের মতো স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করে সরল লোকের মন ভাঙানো, সবই হচ্ছে আমার গল্পের উপাদান! প্রেরণাবিষ্ট হয়ে পরবর্তী কিস্তি লিখলাম এবং সেটা যখন ছাপা হ'ল তখন পাঠক মহলে নতুন করে সাড়া জেগে উঠল -সবাই আমার প্রশংসায় হ'ল পঞ্চমুখ। গল্প এগিয়ে চলল ছুটন্ত ঘাড়ার মত।

ছিলাম স্কুলমাস্টার, চিরদিন পরের লেখা বই পড়িয়েছি, তার মধ্যে লেশমাত্র আনন্দ পাইনি, আজ নিজের লেখার মধ্যে পেলাম প্রকৃত সৃষ্টির আনন্দ। হৃদয় স্ফীত হ'য়ে উঠল, মানুষকে দেখতে শিখলাম নতুন দৃষ্টিতে। উপলব্ধি করলাম, বাংলা দেশের শিক্ষকেরা কৃত্রিম মানুষ, তাদের সেই কৃত্রিমতা ভেঙে দিলে তার ভিতর থেকে যদি অমানুষ বেরিয়ে আসে তবু তারাই জীবন্ত মানুষ বলে পরিচিত হয় সবার কাছে,—কৃত্রিম শিক্ষককে কেউ মানুষ ব'লে চিনতে পারে না।

এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় আনন্দে প্রায় নাচতে উদ্যত হয়েছি এমন

সময় একখানা পোস্টকার্ড পেলাম, তাতে লেখা আছে, "মহাশয়, হার মানলেন তো ?—নিবেদক চণ্ডীচরণ।"

চিঠিটা পড়ে চমকে উঠলাম। হার মানলাম! কোথায়? কি ভাবে?....চণ্ডীচরণ মূর্খ।

কিন্তু রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে গিয়ে মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। গল্পটা গোড়া থেকে যতটা ছাপা হয়েছে সব আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেললাম। দেখলাম গল্পের প্রধান নায়ক আমি নই, চণ্ডীচরণই বটে।

(যুগান্তর, ১৯৪২)

—এক—

ঙ্কর যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকে দুটি বিষয়ে তার খুব ঝোঁক দেখা যায়,—এক হচ্ছে বিজ্ঞান, আর এক হচ্ছে ব্যবসা।

বিজ্ঞানচর্চা করত সে বাড়িতে। চিরুনি ঘষে কাগজের টুকরোর উপর ধরত, টুকরোগুলো লাফিয়ে উঠে লেগে যেত চিরুনির গায়ে। কোথা থেকে ম্যাগনেট সংগ্রহ করে সে আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা দেখিয়ে বাড়ির সবাইকে বিস্মিত করত। লিটমাস্ কাগজ সংগ্রহ করে লাল কাগজ নীল ও নীল কাগজ লাল করত। এমন কি বহু চেষ্টায় দস্তা এবং সালফিউরিক অ্যাসিড সংগ্রহ ক'রে বাড়িতে বসে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করা শিখল। রবারের বেলুনে সেই গ্যাস ভর্তি ক'রে আকাশে ছাড়ত।

তার ব্যবসারও হাতেখড়ি এই হাইড্রোজেন দিয়ে। ছেলেদের বেলুনে এই গ্যাস ভর্তি ক'রে সে চার আনা ক'রে দাম নিত।

খুবই হাল্কা ব্যবসা, কিন্তু এটা তার আরম্ভ মাত্র।

তারপর শঙ্কর স্কুল ছেড়ে ভর্তি হল কলেজে। আই-এসসি পাস করল। কিন্তু বি-এসসির বেড়াটা সে কোনো মতে আর টপকাতে পারল না।

—দুই—

শঙ্কর ব্যবসাজীবন শুরু করল এর পর থেকেই।

চালের ব্যবসা।

উত্তর বাংলার চাল দক্ষিণ বাংলায় এসে নানা আড়তে উঠতে লাগল।

মাঝখানের দালালিটা শুধু তার মুনাফা।

ইতিমধ্যে লাগল যুদ্ধ। যুদ্ধ এল দুর্ভিক্ষের ছায়া নিয়ে। ব্যবসার ভবিষ্যৎ হল অনিশ্চিত।

কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়।

লাভের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চালের আমদানি যত কমল, চাল প্রকাশ্যে বিক্রি যত বন্ধ হল, তত তার ক্ষতি পূরণ হল আর দিক দিয়ে। উপরন্তু এই নতুন পথে গোপন চালে মুনাফার অঙ্ক বেড়ে গেল আশাতীত।

অতিরিক্ত সুবিধাও ছিল।

শতকরা পঁচিশ ভাগ পাথর বিক্রি হতে লাগল চালের সঙ্গে চালের দরে। হাইড্রোজেনের মতো হাল্কা পদার্থে যার শুরু হয়েছিল, তার শেষ হল পাথরের মতো ভারী জিনিষে।

বাংলার দুর্ভিক্ষে যে-সব নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী ১৫০ কোটি টাকার মুনাফা শিকার করতে ৩০ লাখ লোকের দুঃখ ঘোচাল চিরদিনের জন্যে তাদের মধ্যে শঙ্করের অংশ কত টুকুই বা? সমুদ্রে একবিন্দু জলমাত্র। তার মধ্যে শঙ্করের মুনাফা-অংশে হয় তো খুব বেশি করেও মোট ৫০ জন লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রতি লোকের কঙ্কালে ৭৫০ টাকা করে মুনাফার অংশ। আত্মার তো মূল্য নেই।—তাছাড়া আত্মা অমর।

শঙ্কর অবশ্য শুধু চালের ব্যবসাই করেনি। সে যেটাকে 'সাইড বিজনেস্' বলত তাতে তার প্রতিভা খুলেছিল বেশি। সে চালের সঙ্গে ঘির ব্যবসা শুরু করেছিল। অনেস্ট বাঙালী ব্যবসায়ী হয়ে থাকার সে চেষ্টা করেছিল এই ব্যবসায়ে, কিন্তু অসাধু বাঙালীই তাকে অসাধু করে তুলল।

সে যেসব প্রতিষ্ঠানে ঘি যোগানের কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছিল সেখানে খাঁটি ঘি অচল হল এক চালানের পরেই।

ঘি খাঁটি কিনা তা কারো সততার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রিপোর্টের উপর। যাদের উপর রিপোর্ট লেখার ভার, তারা বলল, মশায়, আমাদের পকেটের দিকে তাকাতে হবে আগে। ঘি মন্থন করে আমাদের প্রাপ্য অংশ বের করুন আগে, তারপর সেই শূন্যস্থানে ভেজিটেবল ঘি ঢালুন বা মহুয়া তেল ঢালুন বা বাদাম তেল ঢালুন, রিপোর্ট ঠিক থাকবে।

—তিন—

বেশ চলছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে শঙ্কর আর তার ঘির পৃষ্ঠপোষকদের স্বাধীনতা গেল চলে। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হল। বুদ্ধিমান শঙ্কর ঘি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। সামান্য টাকার বিনিময়ে সে কনট্রাক্ট হস্তান্তর করে দিল।

রইল সেই চাল।—অর্থাৎ ৭৫ চাল আর ২৫ পাথর। এই চাল কলকাতার র‍্যাশন দোকানের মারফৎ আমাদের অতি পরিচিত।

কিন্তু এ পথেও বাধা এসে জুটল।

কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী লড়াই থামানোর জন্যে মহাত্মা গান্ধী জীবন পণ করলেন, তার ফলে হঠাৎ একদিন হিংস্রতম গুণ্ডার হৃদয় গলল। অনুতপ্ত হয়ে তারা অস্ত্র সমর্পণ করল গিয়ে গান্ধীজির কাছে।

শঙ্কর সবই লক্ষ্য করছিল। তার মধ্যেও একটা বিবেক ছিল। সেই বিবেক তাকে দংশন করতে লাগল দিবারাত্র। লাখ লাখ লোক মরেছে যখন, তখন কিন্তু বিবেক চুপ করে ছিল। তার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আজ গুণ্ডার মধ্যে মনুষ্যত্ব জেগেছে এ বড় মারাত্মক কথা।

শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগল। মনুষ্যত্বের প্রশ্ন। ভেজাল খাইয়ে মানুষ মারা কি কম অপরাধ?

যে লোকটি কোনোদিন কবি নয়, বসন্তকালের দক্ষিণা বাতাসে যেমন তারও মন মাঝে মাঝে হু হু করে ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বহীন শঙ্করের মনেও সহসা এক বিবেকের হাওয়া বয়ে গিয়ে তাকে উতলা ক'রে তুলল।

শঙ্কর বুঝতে পারল মনের কায়েমী স্বার্থে ভাঙন ধরেছে।

সে মহাত্মা গান্ধীর কাছে গিয়ে তার অনুতাপের চিহ্নস্বরূপ এক মুঠো কাঁকর সমর্পণ করল। বলল, আমিও হিংস্র, এই আমার অস্ত্র, একে ত্যাগ করলাম।

গান্ধীজি তাকে আশীর্বাদ করলেন। শঙ্কর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—চার—

তিনমাস কেটে গেছে। বাংলাদেশেরই কোনো একটি বিশেষ জায়গায় এক গোপন ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক বসে সাধনা করছে।

বৈজ্ঞানিকের বিবেক জেগেছে। বিজ্ঞানের মহৎ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এতদিন সে যে অন্যায় করেছে তার জন্যে সে আজ সত্যই অনুতপ্ত।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি লোকের জীবনের দাম আছে। ধীন বাঙালীকে বাঁচানো মানেই নিজেকে বাঁচানো। এদেশ হিন্দু-মুসলমান সবার দেশ। এদেশে একটি হিন্দুর জীবনের যে মূল্য একটি মুসলমানের জীবনের সেই মূল্য এদেশের প্রত্যেকটি লোক এদেশের সম্পদ।

বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। একটি বিশেষ পরীক্ষায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট ল্যাবরেটরিটি কাঁচের জার, টেস্ট টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামে ভর্তি হয়ে গেছে। এক-ধারে মাইক্রোস্কোপ। বড় বড় জারে সাজিমাটি, কেওলিন, পিউমিস্ পাউডার। কাঁচের ছিপিযুক্ত কাঁচের বোতলে নানা রকম অ্যাসিড। আরও নানারকম রাসায়নিক। ওজন করার তিনটি কেমিক্যাল ব্যালান্স। এক দিকে চীনে মাটির বড় বড় চৌকো প্যালেটে কৃত্রিম চাল। চালগুলো হাওয়ায় শুকোচ্ছে। আর একটা পাত্রে সের দশেক অকৃত্রিম চাল। বৈজ্ঞানিক একটা প্যালেট থেকে কৃত্রিম চাল কিছু সংগ্রহ ক'রে

একটি বড় টেস্ট টিউবে পুরল। তারপর তার মধ্যে জল ঢালল। টিউব নাড়া দিল। কৃত্রিম চালগুলো সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল জলে। স্বচ্ছ জল ঘোলা হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সে সবিস্ময়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, আর এক পরীক্ষায় রত হল। আরও কিছু কৃত্রিম চাল নিয়ে ওজনে চাপাল। পাল্লার এক দিকে এক চামচে খাঁটি চাল আর একদিকে এক চামচে কৃত্রিম চাল।

ওজন প্রায় সমান !!

বৈজ্ঞানিকের সাধনা সফল হল এত দিন পরে।

—পাঁচ—

শঙ্কর ভেজালের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করল জোর। বাঙালী জাতিকে বাঁচাতে হবে। চালের সঙ্গে সিকিভাগ পাথর খেয়ে পাকস্থলীতে পাকক্রিয়ার কি পরিমাণ বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, বাঙালীর পরমায়ু কি ভাবে কমে যাচ্ছে তার বিভীষিকাপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল সে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে। বলল, বাঙালী প্রস্তর যুগ পার হয়ে এসেছে বহু সহস্র বছর আগে। আর সে কতকগুলো চোরাকারবারীর

হাতে পড়ে প্রস্তরযুগে ফিরে যেতে রাজি নয়। বাঙালী সে কথা শুনে পাথরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

শঙ্করের বিবেক বাঁচল, বাঙালী জাতি বাঁচল, এবং শঙ্কর নিজেও বাঁচল।—নিজে বাঁচল অকারণ হাঙ্গামা আর লোকসান থেকে।

সে অল্পদিনের মধ্যেই তার অবিষ্কারের সমস্ত তথ্য বহু টাকায় বিক্রি করে দিল এক কোটিপতি ব্যাবসায়ীর কাছে। ঘুঘু ব্যবসায়ী নানাভাবে পরীক্ষা এবং যাচাই করে বুঝতে পারল—দেশের পাকস্থলীর ক্ষতি না ক'রে তারা বংশ বংশ ধরে এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করতে পারবে। এই কৃত্রিম চাল তৈরি করা যাবে অত্যন্ত অল্প খরচে। যন্ত্রাদি কিনতে যা প্রাথমিক খরচ! কৃত্রিম চাল আসল চালের সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ মেশানো যাবে সহজেই, কেউ ধরতে পারবে না। পরিমাণের সঙ্গে ওজনের অনুপাত ঠিক থাকবে। উপরন্তু, রান্নার আগে চাল ধোয়ার সময় এই কৃত্রিম চাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গলে ধুয়ে যাবে, এর এক কণাও কারো পেটে যাবে না। ভেজালের উপকরণ হিসাবে এই আবিষ্কার একমাত্র দুধে জল মেশানোর মতোই নিরাপদ।

শঙ্কর নিজেকেই বলেছিল—মুনাফা-শিকারীদের লোভ কখনও নিবৃত্ত করা যাবে না। তারা এই লোভে চিরকাল দেশকে দুদিক থেকে ধ্বংস করবে। টাকার দিক থেকে এবং পাকস্থালীর দিক থেকে। কিন্তু শঙ্করের নতুন আবিষ্কারের ফলে টাকায় চার আনা মাত্র থিক ক্ষতি হবে, কিন্তু দৈহিক ক্ষতির হাত থেকে দেশ রক্ষা পাবে।

অতঃপর সমস্ত তথ্য হস্তান্তর করে, টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে শঙ্কর এবং তার বিবেক হাইড্রোজেনের মতোই হাল্কা বোধ করতে লাগল।

(হিন্দু, ১৯৪৮)

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

জন্মেজয় সিদ্ধান্ত এ পৃথিবীতে না জন্মালে কলকাতা শহরের একটা অঙ্গহানি হ'ত। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এই যে, তেমন অবস্থায় দিনের বেলা আকাশ থেকে শহরের দিকে তাকালে মনে হ'ত এর একটা অংশ মরুভূমি, রাত্রে দেখা যেত আলোকিত শহরের একটি বিশেষ অংশ বিষম অন্ধকার।

তিনি একটি পাড়াকে এমন সরগরম ক'রে রাখতেন যে সংক্ষেপে উপরোক্ত উপমা ভিন্ন তা আর কোনো উপায়ে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব।

মজলিশ তাঁর গৃহে লেগেই আছে। পয়সাওয়ালা লোক, খরচের হাতও দরাজ, তদুপরি তিনি দেশের জন্যেও কিছু খরচ করতে চান। সুতরাং শহরের উৎসাহী লোকেরা অনেকেই সেখানে গিয়ে কেউ বা সংগঠন কাজে, কেউ বা জাতীয় মুখপত্র প্রকাশে, কেউ বা মফঃসলের কাজে, কেউ বা প্রচার কাজে, কোনো না কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদ কোনো এক সময় অবশ্যই পেয়ে যাবে এই আশা সর্বদাই পোষণ ক'রে থাকে।

সিদ্ধান্ত-গৃহে সকলেরই অবারিত দ্বার। তাঁর মজলিশ গৃহ এবং চা-প্রস্তুত গৃহ পরস্পর-সংলগ্ন। বাইরে থেকে দুটি গৃহের পথই প্রশস্ত,

কোন্‌টায় কে আগে প্রবেশ করবে, তা প্রবেশকামীর মর্জির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের আশাও জাগে ঠিক এই কারণেই।

মজলিশে পরিচিত অপরিচিত সবাই আসে, নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, নানা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয় এবং সে পরিকল্পনায় পরাধীনতা বর্জন এবং আর্য সংস্কৃতির পুনঃস্থাপন একই সঙ্গে উপাদান যোগায়।

১৯২১ সালের একটি বিশেষ দিনে সিদ্ধান্ত-গৃহে যে মজলিশটি ব'সেছিল তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আর্য কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এঁরা এঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তাই নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। ঠিক হয়েছে, দুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হবে—সেই উপলক্ষে মজলিশ গৃহে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করতে হবে।

কি কি করা হবে তার প্রোগ্রাম রচনা ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু মজলিশ তখনও পুরো দমে চলছে। আলোচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক আগেই স'রে এসেছে এবং যথারীতি ভারতীয় স্বাধীনতার কথাই নরায় খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। বলা বাহুল্য এই আলোচনাটাই এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মজলিশে পরিচিত অপরিচিত বহু লোক উপস্থিত, এবং যে-কোনো ব্যক্তির যে-কোনো বিষয়ে আলোচনার অধিকার থাকাতে কারও উঠে যাবারও কোনো গরজ নেই।

মজলিশে সেদিন দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি এ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে কোনো কথাই বলেন নি, কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দেখা গেল তাঁরও কিছু বক্তব্য আছে।

লোকটি দেখতে পাঞ্জাবীর মতো, ফর্সা, এবং মুখমণ্ডল দাড়িতে

আচ্ছন্ন, দেখলে মনে হয় যেন রবি ঠাকুর জয়সিংহের সাজে বিসর্জন অভিনয় করতে চলেছেন।

মজলিশে একজন বলছিলেন, "ইংরেজদের তুলনায় আমাদের তো কোনো বিষয়েই হীনতা নেই, বরঞ্চ বহু বিষয়েই আমরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অতএব তাদের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার চাই-ই, এবং এ চাওয়া কেউ রোধ করতে পারে না।"

দীর্ঘদেহ লোকটি এই সময় আচম্বিতে সবাইকে চমকিত ক'রে ব'লে উঠলেন, "অধিকার চাইলে অধিকার দিতে হয়।"

মজলিশের সুর এই প্রথম বেসুরো বাজল। এ যেন ঐকতানের মধ্যে হঠাৎ বিদ্রোহের সুর। চমকে গেল সবাই।

একজন প্রশ্ন করল, "আপনি কে মশাই?"

দীর্ঘদেহ বললেন, "আমার কথাটা বিচার করুন, আমি কে, সে কথা অবান্তর।"

রীতিমতো ঝগড়ার কথা। মজলিশও প্রস্তুত হতে লাগল ঝগড়ার জন্যে।

একজন প্রশ্ন করল, "আপনি কি বলতে চান?"

"আমি বলতে চাই যে আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবী, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি।"

কথাগুলো অধিকাংশের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। ওঁদের মধ্যে যিনি একটু বেশি পণ্ডিত তিনি এগিয়ে এলেন।

সমস্ত মজলিশ-আবহাওয়ায় যেন একটা যুদ্ধের সুর বেজে উঠল। পণ্ডিত বললেন, "আমাদের দেশে সব সময়েই আপনার মতো কতকগুলো লোকের আবির্ভাব ঘটে বলেই সব পণ্ড হয়। আমাদের

দেশের শ্রেণীবিভাগের কথা তুলে এঁরাই স্বাধীনতা লাভের পথে বিঘ্ন ঘটান।”

সবাই সে কথার প্রতিধ্বনি ক’রে ব’লে উঠল “ঠিক কথা।”

দীর্ঘদেহ বললেন, “আপনি যতই বলুন, আপনাকে এ কথা মানতেই হবে যে, পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি, সেক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে ব’লে মানতে অভ্যাস করেছি। কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে একথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।”

এই কথাগুলো আরও কঠিন হয়ে পড়াতে পণ্ডিতের পক্ষেও এর মর্মগ্রহণ করা শক্ত হল। উচ্চারণের দৃঢ়তা সবার মনে অতিরিক্ত দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলল। অথচ মুখের মতো জবাব কেউ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পণ্ডিত কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দীর্ঘদেহ বলতে শুরু করলেন, “এমনি ক’রে যেদেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস ক’রে রেখেছে, সে দেশে কর্তৃত্বের অধিকার পাইবার সত্যকার জোর আমাদের নিজের মধ্যেই থাকতে পারে না।”

পণ্ডিত তীব্রস্বরে ব’লে উঠলেন, “আপনি ভুল বলছেন। আমরা নিজের জোরেই স্বাধীনতা আদায় করব, পরের বদান্যতার উপর নির্ভর করব না।”

দীর্ঘদেহ গম্ভীরভাবে বললেন, “পারবেন না। কারণ মানুষ যেখানে নিজেকে অত্যন্ত ছোট এবং অপমানিত ক’রে রাখে, সেখানে তার কোনো দাবী কারও মনে গিয়ে পৌঁছয় না।”

“তার মানে?”

"তার মানে দাবী করবে কে? আপনার দাবীর সঙ্গে দেশের লোকের দাবী এক হয়ে মিলবে না।"

পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি বলতে চান, ঠিক ক'রে বলুন তো। ছোট এবং অপমানিত করার কথা আপনি কি গায়ের জোরে বলছেন না?"

"না তা বলছি না। শুধু নিজেদের সম্পর্কেই নয়, মুসলমানদের সম্পর্কেও আপনারা নিজেকে ছোট করেছেন।',

এইবার এঁরা বুঝতে পারলেন বক্তা কোন্ ঘৃণ্য কথাটি বলতে চান! বক্তার দুরভিসন্ধি আন্দাজ করতে পেরে পণ্ডিত কড়া ভাবে বললেন, "আপনার কথাটি আরও স্পষ্ট ক'রে বলুন, মশাই।"

"স্পষ্ট ক'রে বললেও ঐ একই কথা বলতে হয় যে মুসলমানদের আমরা আত্মীয় ক'রে তুলতে পারি নি।',

মুসলমানদের কথায় সবাই বিচলিত হ'ল, সবাই প্রতিবাদ করতে লাগল, কেউ বলল, "বলেন কি মশাই, ওদের সঙ্গে মিলব?" কেউ বলল, "তেল আর জল কখনও মেলে?"

দীর্ঘদেহ দৃঢ়স্বরে বললেন, "মেলে। মেলাতেই হবে, এবং যতদিন না মিলবে ততদিন দেশের মুক্তি নেই।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "অসম্ভব! অসম্ভব! ওরা মিলবে না।"

দীর্ঘদেহ স্থিরভাবে ব'লে যেতে লাগলেন, "কেন মিলবে না ভেবেছেন? আপনারা মিলতে চান না ব'লে ওরা স'রে যায়। কিন্তু কিন্তু এহ বাহ্য, এটুকুই শেষ কথা নয়। বাইরে থেকে মেলা-না-মেলার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের দিক দিয়ে ওদের যে অপমান আমরা করি তা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। মিলতে যদি হয় সামাজিকভাবেই মিলতে হবে।"

সবাই বিদ্রূপের সুরে হো হো ক'রে হেসে উঠল। কেউ রাম নাম উচ্চারণ করতে লাগল।

দীর্ঘদেহ বললেন, "হাসবার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু তার আগে একটু চিন্তা করতে শিখুন। ভেবে দেখেছেন, ভারতবর্ষকে আমরা কাদের ভারতবর্ষ ব'লে জানি?"

কিন্তু তাঁকে আর কিছুই বলতে দেওয়া হ'ল না, হৈ হৈ ক'রে এমন চীৎকার শুরু হ'য়ে গেল যে তার মধ্যে কথা বলা অসম্ভব।

পণ্ডিত এগিয়ে এসে বললেন, "যা অসম্ভব তাই প্রচার ক'রে আপনি বিরোধটাই পাকা করতে চান?"

দীর্ঘদেহ স্থিরভাবেই বললেন, "অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে মরি, এটা আমার স্বভাব।"

একজন বলল, "এ লোকটা গভর্মেণ্টের লোক।"

আর একজন বলল, "বোঝাই যায়, ভেদ সৃষ্টি ক'রে বিদেশী শাসন কায়েম করার ব্যবস্থা করতে এসেছেন উনি।"

আর একজন বলল, "ভুল জায়গায় এসেছেন।"

আর একজন বলল, "সে ভুল উনি বুঝতে পেরেছেন।"

পণ্ডিত বললেন, "মান থাকতে থাকতে স'রে পড়ুন।"

দীর্ঘদেহ বিনা প্রতিবাদে উঠে গেলেন। তাঁর চোখে জ্বালা ছিল না, ছিল বেদনা। কিন্তু তাতে বিদ্রূপবর্ষণে এঁদের কোনো বাধা হ'ল না। তিনি ওঠামাত্র সবাই নানারকম মন্তব্য প্রকাশ ক'রে নিজেদের চতুর বুদ্ধিতে নিজেরাই মুগ্ধ হতে লাগলেন।

এ বিষয়ে কারও সন্দেহ রইল না যে দেশের একটি আসল শত্রুর মুখোশ তাঁরা আজ খুলে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র জন্মদিনের উৎসব এঁরা খুব ঘটা ক'রেই করেছিলেন। আর্য

কবির গৌরবে সে দিন সভাস্থ সবাই গৌরব বোধ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা খবর শুনে উদ্যোক্তারা বড়ই দ'মে গেছেন। এঁরা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানতে পেরেছেন সেদিনকার সেই দীর্ঘদেহ লোকটিই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি সত্যই জয়সিংহের ভূমিকা অভিনয় ক'রে সেই পোষাকেই ফিরছিলেন, এবং সঙ্গী বন্ধুর অনুরোধে সিদ্ধান্তের মজলিশে কিছুক্ষণ এসে বসেছিলেন। তাঁর ভরসা ছিল কেউ তাঁকে চিনতে পারবে না। তিনি আলোচনার সময় যে সব কথা ব্যবহার করেছেন তা তাঁরই নিজস্ব কথা এবং সেগুলো নাকি সবই তাঁর বইতে ছাপা আছে।

(অরণি, ১৯৪৫)

অভিনন্দন

সভায় লোক গম গম করছে। সে অবশ্য সভার ঘরটা খুব বড় নয় বলেই।

মাঝারি হল-ঘর এক জমিদার বাড়ির। জমিদার স্বয়ং সভার একজন উদ্যোক্তা।

কবি হলধর হালদারের আজ ত্রিংশত্তম জন্মদিন। এই জন্ম তিথি পালন করা হচ্ছে আজ বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব। কারণ এ দেশে সাহিত্যের যদি বা কিছু মর্যাদা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিকের মর্যাদা, বিশেষ ক'রে এত অল্প বয়সে কেউ পায়নি। রবীন্দ্রনাথও এত কম বয়সে দেশবাসীর তরফ থেকে প্রকাশ্য সভায় কোনো অভিনন্দন পাননি।

কিন্তু বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে, দেশ উন্নতির পথে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। এমন অবস্থায় হলধর হালদারের মতো কবিকে জাতীয় অভিনন্দন লাভের জন্যে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেওয়া জাতীয় কলঙ্ক। দেশের মন জেগেছে, স্বাধীনতা এসে গেছে, এই তো বীর পূজার সময়। রাজনীতির দিকে এই বীর পূজা শুরু হয়েছে অতি ব্যাপক ভাবে। ইংরেজ তাড়ানোর অভিপ্রায়ে যারা একদিনের জন্যেও গোপনে গুলিছোঁড়া অভ্যাস করেছে তারা সবাই পূজনীয়। তাদের পূজা আগে। কিন্তু এই পূজা এমন আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হয়েছে যে এর মধ্যে সাহিত্যিকদের কথা কেউ ভাবছেই না।

স্বাধীনতা লাভের আগের দিন কিন্তু সাহিত্যিকেরা ভেবেছে তারাই দেশের সংস্কৃতির পরিচালক, স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়েছেও তারাই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তারা চাপা পড়ে গেছে। কলমকে লোকে ভুলে গেছে, চারদিকে বোমাপিস্তলের জয় ধ্বনি, আর কিছু না। লোকে বলছে মশায় আত্মত্যাগ চাই। কটা সাহিত্যিক মরেছে এই স্বাধীনতার কাজে? এমন কি এত বড় দাঙ্গা হয়ে গেল এর মধ্যেও কোনো সাহিত্যিক মরেছে? ১৯৪৬-সালের প্রথম দাঙ্গায় দুজন সাহিত্যিক নিখোঁজ হয়েছিলেন মাত্র কিন্তু তাও বেশি দিনে জন্যে নয়।

তা ছাড়া দেশকে বাঁচানোর জন্যে শুধু আত্মত্যাগেরও কোনো দাম নেই। সে রকম আত্মত্যাগ তো মশায়, যারা নিজেরা না খেয়ে দেশকে খাইয়েছে সেই কোটি কোটি চাষাও করেছে। তাদের ভাগ্যে কটা অভিনন্দন জোটে? জোটে না, তার কারণ, সে আত্মত্যাগে নাটকীয় গুণ থাকে না, সভা সমিতিতে তার উপর কোনো বক্তৃতা দেওয়া যায় না। নাটকীয় গুণবিশিষ্ট আত্মত্যাগই আসল আত্মত্যাগ, ওকেই বলে দেশপ্রেম। বেছে বেছে এই দেশপ্রেমকে পূজো না করলে গণতান্ত্রিকতার সম্মান থাকে কোথায়?

সুতরাং সাহিত্যিকরা আর অপেক্ষা করতে পারে না। হলধর হালদারের মতো সাহিত্যিক তো নয়ই। আপাত দৃষ্টিতে হঠাৎ এ ঘটনাকে বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটি তলিয়ে দেখুন। কবি ও কথাশিল্পীরাও দেশপ্রেমিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের ছবি টাঙিয়ে একটা প্রদর্শনীও হয় না। তারা ইতিপূর্বে যেটুকু সম্মান

পেয়েছে তার জন্যে দেশের লোক হয় তো এখন অনুতাপ করবে। এই সম্মান তারা এখন নিজেরা চেষ্টা করে যদি না উদ্ধার করতে পারে তা হ'লে দেশের পরিণাম অতি ভয়াবহ। হয় তো হঠাৎ একদিন প্রবন্ধ লেখকেরা দেশপ্রেমিক হিসাবে পূজো পেয়ে বসবে, কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে তারাও এখন একটা মর্যাদা পাচ্ছে। সুতরাং সব দিক ভেবে চিন্তেই স্বাধীন বাংলায় কবি হলধর হালদারকে দিয়ে প্রথম সাহিত্যিক পূজা শুরু হল। এতে অতঃপর পালাক্রমে সবাই পর পর অভিনন্দন পেতে পারবে তাদের জীবিতকালেই। বাংলা দেশের পরমায়ুর গড় তেইশ বছর। কে কবে মরে যায় ঠিক নেই। সে হিসাবে ত্রিশ বছরের হলধর হালদারের তো জীবনের মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তা ছাড়া রচনা-সংখ্যার দিক দিয়ে তাকে প্রবীণ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সে কবিতা লেখা শুরু করেছে আঠারো বছর বয়স থেকে। তার বারো বছরের কাব্যজীবনে কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার। এত অল্প দিনে এত কবিতা—দেশপ্রেমের চূড়ান্ত প্রমাণ।

সভা জমে উঠেছে। হলধর হালধারকে উপযুক্ত সম্মানই দেওয়া হচ্ছে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ জাতির পক্ষ থেকে। হলধরের রচিত গান দিয়েই সভার উদ্বোধন হল। তারপর বক্তারা উঠতে লাগলেন একে একে।

প্রথম বক্তা বললেন, "হলধর হালদার বাংলার গৌরব। তিনি দেশের দুঃখ দুর্দশার গান গেয়ে চলেছেন হৃদয়ের সকল আবেগ দিয়ে। যখন তিনি প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন—সে আজ বারো বছর আগের কথা—সে সময় তিনি বাংলার পাখী, বাংলার আকাশ, এবং বাংলার বাতাসকে তাঁর কাব্যের বিষয় বস্তু করেছেন। তারপর, তাঁর কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। এই পর্বে আকাশ থেকে তাঁর দৃষ্টি যে

ক্রমশ মাটির দিকে ফিরছে তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় তাঁর 'কেঞ্চু' নামক গদ্য কবিতায়। এই কবিতাটি আমি পড়ে শোনাচ্ছি।—কেঞ্চু হচ্ছে আমাদের সুপরিচিত কেঁচো।"

বক্তা পাঁচ মিনিট ধরে পড়লেন কবিতাটি।

তারপর বলতে লাগলেন, "এ এক আশ্চর্য কাব্য। বাঙালীকে শেষ পর্যন্ত কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়ানোর শখ ছেড়ে তার চিরদিনের বাসস্থান মাটিতেই পড়ে থাকতে হবে—সেই কথাটা একটা কঠোর ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন এতে। কিন্তু বলতে পারেন এই কেঞ্চু কে? এই কেঞ্চু হচ্ছি আমরা, কারণ আমাদের মেরুদণ্ড নেই, আমরা গর্তে বাস করি—বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমাদের অপরিচিত। এই দিকেই কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটাই হল কবিধর্ম। কবির কাজই হল নবযুগের সূচনা করা। কবি হলেন সত্যদ্রষ্টা, হলধর হালদারও সত্যদ্রষ্টা। আর সত্যদ্রষ্টা যিনি তিনিই হচ্ছেন ঋষি। হলধর হালদার ঋষি।"

করতালি ধ্বনিতে সভাঘর মুখরিত হল।

দ্বিতীয় বক্তা বললেন—"আমি ওঁর 'হিমালয় ও বঙ্গোপসাগর" নামক কবিতাটিকে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিবেচনা করি। কারণ এই কবিতার মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ বঙ্গ বিচ্ছেদের সুরটি ফুটিয়েছেন। ১৯৪৫-এ ১৯৪৭-এর আভাস ধরা পড়েছে তাঁর কল্পনায়। হিমালয়ের প্রস্তরীভূত তরঙ্গের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরল তরঙ্গের তুলনা করে তিনি যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার কথা আমি নতুন ক'রে বলব না, আমি বলতে চাই তাঁর ঋষিসুলভ দৃষ্টির কথা। ১৯৪৫ সাল—কবিতাটির রচনাকাল। কিন্তু তবু হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী দেশগুলোর কথা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। তার অর্থ, ১৯৪৭ সালের বাউণ্ডারি কমিশন উত্তরে হিমালয় সংলগ্ন

দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন চব্বিশপরগণা-মেদিনীপুর যে একই রাষ্ট্রে রাখবেন তার ইঙ্গিত আছে এতে। কবি মধ্যবর্তী জেলাগুলোর কোনো বৈশিষ্ট্যই এই কবিতায় স্থান দেননি। দিতে পারতেন। পাহাড় ও জলের ঢেউয়ের সঙ্গে ধানক্ষেতের ঢেউ উল্লেখ করতে পারতেন, কিন্তু কোন্ ধানক্ষেত কোন্ রাষ্ট্রে পড়বে তা নিয়ে পাছে গোলমাল হয়, সেজন্যে তাঁর ধ্যান চিত্রে ধানক্ষেত কোনো ছায়াপাত করেনি। অতএব হলধর হালদার যে ঋষি এই কথাটি আশা করি আমিও প্রমাণ করতে পেরেছি।"

সভাঘর আবার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হল।

বক্তৃতা চলল পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে। কেউ কবিতা পাঠ করলেন, কেউ গান গাইলেন, কেউ নাচলেন, এবং সব শেষ হলে সভাপতি বললেন—

"আমরা আজ হলধর হালদারকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছি এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, 'এ অভিনন্দন শুধু আমাদের এই কয়েক জন সাহিত্যিকের নয়, এ হচ্ছে সমস্ত বাংলাদেশের অভিনন্দন।' কিন্তু আমি কথাটা একটু অন্যভাবে বলতে চাই। আমি বলি এ অভিনন্দন বাংলাদেশকেই অভিনন্দন। কারণ হলধর হালদারের কাব্যে দেশের মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে।—অতএব হলধর হালদারই বাংলাদেশ।"

সভাপতি বলতে লাগলেন, "আমি হলধর হালদারের কাব্যে একটি অতি গভীর এবং মূল্যবান ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। তিনি গত এক বছরের মধ্যে ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগের উপর এক হাজার, দাঙ্গার উপর সাতশ, বোমার যুগের উপর পাঁচশ, ১৫ই অগস্টের উপর সাড়ে চারশ এবং বাউণ্ডারি কমিশনের রায়ের উপর তিনশ কবিতা লিখেছেন। কবির উদ্দেশ্য আপনারা কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? মোটামুটি এক রকম

অবশ্যই বুঝেছেন, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য থেকে তার শাঁস গ্রহণ করতে হলে খোসা ছাড়িয়ে, খোল ভেঙে, ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। আমি-তা করেছি। এবং করে যা পেয়েছি তা হচ্ছে এই যে স্বভাবত উদ্যমহীন বাঙালীর সম্মুখে অবিলম্বে-কর্তব্য কোনো কাজের লোভনীয় পরিকল্পনা নেই, অথচ স্বাধীন বাংলায় বাঙালীকে একদিন না একদিন কাজের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। তাই বাঙালী জীবনে তৎপরতা এবং কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলার জন্যে আপাতত হাতের কছে যা আছে তারই দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তার মনে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করা দরকার। আমরা কি ছিলাম তা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। দাঙ্গায় মাঝে মাঝে উস্কানি দিয়ে হাত পা চালনা শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাই হলধর হালদার তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন বাঙালী উদ্বোধনের কাজে। বাঙালীত্ব উদ্বোধনের কাজে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়ে তোলার কাজে। তাই হলধর হালদার আমার মতে মহাবাঙালী এবং মহামানব।"

সুদীর্ঘ আধঘণ্টাব্যাপী হর্ষধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। হলঘর খালি হয়ে গেল ধীরে ধীরে। সভার উদ্যোক্তারা দশ বারো-জন মিলে জমিদারের বৈঠকখানা ঘরে নিমন্ত্রিত হলেন চা খেয়ে যাওয়ার জন্যে। হলধর হালদারকে শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্য পথে বের করে নিয়ে গেল ভক্তরা।

চায়ের আসরে প্রথম বক্তা বললেন, "কেঞ্চু কবিতাটি একটা ধাপ্পা। রূপক টুপক কিছুই নেই ওতে।"

আর একজন বললেন, " 'হিমালয় ও বঙ্গোপসাগর' টাই বা কি হয়েছে?"

আর একজন বললেন "গত এক বছরের সব কবিতাই দেখেছি—যে-

সব দাবী করা হল, যে সব ইঙ্গিত আছে বলা হল, সে অনেকটা জোর করে নয় কি ?"

আর একজন বললেন, "সত্য কথা বলতে কি ওর কোনো কবিতাতেই মনে কোনো ছাপ আঁকে না।"

সভাপতি বললেন, "ও শালা আবার কবিতা লিখতে জানে না কি!"

(অভ্যুদয়, ১৯৪৬)

উজ্জ্বল পোষাকে আর নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে লাবণ্যলতা তার ভাবী শ্বশুরকে এসে প্রণাম করল। নবদ্বীপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বললেন—এসো মালক্ষ্মী, বসো।

লাবণ্য খুব ধীর ভাবে মাথাটি নিচু করে বসল।

নবদ্বীপচন্দ্র তার চোহারা দেখে মুগ্ধ হলেন। মনে মনে বুঝতে পারলেন, না বলবার আর উপায় নেই।

চারিদিকে কৌতূহলী চোখ। পাশে লাবণ্যের পিতা বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ বলতে লাগলেন···কিন্তু কি বলতে লাগলেন তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই—যেমন সব কন্যার পিতাই এ ক্ষেত্রে বলে থাকে —গৃহকর্ম, শেলাই, রান্না, গান—সব বিষয়ে মেয়ে খুব নিপুণা ইত্যাদি।

নবদ্বীপচন্দ্র খুশি মনেই সব নিলেন। বললেন হবেই তো, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যেখানেই যাক ঘরের সব ভারই তো নিতে হবে ধীরে ধীরে।

তারপর মেয়ের দিক চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটি কি মা?

লাবণ্য লজ্জায় ক্ষীণকণ্ঠা হল। কোনো মতে উচ্চারণ করল শ্রীমতী লাবণ্যলতা চৌধুরী।

নবদ্বীপচন্দ্র খুশিপূর্ণ হাসি হেসে বললেন—লা—ব—ণ্য—ল—তা—বেশ নাম। লাবণ্যলতা মানে কি জান তো?

লাবণ্যের মাথা আরও একটু নত হল। আশেপাশের কৌতূহলী চোখগুলো একটি গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র তাদের অহেতুক ভয় দূর করে দিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নামের কি কোনো অর্থ থাকে? ও শুধু নামই। যে মানুষের যে নাম সেই নামে সেই মানুষটিকেই বোঝায়, নইলে নামের অর্থ ধ'রে মানুষকে মেলাতে হলে মুশকিলে পড়তে হত, তাই না? এই ধর না কেন যে আমিও নবদ্বীপের চাঁদ নই, আর তোমার বাবাও বিশ্বের নাথ নন। কি বলেন চৌধুরী মশায়?

বিশ্বনাথ হো হো ক'রে হেসে বললেন, বিশ্বনাথের একটু কৃপা পেলেই এখন বাঁচি, আর কিছু চাই না।

আবহাওয়ার থমথমে ভাবটা এই ভাবে সহজেই কেটে গিয়ে সবারই মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর লাবণ্যলতা নবদ্বীপচন্দ্রের আদেশক্রমে অন্যান্য রীতি গুলোও পালন করল একে একে। অর্থাৎ একখানা কাগজে নিজের নাম লিখল, এবং তাতে বোঝা গেল লিখতেও জানে। একখানা বই থেকে কিছু পড়ে শোনাল, তাতে বোঝা গেল পড়তেও জানে। একটু হেঁটে বেড়িয়ে দেখাল খোঁড়াও নয়। চুল খোলাই ছিল, কথা বলতে দাঁতও দেখা গিয়েছিল—তাই এই দুটি দৈহিক উপসর্গ বিস্তারিত প্রদর্শনের আর দরকার হল না।

জলখাবারের আয়োজন ভালই হয়েছিল। খাওয়া শেষ করতে করতে দেনাপাওনার কথা উঠল, এবং একটি সন্তোষজনক মীমাংসাও

হয়ে গেল। তার কারণ একপক্ষে যেমন দাবীর উগ্রতা ছিল না, অপর পক্ষে তেমনি অযথা হীনতা ছিল না।

যথা সময়ে আশীর্বাদ হয়ে গেল।

আর পাঁচ দিন পরে শুভ বিবাহ।

এমন সময় প্রথমে নবদ্বীপচন্দ্রের মাথায়, এবং পরে সেই সংবাদ শুনে বিশ্বনাথের মাথায়, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হল।

বিবাহের মূল পাত্র নিখোঁজ!

নবদ্বীপপুত্র নিমাইচাঁদ স্বয়ং উধাও হয়ে তার জায়গায় একখানি চিঠিমাত্র রেখে গেছে।

"শ্রীচরণেষু, আমার বিবাহ ঠিক করিয়া একেবারে আশীর্বাদ পর্যন্ত শেষ করিয়া আসিয়াছেন, অথচ আমাকে এ বিষয়ে একটু ভাবিবারও সময় দিলেন না? ইহা অন্যায় হইয়াছে। আমি কিন্তু বলিয়াছিলাম ভাবিয়া দেখিয়া পরে জানাইব। ইহার কারণ ছিল। সেই কারণটি কি তাহা আমিই একদিন আপনাকে জানাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ পাই নাই, সাহসেরও অভাব ছিল। সেজন্য বুক বাঁধিতেছিলাম। অপেক্ষা করিতেছিলাম উপযুক্ত সুযোগ আসিলেই সব জানাইব। কিন্তু আপনি সে সুযোগ দিলেন না। তাই শেষ উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহা না করিলে নিজেকেই বঞ্চনা করা হইত। আমি ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও সুমিতা ঘোষের সঙ্গে আমার কথা হইয়া গিয়াছে। তিন আইনে আমাদের বিবাহ হইবে। অতএব সে এবং আমি কিছুকালের জন্য গা ঢাকা দিলাম। আপনি যদি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে যে দেশে বিবাহে তিন আইন দূরের কথা, এক আইনও নাই, সেই দেশে উত্তীর্ণ হইব।" ইতি—হতভাগ্য নিমাইচাঁদ।

নবদ্বীপচন্দ্র এ চিঠি পড়ে প্রথমত স্তম্ভিত হলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পেল। মাথা ঘুরে গেল! চতুর্দিক অন্ধকার দেখলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

একটি সম্পূর্ণ দিন গেল এলোমোলো অবস্থার মধ্যে।

পরদিন নবদ্বীপচন্দ্র বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশিকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলেন। তার ফলে চিঠির ইঙ্গিত ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এলো। পাড়ার বন্ধুগণ, থানার পুলিস এবং তিনি স্বয়ং বৈঠক বসালেন। চিঠির শেষ দিকে যে দেশটির কথা আছে সে দেশটি কোন্ দেশ তার অর্থ করলেন সবাই মিলে। সন্দেহ রইল না যে সেটি স্বর্গে অবস্থিত।

নবদ্বীপচন্দ্র শক্ত হতে লাগলেন। এবং যদিও গত কয়েক পুরুষ তাঁরা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়েছেন, তবু এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে হঠাৎ শাক্ত হয়ে উঠলেন।

ইচ্ছে হল ছেলের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলতে, ইচ্ছে হল তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না ক'রে দিকে দিকে লোক লাগালেন তার খোঁজে। পুলিসও লেগে রইল। সব চেয়ে অসুবিধা হল সুস্মিতা ঘোষের পরিচয় বের করতে। সে আর কিছুতেই হয়ে উঠল না। নিমাই চাঁদের বন্ধুদের শরণাপন্ন হয়েও কোনো লাভ হল না।

অথচ বিবাহের নির্দিষ্ট দিনের আগে খুঁজে বের করতে না পারলে সর্বনাশ। পাত্রীপক্ষ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া হয়েছে, অলঙ্কার গড়াতে হয়েছে নিজেদের পছন্দ মতো। সব আয়োজন পাকা! বিয়ে চুলোয় গেল, এখন ছেলেটিও বোধ হয় যায়! আর চারটি দিন মাত্র হাতে, এর মধ্যে কি পাওয়া যাবে কুলাঙ্গারকে? নবদ্বীপচন্দ্র দুশ্চিন্তায় ডুবলেন।

পরদিন, গভীররাত্রি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দূরে এক একটা আলো ঢাকুরিয়া লেকের জলে প্রতিফলিত হয়ে কাঁপছে। লেক নির্জন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পাঁচবার লেক প্রদক্ষিণ করেছেন।

তাঁর চোখে মুখে ক্লান্তি, কিন্তু পায়ে ক্লান্তি নেই। সমস্ত রাত তিনি এই লেক প্রদক্ষিণ করবেন ব'লে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

একা এত রাত্রে, এই বিস্তীর্ণ জায়গায় তাঁর গা ছমছম করছে। কিন্তু উপায় তো নেই।

হঠাৎ ক্ষীণ আলোয় তাঁর নজরে পড়ল কে একজন বসে আছে গাছের গোড়ায়, জলের ধারে। দেখে চমকে উঠে ঐ খানেই তিনি থেমে গেলেন।

দেখলেন ঐ লোকটিও তাঁকে দেখেছে। কারণ সে তখনই সেখান থেকে উঠে চলে গেল। তার হাতে একখানা লাঠি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক সতর্ক দৃষ্টি মেলে আবার পরিক্রমার কাজ শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখেন তাঁর বিপরীত দিক থেকে একটি লোক তাঁর দিকেই আসছে। মনে হল যেন যে লোকটিকে একটু আগে দেখেছেন এ সেই লোকটিই। এরও হাতে লাঠি।

ডাকাত না কি?

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে?

তিনি আবার থেমে দাঁড়ালেন।

লাঠিধারী তাঁর পাশ দিয়ে তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে চলে গেল, আক্রমণ করল না, একটি কথাও বলল না।

ডাকাত নয় তা হলে। ভদ্রলোকই হবে। কিন্তু এত রাত্রে এখানে কেন?

ভাবতে ভাবতে চললেন। ইতিমধ্যে আরও এক পাক ঘোরা হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই লাঠিধারীর সঙ্গে আবার দেখা। আর সন্দেহ রইল না যে সেও লেক-প্রদক্ষিণ করছে। এবারেও নীরবে দুজন দুজনকে অতিক্রম ক'রে গেলেন। কথা বলার তাগিদ ছিল না কারোই। কিন্তু তবু প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মনে একটা কৌতূহল না

জেগে পারল না। লাঠিধারীর আবির্ভাবে নির্জন লেকের ভয়ঙ্করত্ব কিছুটা কেটে গেছে, কারণ লোকটি অনিষ্টকারী নয়। কিন্তু তিনি কেন ঘুরছেন এখানে? উদ্দেশ্য কি তবে একই? তা যদি হয় তা হ'লে এক সঙ্গে ঘুরলে ক্ষতি কি?

কথাটা মনে হতেই তিনি বিপরীত দিকে ফিরে দ্রুত পা চালিয়ে লাঠিধারীকে ধরে ফেললেন। বললেন, মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি?

আলাপ করার এটা জায়গা নয়—এই সংক্ষিপ্ত কথাটি রুক্ষ ভাবে উচ্চারণ ক'রে লাঠিধারী সোজা এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক দমলেন না, তিনি তাকে অনুসরণ করে চললেন। বললেন, দুজনেই একা একা ঘুরছি একই জায়গায়, একই সময়ে, হয় তো দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, সুতরাং যদি পরস্পর দুটো মনের কথা বলা যায় তাহলে দুজনেরই পরিশ্রম কমে যাবে।

লাঠিধারী সে কথা কিছুমাত্র গ্রহণ না করে এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন আপনি একটু বেশি বিচলিত মনে হচ্ছে।

লাঠিধারীর স্বর এবারে আরও একটু রুক্ষ। বলল, তাতে আপনার াওয়া থাওয়ার তো বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। শখ থাকে একাই [রুন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, না মশায় শখের কথা হচ্ছে না, শখ আমার নেই, বিপদে পড়েই এমন সময় এইখানে এসেছি। আপনি বোধ হয় আমাকে গুণ্ডা ভেবেছেন তাই ভয় পাচ্ছেন। চলুন যেতে যেতেই আলাপ করা যাক। একা আর ভাল লাগছে না, আমি এখন কারো সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছি।

লাঠিধারী নিরুপায়ভাবে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আলাপ চলতে লাগল এক তরফা। এ কথা সে কথা,

বর্তমান কালের দুর্নীতির কথা, এবং অবশেষে লেকে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যের কথা। ছেলে পালিয়েছে কোন্ এক ঘোষের মেয়ের সঙ্গে, তাই পাহারা দিচ্ছি লেকে এসে—বলা তো যায় না—হয় তো ডুবে মরতে পারে।

লাঠিধারী হঠাৎ থেমে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।—অ্যাঁ! তবে সে হারামজাদা আপনারই সুপুত্তুর! আমার মেয়েকে নিয়ে তবে সেই রাস্কেলটাই পালিয়েছে!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক—অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র—এ রকম অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে বিস্মিত হতে পারতেন, দরদী বন্ধু হিসাবে ঘোষের দুঃখ আর তাঁর নিজের দুঃখ মিলিয়ে অন্তরঙ্গতা গড়তে পারতেন, কিন্তু ঘোষের অপমানসূচক ভাষায় তাঁর মনটা খিঁচড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, মশায় ভদ্রলোকের মতো কথা বলবেন। আমার ছেলেকে হারামজাদা বলেন আপনি কোন্ সাহসে?

ঘোষ সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, একবার ধরতে পারলে হত রাস্কেলটাকে। এই লাঠি—দেখছেন এই লাঠি? হাড় গুঁড়ো করে ছাড়তাম এই লাঠির ঘায়ে। কিন্তু পাব ঠিক ওদের এইখানেই। লেকে ডোবা ছাড়া ওদের আর কোথায়ও স্থান নেই।

নবদ্বীপচন্দ্র আরও অপমানিত বোধ করে কড়াসুরে বললেন, বটে! আর আপনার মেয়েটিকে আমি গলায় পাথর বেঁধে এই লেকে যদি না ছাড়ি তা হলে আমি মুখুজ্জেই নই।

ঘোষ রুক্ষস্বরে বললেন, বটে!—ব'লে আস্তিন গোটাতে লাগলেন।

নবদ্বীপচন্দ্র বললেন—আস্তিন গোটানো থোড়াই কেয়ার করি, উল্লুকা বাচ্ছা ! ছোটলোকের বংশ না হলে এমন মেয়ে হয় ?

মুখ সামলে কথা বলবেন, নইলে লাঠি চালাব। ঘোষ হাঁকলেন।

"কুস্তি জানি, লাঠিখেলাও অভ্যাস ছিল এক কালে, সে কথাটি আগেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।—বলে নবদ্বীপচন্দ্রও আস্তিন গোটালেন।

"চলি আও বাচ্ছা," বলে ঘোষ ঘাড় কাত করে প্রতিপক্ষের অপেক্ষা করতে লাগলেন। নবদ্বীপচন্দ্রও এক লাফে ঘোষের ঘাড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। ঘোষের হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল। তখন দুজনে কুস্তিগিরদের ভঙ্গীতে গড়াতে লাগলেন। দুজনের গায়েই সমান জোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাপটাজাপটি করতে করতে দুজনে একেবারে জলের ধারে এসে পড়লেন।

তারপর ঝপাৎ করে শব্দ হল একটা।

জলে বুদ্বুদ উঠতে লাগল কিছু পরেই। তারপর সব নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বসে দুজোড়া চোখ সব দেখছিল, দুজোড়া কান সব শুনছিল। কিন্তু এই অভাবিত পরিস্থিতিতে গুরুজনের সম্মুখে বেরিয়ে আসার সাহস ছিল না তাদের। গরজও ছিল না। তারা চুপ ক'রে বসে বসে সব দেখল, এবং একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে ওখান থেকে নিশ্চিন্ত মনে উঠে পড়ল।

তাদের জলে নামার আর দরকারই হল না।

(সচিত্র ভারত, ১৯৪৭)

আমি একদা দেশের নেতা হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবং সাধনাও করেছিলাম কিন্তু তাতে পনেরো আনা সিদ্ধিলাভ করেও মাত্র এক আনার জন্যে কি ভাবে ব্যর্থ হই তার কতকগুলো দলিল আমি অনেক দিন পরে সম্মুখে নিয়ে বসেছি। ভাবছি ঐ এক আনা বাধা আমাকে কি ভাবেই না পঙ্গু করে গেছে।

দলিলগুলো কয়েকখানা চিঠি মাত্র। কিন্তু এই চিঠির পিছনে যে সামান্য একটু ইতিহাস আছে তা বলা দরকার।

নেতা হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার বাল্যকাল থেকে। সে সময়ে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের বান ডেকেছিল। আমি তখন স্কুলে পড়ি। নিতান্ত ছেলে মানুষ। কিন্তু কল্পনা করারও বয়স সেটা। সেই সময় এক দেশনেতার সম্মান আমি মফঃসলে বসে দেখেছিলাম। সেই নেতা এখন বাংলার বাইরে এক আশ্রমে প্রায় আত্মগোপন করে আছেন।

এরপর থেকে আমি নিজে নেতা হবার স্বপ্ন দেখে আসছি। আমার সহপাঠীরা বলত, তারা কেউ ডাক্তার হবে, কেউ উকিল হবে, কেউ হাকিম হবে; আমি বলতাম, আমি নেতা হব।

কিন্তু কেমন করে যে নেতা হওয়া যায় তা কেউ বলতে পারত না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ছিল নেতা হবার একটা উপায় অবশ্যই আছে, সেই উপায়টি আবিষ্কার করতে পারলেই আমার পথ আমি করে নিতে পারব।

কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সে-ই কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। কেউ বলত নেতা গাছে ফলে, কেউ বলত আকাশ থেকে আসে। এদের মধ্যে যারা একটু বিবেচক তাদের কেউ বলত লেখাপড়া শিখলে নেতা হওয়া যায়, কেউ বলত ভাল বক্তৃতা দিতে পারলে নেতা হওয়া যায়।

এ সব কথা তখন বিশ্বাস করতাম। কিন্তু পরে যখন কলেজ পড়ি তখন বুঝতে পারলাম কথাগুলো আংশিক সত্য মাত্র, এবং তা ছাড়াও কিছু রহস্য আছে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একখানা ইংরেজী কাগজে এক বিজ্ঞাপন দেখে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। চিঠিপত্রের সাহায্যে শিক্ষাদানের এক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই আমি যুক্ত হয়ে গেলাম এবং এঁদের সঙ্গে আমার যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তারই কয়েকখানা পড়লেই আমার নেতৃত্ব ফল লাভের পরিণতি কি হল জানা যাবে।

আমার চিঠি

মহাশয়গণ, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, সকল স্নায়ু দৌর্বল্য জয় করিয়া নেতৃত্বপদের যোগ্য ব্যক্তিত্ব লাভের যে মন্ত্র আপনারা বিক্রয় করিয়া থাকেন আমি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করি। কত টাকা লাগিবে জানাইবেন।

প্রতিষ্ঠানের চিঠি

প্রিয় বন্ধু, আমাদের মন্ত্র পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। একযোগে দিলে ৩৮০ টাকা, অন্যথায় ৮০ টাকা করিয়া পাঁচ কিস্তি। নেতৃত্ব পদ লাভে আপনার উদ্যম জয়যুক্ত হোক—এই কামনা করি।

আমার চিঠি

প্রথম কিস্তির প্রাপ্তিস্বীকার ও আপনাদের মন্ত্রের প্রথম কিস্তি এক-

সঙ্গে পাইয়া ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী আজ হইতেই ভাবিতে শুরু করিলাম যে, আমি একজন অসাধারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তি, আমার মধ্যে অভাবনীয় শক্তি সুপ্ত আছে, আমি কাহারও অধীন হইয়া থাকিতে এ পৃথিবীতে আসি নাই—ইত্যাদি। আপনারা বলিয়াছেন, তিনমাস এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া কথাগুলি বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহার পর ৮০ টাকা পাঠাইলে দ্বিতীয় কিস্তি পাঠাইবেন। কিন্তু আজ পৃথক ডাকে এক জোড়া ডাম্বেল পাঠাইয়াছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি ভ্রমবশতঃ?

প্রতিষ্ঠানের চিঠি

ডাম্বেল ভ্রমবশতঃ পাঠানো হয় নাই। উহার জন্য পৃথক নির্দেশ গিয়াছে, খুব সম্ভব তাহা পান নাই। আমাদের অন্য নির্দেশ পালনের সঙ্গে প্রত্যহ আধঘণ্টা করিয়া ডাম্বেল ভাঁজা অত্যাবশ্যক। অবহেলা করিবেন না।

আমার চিঠি

তিনমাস কাটিয়াছে। আমি অসীম শক্তির আধার একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। ডাম্বেল নিয়মিত ভাঁজিয়াছি, পেশী কিছু শক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তির ৮০ টাকা পাঠাইলাম।

প্রতিষ্ঠানের চিঠি

এবারে কিছু কিছু বক্তৃতা অভ্যাস করিতে হইবে। আপনাকে কল্পনা করিতে হইবে আপনি বিরাট জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন এবং আপনার মুগ্ধ শ্রোতারা আনন্দে হাততালি দিতেছে। ইহা কল্পনা করা সুবিধা হইবে বিবেচনায় পৃথকভাবে একখানা হাত-তালির রেকর্ড পাঠাইলাম। একটি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কল্পিত শ্রোতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিবেন ও প্রতি দু-মিনিট অন্তর গ্রামোফোনে

এই রেকর্ড একটুখানি চালাইবেন। সম্মুখে এক গ্লাস জল রাখিবেন, লা শুকাইলে একটু একটু খাইবেন। জলে সামান্য পরিমাণ বাই-কার্বনেট অব সোডা মিশাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু প্রথম বক্তৃতায় শুধু বিশেষণ প্রয়োগ শিখিতে হইবে।

একটি ভাল লোককে কল্পনা করিয়া তাহার সম্পর্কে বিশেষণের সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া যাইবেন। যেমন, তিনি হচ্ছেন শক্তিশালী, বীর্যবান, বীর, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, সৎ, সাধু, সজ্জন, সচ্চরিত্র, সদাশয়, সাহসী, দুর্বার, দুর্জয়, নির্ভীক……। কিংবা কোনো অসৎ লোককে কল্পনা করিয়া ঐভাবে যথাযোগ্য বিশেষণ আওড়াইতে থাকিবেন। যথা, হারামজাদা, পাজী, ছুঁচো, নরাধম, কুলাঙ্গার, শূয়র কি বাচ্চা…। তারপর ক্রিয়া বিশেষণ—যেমন, এ কাজটি ভয়ানক শক্ত, অতিশয় কঠিন, অতি দুঃসাধ্য, খুবই অসাধ্য, অত্যন্ত বিতিকিচ্ছিরি…। এক এক জাতীয় বিশেষণ দশ মিনিট স্থায়ী হওয়া দরকার। ডাম্বেল নিয়মিত চালাইয়া যাইবেন।
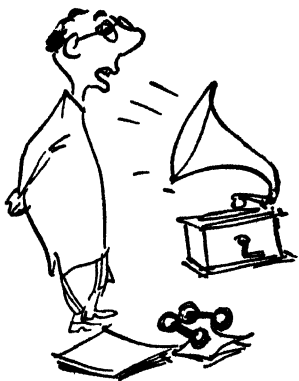
প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী চিঠি

বিশেষণ আবৃত্তি করিতে করিতে পনেরো মিনিট কাটাইতে পারেন জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এইবার আপনাকে Rhetoric-এর ইতিহাস জানিতে হইবে। সেজন্য প্রাচীনতম বাগ্মী Antiphon-এর ইতিহাস, Isocrates-এর জীবনী ও Bascom-এর Philosophy of Rhetoric পাঠাইলাম। এখন হইতে কিছু কিছু দৌড়ানো অভ্যাস রতে থাকুন। একখানা রেকর্ড পাঠাইলাম, ইহাতে আপনাকে

যাচ্ছেতাইভাবে গাল দেওয়া আছে। উহা পুনঃ পুনঃ বাজাইয়া ক্রোধ জয় করিতে অভ্যাস করুন। রেকর্ডখানা ভাঙিয়া ফেলিবেন না।

প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী চিঠি

আমাদের নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। এইবার ঘরোয়া সভায় কিছু কিছু বলিতে অভ্যাস করুন। আমরা শুনিয়াছি যেকোনো উপলক্ষে আপনাদের দেশে অসংখ্য সভা বসে এবং এত সভা পৃথিবীর আর কোথাও বসে না। সুতরাং আপনার বক্তৃতা অভ্যাস কঠিন হইবে না। তবে মনে রাখিবেন বাহিরের সভায় এখন যাওয়া বিপজ্জনক। তাহা হইলে উল্টা ফল হইবে। এখন শুধু ঘরোয়া বৈঠকে পরিচিতের মধ্যে কিছু কিছু বলা অভ্যাস করুন।

আমার চিঠি

আপনারা সম্ভবতঃ ঠিকই বলিয়াছেন। এদেশে সভার অন্ত নাই। আপানাদের চিঠি পাইবার পরই আমার সুযোগ জুটিয়া গেল! আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে এক ঘরোয়া বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইলাম। আমি সেখানে কি বলিব তাহা দুই তিন দিন ধরিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠিয়া হঠাৎ হৃৎপিণ্ড সশব্দে আছাড় খাইতে লাগিল, সমস্ত গা ঘামিয়া উঠিল। যাহা কিছু বলিব ভাবিয়াছিলাম তাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল এবং যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মনে করিলে এখনও হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। বলিয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি। তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন, সব বই আমি দেখি নাই। নিজের জীবনীও লিখিয়াছেন, আপনারা হয়তো কেহ কেহ তাহা পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকিলে পড়িয়া লইবেন। …ইহার পর নার্ভাস হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু উপস্থিত সবাই আমার বক্তৃতার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছে। বলিয়াছে রবীন্দ্রনাথের রচনার

সঙ্গে পরিচিত না হইয়া যাহারা রবীন্দ্রনাথকে শূন্যগর্ভ প্রশংসা করে তাহাদের প্রতি আমার কষাঘাত নাকি সার্থক হইয়াছে।

পুঃ—ডাম্বেল ভাঁজিয়া যাইতেছি, দৌড়ানো অনেকটা অভ্যাস হইয়াছে, এবং গালাগাল সহজে হজম করিতেছি।

প্রতিষ্ঠানের চিঠি

আপনার stage fright বা 'মঞ্চভীতি' দূর হইতে কিছু সময় লাগিবে, সুতরাং আরও কিছুকাল ঘরোয়া বৈঠকে বলা অভ্যাস করুন। আপনার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। কারণ প্রথমেই আপনি বিদ্রূপাত্মক বক্তা হিসাবে নাম করিয়া ফেলিয়াছেন (এইবার বারনার্ড শ' সম্পর্কে কিছু পড়িয়া রাখুন)। আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনি এখন হইতে গাল দিবার ভাষা সংগ্রহ করিতে থাকুন। বাংলা ভাষায় গাল দিবার কতগুলি শব্দ আছে জানি না (আমরা কথাটি এখানকার ভারতীয় দূতাবাস হইতে জানিতে চেষ্টা করিব), কিন্তু উপযুক্ত শব্দের অভাব ঘটিলে বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে থাকুন। আমাদের পূর্ব প্রেরিত রেকর্ড হইতে আপনি অবশ্যই ড্যাম, সোয়াইন, ব্লাডি ফুল শিখিয়াছেন। নেতা হইবার পথে ইহা আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এবং এ পথে চলিলে একমাসের পথ এক সপ্তাহে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

আমার আর একখানি চিঠি

আনন্দের সহিত জানাইতেছি, আমি গত তিন মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা দিয়া আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছি। এবং গাল দিবার ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছি যে, আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখন লোকের ভিড় হইতেছে। আমি এ পর্য্যন্ত কটুভাষণে যতদূর সম্ভব মার্জিত ভাষা ব্যবহার করিতেছিলাম, কিন্তু শ্রোতাদের ঐকান্তিক দাবীতে উহার সহিত ইংরেজী ও হিন্দি হইতে সংগৃহীত প্রচুর

অশ্লীল ভাষা যোগ করিয়াছি এবং ইহাতে আমার এত খ্যাতি বাড়িয়াছে যে, এখন বাহিরে সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য বহুস্থান হইতে আমাকে টানাটানি করিতেছে। কিন্তু আপনাদের শেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে তিন মাইল পর্যন্ত না থামিয়া দৌড়ানো অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি। শেষ কিস্তির টাকা পাঠাইলাম।

প্রতিষ্ঠানের শেষ চিঠি

আপনার নেতা হইবার বিদ্যা পনেরো আনা অ'য়ত্ত হইয়াছে, আপনার শেষ চিঠি পড়িয়া আমাদের বিশেষজ্ঞেরা এই মন্তব্য করিয়াছেন। এখন আপনাকে আমাদের শেষ নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই শেষ নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত হইবার আগে আপনি কদাচ কোনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবেন না। আপনাকে সবদা মনে রাখিতে হইবে যে, আপনি দেশের একজন নেতা হইতে চাহেন এবং আমরা একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আপনাকে প্রস্তুত করিতেছি। শেষ নির্দেশ একটি প্যাকেটে জাহাজযোগে প্রেরিত হইল।

পরিণাম

যথাসময়ে পার্সেল খুলিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর ভিতর হাতে, পায়ে, পিঠে ও বুকে বাঁধবার নানারকম চামড়া ও ধাতুর জিনিষ। এ সমস্ত কেন এবং কার জন্যে তা হঠাৎ বুঝতে পারিনি। কিন্তু ব্যবহার-বিধি নামক পুস্তিকাখানা খুলে দেখি তাতে লেখা আছে দেশ-নেতার আত্মরক্ষা। নেতা হতে হলে জনসাধারণের হাতে মার খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আসতে হবে, এবং মার খাওয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনিবার্য। সেজন্যে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্যে এই আত্মরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। এর কোন্‌টা কোথায় কিভাবে বাঁধতে হবে ছবির সাহায্যে তা বুঝিয়ে দেওয়া আছে। পিঠে যেটি

বাঁধতে হবে সেঠি একটি চামড়ার মোটা প্যাড। বুকে ও পেটেও
। পায়ের টিবিয়া ফ্র্যাকচার রোধের জন্মে ইস্পাতের জালের
মোজা। মাথার জন্মে ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ।

মনটা একেবারে চুপসে গেল। প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মতো এতদিন ডাম্বেল এবং দৌড় অভ্যাস কেন করেছি তা এইবার বোঝা গেল। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্মে ছুটে পালানো দরকার হতে পারে, এবং সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষকে দু এক ঘা দিতেও হতে পারে।

জীবনে কখনও মারামারি করি নি। সে সাহসও নেই। জন-সাধারণের নেতৃত্ব কামনা আমার শেষ হয়ে গেল! চারশ' টাকা ও এতটা সময় খরচ অবশ্য আমার বৃথা হয় নি, কারণ শেষ পর্যন্ত বক্তৃতার অভ্যাসটা কলেজের প্রোফেসরের চাকরি নিয়ে কাজে লাগালাম, এবং চামড়ার যে দুটি প্যাড ছিল তা ছিঁড়ে তিন জোড়া উৎকৃষ্ট জুতো তৈরি করা গেল—বেশ ভাল চামড়া।

(স্বরাজ, ১৯৪৮)

দশহাত

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী থাকেন শ্যামবাজার অঞ্চলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। সদাশয় লোক, তাঁর চতুর্দিকের অন্ততঃ পঁচিশখানা বাড়ির সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য।

একদিন পাড়ায় একটি পরম উত্তেজক খবর ছড়িয়ে পড়ল— চন্দ্রশেখর নাকি এক দুর্লভ বস্তু পরদিন সন্ধ্যায় লাভ করতে যাচ্ছেন।

পরদিন সকাল থেকে পাড়ার সবাই চঞ্চল হয়ে রইল। চন্দ্রশেখর অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন সাড়ে চারটের মধ্যে। শোনা গেছে আজ একটু দেরি হতে পারে।

কিন্তু কত দেরি হবে?

পাঁচ মিনিট, না আধঘণ্টা, না একঘণ্টা, না আরও বেশি?

কিন্তু কাজ কি অত গবেষণা ক'রে? একটু সময় হাতে রেখে যাওয়াই ভাল। দেখা গেল চারটের মধ্যেই সবাই তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন।

চন্দ্রশেখর প্রবীণ ব্যক্তি। ত্রিশ বছর তিনি এক সাহেবের অফিসে কাজ করছেন। পাড়ার সকল কাজে তিনিই অগ্রণী। তাঁর অবস্থা ভাল, খাতিরও তাঁর খুব বেশি। এতদিন সাহেবের সংশ্রবে থেকেও সাহেবি পোষাক পরেন না, সাদাসিদে ভাবেই থাকেন, তবু গোপনে

কেউ কেউ বলে লোকটা ধড়িবাজ। অর্থাৎ সব কিছু ভালর পিছনেও একটা কোনো মন্দ জিনিস আছেই। কিন্তু তাদের কথা থাক।

নটবর, তারক, সুধীন, রামেশ্বর, নগেন, তুলসী, নরহরি, রামেন্দু, সর্বেশ্বর, নবীনমাধব, সনৎকুমার, সর্বরঞ্জন, চিত্ততোষ, ব্রজেশ্বর, নিখিল এঁরা সব পৌঁছে গেছেন। তারপরে এসেছেন নিস্তারিণী, সৌদামিনী, সাবিত্রী, লীলা, ফুলরাণী, বিমলা, শান্তি, নীলিমা, নির্মলা, কল্যাণী, মায়া, ইলা, তাপসী, সুধা, নীহার, ললিতা, রাধারাণী, রমা ইত্যাদি।

সে যেন এক মহা সমারোহ। যারা কিছু জানে না তারাও ভিড় খে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। দু'চারজন ভিখারীও আশে পাশে তে লাগল লোভে লোভে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বগলে একটি কাগজের প্যাকেট নিয়ে চন্দ্রশেখর এসে পৌঁছলেন বাড়িতে।

তরুণের দল বসেছিল বৈঠকখানা ঘরের বাইরের রকে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ বাহুর অধিকারী সুধীন, সে বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটি টেনে নিতে নিতে বলল আমরা আগে দেখে নেই।

সদাশয় চন্দ্রশেখরের উপর এই অধিকার তাদের সকলেরই আছে, তিনি কোনো কিছুতেই বিরক্তি বোধ করেন না। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তা নাও না, তোমরা দেখে পছন্দ করলেই আমার তৃপ্তি।

সুধীন বলল, ভিতরে গুরুজনেরা সব আছেন, আমরা একটুখানি দেখেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চন্দ্রশেখর বৈঠকখানায় ঢুকলেন। সেখানে প্রবীণের দল তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন। চন্দ্রশেখর সে জন্যে কি পরিমাণ খুশি হয়েছেন তা জানালেন, অর্থাৎ পরিমাণটা জানাতে

পারলেন না। অন্দরে যাবার সময় বলে গেলেন, পোষাক ছেড়েই তিনি ফিরে আসছেন।

ইতিমধ্যে সুধীন প্যাকেটটি খুলে ফেলেছে। ভিতরে একখানা চালানও ছিল।

প্যাকেটের ভিতর থেকে প্রকাশিত হ'ল পাঁচ গজ লংক্লথ। মূল্য : তিন টাকা আট আনা।

কণ্ট্রোলের দরে র‍্যাশন থেকে কেনা।

একটা হৈ হৈ উত্তেজনা এবং কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। নবীনমাধব ডান হাতের চারটি আঙুল ভাঁজের ভিতর ঢুকিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বলল, খুব ফাইন নয়, তবে নরম আছে।

সনৎকুমার নিজের গায়ের হাফ শার্টের কাপড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বলল, প্রি-ওয়র চার আনা গজ।

রামেন্দু কাপড়ের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে ঠোঁট উলটে বলল, পাঁচ গজ যে কেন বরাদ্দ করেছে বুঝলাম না, দুটো পাঞ্জাবীও হবে না।

সনৎকুমার বলল, হাফ শার্ট দুটো হ'তে পারে।

নবীনমাধব বলল, আমার গায়ে একটার বেশি নয়। চার গজ লাগে আমার পাঞ্জাবীতেই।

এতক্ষণে সুধীন কাপড় পরীক্ষা করার সুযোগ পেল। সে বলল, কে বলেছে এ কাপড় নরম? এর জামা পরলে গায়ের ছাল উঠে যাবে না?

নবীনমাধব প্রতিবাদ ক'রে বলল, লোকে চটের স্যুট পরছে আজকাল, কি ক্ষতি হয়েছে তাদের ?

নিখিল এদের মধ্যে কিছু ক্ষীণজীবী ছিল, তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কাপড়খানা একবার নিজ হাতে পরীক্ষা করে, কিন্তু কারও হাত থেকে টেনে নেবার সাহস তার নেই, তাই সে লোভীর মতো শুধু চেয়ে রইল কাপড়খানার দিকে।

এদিকে প্রবীণেরা চঞ্চল হয়ে উঠছেন ক্রমশই। চন্দ্রশেখর আর দেরি করা উচিত নয় বিবেচনা ক'রে বাইরে এসে বললেন, তোমাদের শেষ হ'ল ?—এ দিকে এঁদের যে ঠেকানো যচ্ছে না !

নবীনমাধব বলল, আর একটুখানি পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখনও মেপে দেখা হয়নি।

চন্দ্রশেখর ফিরে যেতেই প্রবীণতম নটবর বক্সী অত্যন্ত অভিমানভরে বললেন, দেখেছ হে আজকালকার অশিষ্টতা ? ছেলেদের এখন কোনো বিষয়েই ধৈর্য নেই, বড়কে এখন আর বড় মানে টানে না।

তুলসী মুখুজ্জে উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমাদের কালের কথা মনে পড়লেই বুঝতে পারি আমরা তখন কি ঠকা ঠকেছি। গুরুজনের সামনে অশিষ্টতা ? বাব্বা, তা'হলে কি আর পিঠের হাড় আস্ত থাকত ? ভয়ে ভয়েই কাটিয়ে দিলাম সারাটা যৌবন !

ব্রজেশ্বর বলল, কাজ নেই বাবা জয়লাভে। গুরুজনকে ডোণ্ট-কেয়ার ক'রে চলাকেই কি তুমি জেতা বল ?

সর্বরঞ্জন চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, যেটুকু শিষ্টতা ছেলেদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, এই যুদ্ধে সেটুকুও সাবাড় করে দিলে।

রামেশ্বর বললেন, একটু আস্তে বল দাদা, কথাগুলো ওদের কানে গেলে আবার নতুন একটা গোলমাল বেধে উঠবে।

চন্দ্রশেখর পুনরায় বাইরে গিয়ে কাপড়খানা কোনো রকমে ওদের

হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন, কিন্তু তার ফলে বাইরে অনাহূত যারা এসে দাঁড়িয়ে ছিল তারা আশাভঙ্গের দরুন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। নবীনমাধব বলল, ঘণ্টা দুইয়ের মতো নিশ্চিন্ত, ও কাপড় আর এখন ফিরে আসছে না, অতএব তোমরা যেত পার।

প্রবীণেরা কাপড়ের দিকে গলা বাড়াতেই নিখিল এক লাফে এসে বলল, আমার কিন্তু এখনও দেখা বাকী আছে।

সর্বরঞ্জন হঠাৎ গর্জন করে বলে উঠলেন, ওঃ! কি আমার দেবতা রে! ওঁদের ভোগ শেষ না হ'লে আর কেউ তা ছুঁতে পাবে না! বলি, বয়সের মর্যাদাও কি তোমরা আর রাখবে না নাকি? আমরা তো তোমাদের বয়সে এ রকম ছিলাম না, গুরুজনদের দেখলে দশ হাত তফাৎ দিয়ে হাঁটতাম। আর আজও এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছি তাও তো সেই শিক্ষারই ফলে। নইলে তোমাদের এত স্পর্ধা হ'ত না আমাদের ফেলে আগেই কাপড়খানা উচ্ছিষ্ট করবার!

নিখিল এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কেঁচোর মতো হয়ে গেল। সে মাথা নিচু ক'রে দরজার পাশে মাটিতেই ব'সে পড়ল।

রামেশ্বর বললেন, নিখিল ছেলেটা তবু ওদের মধ্যে ভাল, একটু শান্তশিষ্ট আছে।

নিখিল প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, ওরা আমাকে কাপড় ছুঁতেই দেয়নি এতক্ষণ।

কাপড় এতক্ষণ নটবরের হাতে ছিল। মনোযোগ সবার সে দিকেই আকৃষ্ট হ'ল।

তুলসীচরণ বললেন, চন্দ্রশেখর ভায়ার সত্যিই আজ একটা গৌরবের দিন।

নরহরি বললেন, সে কালের কথা মনে পড়ে। পাড়ায় কেউ একখানা কাশ্মীরী শাল কিনলে তার বাড়িতে এই রকম ভিড়ই হ'ত।

তারক বললেন, আহা, কি দিনই গেছে। শুধু কাশ্মীরী শাল কেন, ঢাকাই মস্‌লিন এলো একবার আমাদের বাড়িতে, সেবারে কি কাণ্ডই না হ'ল!

সবাই তাঁর দিকে চাইলেন।

তারক বললেন, শহর ভেঙে পড়ল এসে আমাদের বাড়িতে।

রামেশ্বর প্রশ্ন করলেন, কতটা কাপড় হ্য়া?

চন্দ্রশেখর ইতিমধ্যে অন্দরে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে আসতে আসতে বললেন পাঁচ গজ, মানে দশ হাত।

দেখি, বলে সর্বরঞ্জন নটবরের হাত থেকে কাপড় খানা টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, দুটো জামা কোনো রকমে হয়ে যাবে।

রামেশ্বরও পরীক্ষা করলেন, এবং বললেন, তোমার কপাল ভাল, ভাল কাপড়ই পেয়েছ, জমিন খাসা।

তারক একটা দিক হাত দিয়ে ভাল করে দেখে এবং দরজার আলোর দিকে ধরে বললেন, জল বেঁধে আনা যাবে না, তবে নিন্দারও কিছু নেই।

তবে মাড়টা একটু বেশি মনে হচ্ছে, নরহরি বললেন।

তারক বললেন, তুমি খারাপটাই আগে দেখ। আজকের দিনে ও সব কথা থাক। আজ চন্দ্রভায়ার সৌভাগ্যে আমাদেরও সৌভাগ্য, কি বল তোমরা?

নটবর বললেন, হবেই তো, চন্দ্রভায়া চিরকাল ভাগ্যবান, আমরা ওঁর ভাগ্যের অংশ নিয়েই তো টিকে আছি আজ অবধি।

সর্বরঞ্জন বললেন, আমার কথাটিই তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ভায়া। ভাবছিলাম, তিন গজেই তো ওঁর জামা একটি হয়ে যাবে, বাকী দু'গজ পড়েই থাকবে। ঐ টুকরোটুকু যদি ভায়া বাঁচাতে পার তো আমার একটা উপকার হয়।

চন্দ্রশেখর হেসে বললেন, সে আর এমন বেশি কথাটা কি হ'ল? জামা যদি ছুটো না হয়, তা'হলে ছ'গজ তো বাঁচবেই। তবে মেয়েদের হাতে গিয়ে কি হয় বলা যায় না।

নটবর, তারক প্রভৃতি সমস্বরে বলে উঠলেন, অতি খাঁটি কথা। মেয়েদের হাতে ও কাপড়ের রূপই বদলে যাবে। এক ইঞ্চিও বাজে নষ্ট হবে না।

মেয়েদের প্রশংসার কথাগুলো শেষ হতে না হতে অভ্যাগতদের জন্যে প্রচুর খাবার ও চা এসে হাজির হ'ল।

এ সব করেছেন কি, অ্যাঁ! এ যে একের পুণ্যে সবার পুণ্য! বলে সবাই সে দিকে মন দিলেন। যারা বাইরে বসে ছিল সেই তরুণের দলও বাদ গেল না। কাপড় ইতিমধ্যে অন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—মেয়েদের তাগিদে।

কাপড় পেয়ে মেয়েদের মহলে একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। এখানে লঘুগুরু ভেদ নেই, ছোটবড় এরা সবাই এক—বয়সের মর্যাদাও এখানে কাউকে রাখতে হয় না, কেউ দাবিও করে না। এরা এমনই সাম্প্রদায়িক যে সে প্রশ্ন এদের মনে ওঠে না।

নিস্তারিণী, কল্যাণী, উমা লীলা, ফুলরাণী—এদের সবার মধ্যে একবার এ টেনে নেয়, একবার সে টেনে নেয়। এদের বিস্ময়প্রকাশক ভাষাও সবার এক—সবারই মুখে, ওমা কি সুন্দর—ওমা কি সুন্দর, কি মজা! সবাই মিলে কাপড়ের ভাঁজ সম্পূর্ণ খুলে গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে

দেখতে লাগল। এরা সবাই এক সঙ্গে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করল তাকে কলরব বা কলগুঞ্জন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রথম উচ্ছ্বাস থেমে গেলে তবে কথাগুলো স্পষ্ট রূপ নিল।

ভুবনেশ্বরী বললেন, এই হ'ল তোমার গিয়ে পাঁচ গজ লংক্লথ, এতে কি হবে বল তো? কোনো রকমে চারটে ব্লাউজ হবে, বাস্।

নিস্তারিণী বললেন, তাই কি কম?

নীলিমা বলল, চারটে কেন, পাঁচটা হবে। ঘটিহাতা হলে অবশ্য চারটের বেশি হবে না।

চন্দ্রশেখরের গৃহিণী বললেন, ব্লাউজ আমাদের যা আছে তা'তে আমাদের এখন আর দরকার নেই, ওঁদেরই পাঞ্জাবী দরকার এখন।

ও বাবা! আবার পাঞ্জাবী হবে! তা' হলে আর কি বাঁচবে?

কন্যা রাধারাণী বলল, মা, এ কাপড় আমি কাউকে দেব না, বাবা বলেছে এ কাপড় আমারই জন্যে।

রাধার আর সইল না, সে তখুনি কাঁচি বের করে ফেলল। তার মা তাকে ধমকানি দিয়ে বললেন, এতটুকু সবুর সয় না? অত উতলা হচ্ছিস কেন বল্ তো? সবার দেখা শেষ হোক, তারপর যা হয় করিস।

বিনোদিনী বললেন, সে ঠিক কথাই মা। তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা ঠিক নয়। খুব হিসেব করে কাটতে হবে, পাঁচ গজ লংক্লথ এ পাড়ায় একমাত্র তোমরাই পেয়েছ, পাড়ার মান-সম্মান এখন তোমাদেরই হাতে। যা তা করে নষ্ট করলে দুঃখু হবে আমাদেরই।

এমনি সময় একটি ছেলে এসে বলল, কাপড়খানা বাইরে একটু দরকার কয়েকজনের এখনও দেখা হয়নি।

ইতিমধ্যে অন্দরেও প্রচুর খাবার আয়োজন হয়েছে, সে জন্যে কাপড় দেওয়ায় কারও বিশেষ আপত্তি হ'ল না।

পাঁচ গজ লংক্লথ কি রকম পাওয়া গেল দেখা উপলক্ষে পুরো এক

ঘণ্টা ধরে চন্দ্রশেখরের বাড়ির সদর ও অন্দরে উৎসব চলল। অপরিচিত-দেরও লুচি সন্দেশ চায়ে তৃপ্ত করা হ'ল। একটি অভূতপূর্ব উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল এতটা সময়।

নিখিল কিন্তু এখনও আশা করে বসে আছে কাপড় না দেখে সে উঠবে না।

চন্দ্রশেখর তার দিকে হঠাৎ লক্ষ্য ক'রে বললেন, তুমি এখনও কাপড় দেখনি? আচ্ছা আমিই নিয়ে আসছি, ব'লে অন্দরে চলে গেলেন, এবং দু'মিনিট পরেই উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে বললেন, কাপড়খানা তো অন্দরে নেই, এখানেই কে চেয়ে এনেছে মেয়েদের কাছ থেকে?

কেউ বলতে পারল না, কে এনেছে।

(শরতের ফুল, ১৯৪৫)

—এক—

দিব্যেন্দুসুন্দর কবি।

পাঁচতলা প্রাসাদের উপর নির্জন একটি ঘর তার কাব্য সাধনার স্থান। বাইরেটা ফুলের টবে সাজানো, চার দিক খোলা। আলো-হাওয়ার প্রাচুর্যে স্থানটি অতি লোভনীয়। কাব্য সাধনার পক্ষে অনুপম। নিচের কোলাহল সেখানে পৌঁছায় না। নিচের ধুলো অত উঁচুতে ওঠে না। নিচের দিকে দৃষ্টিও চলে না।

দিব্যেন্দুসুন্দরের সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বর্ষার জলভরা ঘন কালো মেঘ, শরতের শুভ্র লঘু মেঘ, শীতের মেঘশূন্য নীল আকাশ, বৈশাখে ঝড়ের উদ্দাম মেঘ, তার নিকটতম বন্ধু। রাত্রের অন্ধকারে আকাশের বুকে যখন সহস্র নক্ষত্র-দীপ জ্বলতে থাকে তখন দিব্যেন্দুসুন্দরের কাব্য রচনা চলে মনে মনে। ঘর থেকে সে বাইরে

এসে বসে। বিশ্বের রহস্যময় রূপটিকে সে তার চিত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে
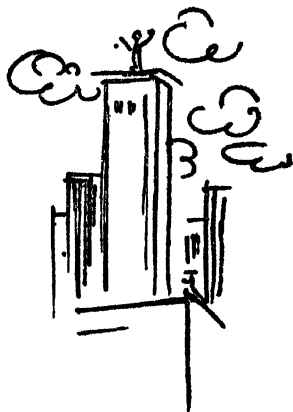
পেতে চায়, কিন্তু সেই নিঃসীম শূন্যতা তার চিত্তকে ব্যাকুল করে মাত্র, ধরা দেয় না। সে নিজের মধ্যে এক প্রবল অস্থিরতা অনুভব করে; অসীমের ধ্যান থেকে তার মন ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। অন্ধকারে ধ্যান, আলোয় কাব্য সৃষ্টি।

—দুই—

শহরের পাষাণ পথ পার হয়ে আরও দূরে, বহু দূরে, পল্লী প্রান্তরের আর একটি দৃশ্য। সেখানে আর এক কবি মাটির শ্যামল বুকে আর এক কাব্য রচনা করছে।

কবি হলধর দাস।

নির্জন মাঠ। মাথার উপরে খোলা আকাশ। কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ ঝড়ের মেঘ, বর্ষার ঘন বর্ষণ, হেমন্তের হিম, তারও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হলধর দাস জমি চাষ করছে। হালের ঘায়ে ঘায়ে বিরাট প্রান্তরের বুকে রচিত হয়ে চলেছে মাটির ছন্দ।

দেহে শক্তি নেই, শুধু আছে সৃষ্টির আনন্দ। দিব্যেন্দুর কাব্য যেখানে স্তব্ধ, হলধরের কাব্য সেখানে প্রাণচঞ্চল। সে কেবলই এগিয়ে চলে। চাষের পরে বীজ বপন, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে ফসল।

মাঠে তার অপূর্ব আনন্দ, গৃহে সে অন্নহীন, নিরানন্দ।

দুর্ভিক্ষ!

মাঠে ধানের বন্যা, ঘরে অন্ন নেই।

নদীর ধারে মহাজনের নৌকো এসে লেগেছে, সারি সারি নৌকো।

ক'দিন পর থেকেই ধান বস্তাবন্দী করার পালা। তার পর তা নিঃশেষ ক'রে তুলে দিতে হবে নৌকো বোঝাই ক'রে।

নৌকোর মাস্তুলগুলো যেন নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুরতম ইঙ্গিত।

হলধর জ্বরে অবশ। সমস্ত হাত-পা কাঁপছে। তবু উপায় নেই। চতে হবে।

নৌকোয় ধান তুলে দিতে পারলে নগদ পয়সা পাওয়া যাবে, যা না হ'লে দিন চলে না।

দিতেই হবে সব ধান?

এ যে তার নিজের হাতের সৃষ্টি। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তার যে সব আছে এর পিছনে। তার দুঃখের অশ্রু ঝরেছে এর উপর। তার মমতার রং মিশিয়ে আছে এর গায়ে। চাষ করতে করতে, ফসল াটতে কাটতে, কত গান সে গেয়েছে আপন মনে। তার সুর ড়িয়ে আছে এর প্রতিটি দানায়।

এরই আশায় সে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে জমি চাষ করেছে, চষা ভুঁইয়ে বীজ ছড়িয়েছে। তার পর হাওয়ায় হাওয়ায় যখন ফলন্ত ধানের শীষ নুয়ে নুয়ে সমস্ত ক্ষেতের উপর তরঙ্গায়িত হয়ে গেছে, তখন সেই সবুজ সমুদ্র মাঠখানি কি আনন্দের দোলা দিয়ে গেছে তার মনে, তার সমস্ত সত্তায়, তা আর কেউ জানে না।

আজ সেই সোনার স্বপ্ন তার চোখের জলে বিদায় করতে হ'ল মহাজনী নৌকোয়। নৌকোর বহর পাল ফুলিয়ে ডাকাত দলের মতো নদীর পথে উধাও হয়ে গেল।

তার পর যথা সময়ে সে ধান থেকে চাল হ'ল।

চাল উঠল শহরের পাঁচ তলায়। সেখানে সে সুগন্ধ বিস্তার করল সুগন্ধ ফুলের মতো। আর তার মোটা মুনাফার মুল নামল শহরের আর এক কেন্দ্রে মাটির নিচের সুরক্ষিত এক কক্ষে।

—তিন—

কবি দিব্যেন্দুসুন্দর বিলাসী। সে যখন নৈশ ভোজন শেষ ক'রে উঠল তখন রাত এগারোটা।

তার কুকুরটিও মনের আনন্দে ভাত মাংস খেয়ে পরম তৃপ্ত হ'ল। দিব্যেন্দুসুন্দর কুকুরকে নিজ হাতে খাওয়ায়।

রাত এগারোটায় দিব্যেন্দুসুন্দর পাঁচ তলার কুটীরকুঞ্জে বসে স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলোয় কাব্য রচনায় মন দিল।

লিখল ভাঙা-মেঘে-ঢাকা চাঁদের কবিতা। পৃথিবীর ধূলিমলিন জীবনের ঊর্ধ্বে, বহু দূর আকাশের জ্যোৎস্না-প্লাবনের কবিতা। অসীম আকাশের রহস্যের কবিতা। আকাশ-সমুদ্রের বুকে লক্ষ কোটি আলোর দ্বীপপুঞ্জের কবিতা, অন্ধকারের বুকে কালো রেখা টেনে উড়ে-যাওয়া বাদুড়ের কবিতা।

-চার—

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ শিল্পী। তার সৃষ্টির জগৎ পৃথক। বাস তার আকাশে নয়, মাটিতে নয়, মাটির নিচে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালপুরীতে, সেইখানে তার শিল্প সাধনা। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তার দখলে। প্রদীপ ঘর্ষণ মাত্র দৈত্যরা এসে হাজির হয়। হলধরের চালের মুনাফা মাটির নিচে যে মূল বিস্তার করেছে, তারই মূলাধারে বসে আছে এই বৈকুণ্ঠপ্রসাদ।

তার শিল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত স্থূল। ধানের বস্তা আর কাপড়ের গাঁট।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চুপে চুপে নেমে আসে বস্তার পর বস্তা, গাঁটের পর গাঁট। দুদিন পরে আবার উঠে যায় তেমনি চুপে চুপে। এখানে সবই অত্যন্ত জরুরি—এখানে আলস্য নেই, জড়তা নেই, বিশ্রাম নেই। এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই তৎপর। এখানে সবই ইসারা আর ইঙ্গিত। চেঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ, সবাই ফিসফিস কথা বলে। এখানে চাপা হাসি, চাপা কান্না। এখানে বহুজনের সর্বনাশের

ভিত্তিতে বৈকুণ্ঠপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা। সে এখানে দেবতা, সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার শিল্পের উপকরণ একখানি খাতা ও একটি কলম মাত্র। কলমের একটি আঁচড়ে কীটের মতো এক একটি অক্ষ অতিকায় জীবের মতো চেহারা পায়।

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ জাদুকর। তার জাদুদণ্ড-স্পর্শে সিসে সোনায় রূপান্তরিত হয়। এত বড় শিল্পী, এত বড় গুণী, অথচ নিরহঙ্কার। যেন একই ব্যক্তির চেহারায় দুটি বিভিন্ন ব্যক্তি। তার একজন নির্মম, নিষ্ঠুর, অতি প্রবল, অতি দুর্দাম, অতি ক্ষমতাপ্রিয়। তার একটি কথা বৃথা যাবে না, একটি কথা অবহেলিত থাকবে না, একটি আদেশে অধীনস্থ লোকেরা কাঁপবে। স্বর অতি কর্কশ। চোখে আগুন, চেহারায় বীভৎসতা।

এইটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠপ্রসাদের শিল্পী মূর্তি। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সে ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, সে পাতাল-বাসী দৈত্য।

আর এক মূর্তি হচ্ছে মুক্ত আলোবাসীর। অত্যন্ত দীনহীন, পরনে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বগলে পুরনো ভাঙা ছাতা। ব্রাহ্মণের পায়ে সর্বদা নতমস্তক, গৃহদেবতার ভক্ত পূজারী। মুখে মৃদুহাসি, বিনীত মধুর ভাষা, চোখে নববধূর লাজুক দৃষ্টি।

—পাঁচ—

রত্নেশ্বরও কবি। তার জগৎ আরও সীমাবদ্ধ। সেও স্রষ্টা, কিন্তু তার বিষয়বস্তু মানুষ—যে মানুষ মাটির কাছাকাছি বাস করে, যাদের সে দেখে পায়ে চলার পথে, যাদের সে দেখে নিচের ধাপে। মানবতার দুঃখে, মানবতার অপমানে সে ক্ষুব্ধ হয়। যারা পথের ধুলোয় পড়ে

থাকে শীর্ণ কুকুরের পাশে, যাদের মানুষ ব'লে কেউ চিনতে পারে না, যারা নিজেরাই যে মানুষ ছিল ভুলে গেছে, তাদের মানুষের মূর্তিতে সে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের মুখে সে মানুষের ভাষা দেয়, তাদের প্রাণে সে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে।

পথের মানুষেরা কেউ কবিকে ভালবাসে, কেউ তাকে সন্দেহ করে, কেউ তাকে অবিশ্বাস করে। তারা যে মানুষ সে কথা শুনলে তারাই বিশ্বাস করে না, বলে কবির খেয়াল, যা প্রাণ চায় বলে।

রত্নেশ্বর সত্যই খেয়ালী, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়। দুঃখী মানুষের হীনতম অস্তিত্বের কথা কি ছন্দে ফুটিয়ে তোলার জিনিস? এমন অসাধারণ ছন্দ রচনার শক্তি যার, সেই কি না তার শক্তির এমন বৃথা অপচয় করে!

রত্নেশ্বর সে কথা কানে তোলে না।

সে নিপীড়িত মানুষের মনে জীবনের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে।

রত্নেশ্বর নিজে স্বপ্ন দেখে। এইখানে তার কাব্য সৃষ্টি হয় সার্থক। তারপর সে এই স্বপ্নের বাইরে এসে দাঁড়ায়। সে দাঁড়ায় জীবনের কারখানা-ঘরে। এখানে সে হয় শিল্পী। নিজ হাতে সে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগে।

রত্নেশ্বর জীবন শিল্পী। মানুষের জীবন খেলা নয়। সে সবাইকে ডাক দিয়ে ফেরে। সে দিব্যেন্দুসুন্দরকে ডেকে বলে, "ওগো কবি, এসো নেমে মাটির ধূলায় যে মাটিতে চলছে জীবনের জয়যাত্রা, এসো তার পুরোভাগে। এগিয়ে চল, এগিয়ে নিয়ে যাও।" সে ছুটে যায় বৈকুণ্ঠপ্রসাদের কাছে। বলে, "নিয়ে এসো তোমার দান, যোগ দাও এসে জীবনের শোভাযাত্রায়।" তারপর দেখা যায় তাকে শস্যক্ষেতে। সেখানে সে হলধরকে বলে, "তোমাকেও যোগ দিতে হবে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে। সেখানে তোমারই দান সকল দানকে ধন্য করবে।

তোমাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। তোমার সকল ব্যর্থতা দূর ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দের শরীক ক'রে নেব।"

হলধর সন্দেহের হাসি হাসে। কিন্তু তার মনে আশা জাগে।

দিব্যেন্দুসুন্দর বিদ্রূপ করে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে এক দিন ওর কথাই মানতে হবে।

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ ওকে ভয় দেখায়। কিন্তু জানে ওরই হাতে আছে তার পাতালপুরী ধ্বংসের অস্ত্র।

(প্রবাসী, ১৯৪৫)

সফল অভিযান

অন্ধকার রাত্রি।

কলকাতা শহরে এ রকম অন্ধকার কখনও কেউ ভাবতে পারে নি।

আলোক নিয়ন্ত্রণের অন্ধকার নয়, ব্ল্যাক আউটের নিরেট অন্ধকার।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের একটি বাড়ি। অন্যান্য বাড়ির মতো এ বাড়িটিও কালো আবরণে আত্মগোপন করে আছে। খুব কাছে গিয়ে দেখলে তবে বোঝা যায় এটি একটি দোকান, দশ-বারোটি তালা বুকে নিয়ে রহস্যময়ী রাত্রির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই, যেন বিভীষিকাময় কঠিন কালো নিস্তব্ধ সমুদ্রে ভাসমান একখানি ভৌতিক জাহাজ।

একটু দূরে গলির মোড়ে অন্ধকার আরও নিবিড়।

চারিদিক থম থম করছে। আশেপাশের বাড়িতে কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই, কিছুক্ষণ আগেও ছিল, কিন্তু রাত্রি এখন একটা। অনেক দিন সাইরেন বাজে নি, কিন্তু কখন বাজবে কে জানে? এক বছর আগের অভিজ্ঞতা আছে সবার। সাইরেন বাজলে ঘুম ভেঙে যায়—হানাদারী বিমান চলে গেলেও আর ঘুম আসতে চায় না, তাই সবাই আজকাল যত আগে পারে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু গলির মোড়ে এক জোড়া চোখ তখনও জাগ্রত।

চোখের মালিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তার চোখে ঘুম নেই।

তার দেহে মনে ক্লান্তি নেই। তার হাতের কঠিন পেশী কখনও ফুলে উঠছে, কখনও শিথিল হচ্ছে।

ঠুং ঠাং শব্দ করে বড় রাস্তা দিয়ে একখানা রিকশ চলে গেল। মধুর শব্দ। সমস্ত শহরের বুকে যেন ঐ একটুখানি প্রাণপ্রবাহ। ও যেন শেলীর স্কাইলার্ক, আর ওর শব্দ অনন্ত শূন্যে অশরীরী একটি পাখীর গান।

কিন্তু সে ধ্বনি গলিতে অপেক্ষমান যুবকের কানে পৌঁছল না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এসে জড়ো হয়েছে তার দৃষ্টিতে। হয়তো মুহূর্তের ভুলে তার এত সাধনা ব্যর্থ হবে।...কিন্তু সে কি তখন গাইবে —ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল, চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে? না সে প্রেমিক নয়। তার মনে কবিত্ব নেই। সে সকল রম্য ভাবের বাইরে। এখানে যেটুকু রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে সে শুধু প্রহরার রোমান্স।

খট্ ক'রে শব্দ হ'ল না বাড়িটির পাশের দরজায়? যুবকের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, তার সমস্ত পেশী লোহার মত শক্ত হ'ল।

সে দেখতে পাচ্ছে দরজাটা একটুখানি খুলেছে। ও কি টর্চের আলো? তবে এত নিষ্প্রভ কেন? টর্চের মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে আলোর জোর কমান হয়েছে। তাছাড়া টর্চের লেন্সটিও নিচের দিকে ফেরানো। নিষ্প্রদীপের আইন ঠিক আছে। যুবক দেখতে পাচ্ছে দু-তিন জন লোক বগলদাবা ক'রে এক একটা বাণ্ডিল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

আর দেরি নয়—জাগরণ তার সফল।

যুবক হিংস্র বাঘের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি লোকের ঘাড়ে। বাকী লোকগুলো দুপদাপ শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল।

ধৃত ব্যক্তির মুখে কোনো কথা নেই। সাহায্য প্রার্থনা ক'রে চীৎকার নেই। তার সমস্ত গা কাঁপছে যুবকের কঠিন স্পর্শে।

এই যুবক আর কেউ নয়, ভাবানীচরণ। সে এ পাড়ার তরুণদের নেতা।

"কেন আপনি গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে?" ভবানী ধৃত ব্যক্তিকে এক ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্ন করল।

কে এই ধৃত ব্যক্তি?

এও সুপরিচিত। নাম শশধর দাম। বিখ্যাত স্বদেশী কাপড়ের শ্রদ্ধেয় ব্যবসায়ী। সে ভবানীর নিষেধ সত্ত্বেও এই পাপের কাজটি করছে। শশধর ভবানীকে কথা দিয়েছিল করবে না, কারণ চোরা-বাজারের সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক নেই।

শশধর একেবারে অশিক্ষিত নয়, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু চাকরির মোহ তার ছিল না। এককালে আদর্শবাদী ছিল, এবং সেইজন্তেই গোলামি না ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ে ঢুকেছে। সে আজ দশ বছরের কথা।

ভবানী কিছুদিন ধরে শুনছে শশধর চোরা কারবারে নেমেছে। সবাই বলছে এ কথা। তার চালচলনে যে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে সেটা লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। আগের মতো ক্রেতার সঙ্গে সে প্রাণখুলে আলাপ করে না। আগে তার ব্যবহার অমায়িক ছিল, এখন হয়েছে কৃত্রিম, কর্কশ, এবং প্রায় অভদ্র।

তার অধঃপতনের কথাটা সবার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে

হঠাৎ। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে—বিশেষ ক'রে কোনো সৎ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো অসৎ কথা প্রচার হ'লে লোকের মনের একটি দিক যেমন তাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর একটা দিক তেমনি কথাটাকে বড়ই পছন্দ ক'রে বসে। —গুজবে কি কোনো সত্য নেই?

তা ছাড়া ঠিক সেই সময়েই গবর্মেণ্ট থেকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার হতে লাগল, গুজবে বিশ্বাস ক'রো না এবং তাতে শশধরের ক্রেতাদের মনে গুজব বিশ্বাসের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। লোকে যে শুধু বিশ্বাস করল তাই নয়, অনেকে প্রত্যক্ষ-দর্শী সাজল, এবং বলতে তাকে লাগল চোরাবাজারে মাল বিক্রি করতে তারা নিজের চোখে দেখেছে।

ভবানী উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারল কথাটা কিছু পরিমাণে সত্য। কিন্তু এর প্রতিকার কি? শশধরকে সে শ্রদ্ধা করে। তাই সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে এল। শশধর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা, কিন্তু ভবানী হাসে নি, বলেছিল সাবধানে থাকবেন।

এ রকম একবার নয়—দু-তিন বার তাকে শশধরের কাছে যেতে হয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই আবার জোর গুজব রটল—শশধর গোপনে কাপড় চালান করছে। ভবানী দমে গেল।

কিন্তু প্রমাণ তো কিছু নেই, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। সে ঠিক করল নিজের চোখে দেখে তবে সে তার সন্দেহ ভঞ্জন করবে। দিনের বেলা শশধরকে অনুসরণ করার জন্যে সে নিযুক্ত করল তার এক অনুচরকে, রাত্রের জন্যে নিযুক্ত হ'ল সে নিজে।

ক'দিন পরে আজ সে শশধরকে হাতে হাতে ধরেছে।

গায়ে তার ভীষণ শক্তি। শশধর তার হাতে যেন শশকের মতো অসহায় হয়ে পড়ল। ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তার, প্রবৃত্তিও আছে বলে মনে হ'ল না। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, "তুমি···ভবানী?"

"হ্যাঁ, আমি ভবানী, কিন্তু তাতে আপনার কিছু সুবিধা হবে না।"

"সুবিধার কথা ভাবছি না, তুমি কি করতে চাও বল।"—শান্ত ভাবে শশধর বলল।

"আমি কি করতে চাই সে কথা পরে হবে। আপনি কেন গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে, সেই প্রশ্নের উত্তর চাই আগে।"

শশধর বলল, "তা হ'লে হাত ছাড়, পালাব না, আলোটা জ্বালি—আমাকে আগে আলোটা জ্বালতে দাও।"

ভবানী হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল। শশধর আলো জ্বালল। ঢাকা-দেওয়া মৃদু আলো গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফরাসের উপর।

শশধর বলল, "দরজাটা বন্ধ ক'রে কাছে এসে বসো। তোমাকে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।"

দু-জনে পাশাপাশি বসল।

শশধর একটুখানি নীরব থেকে বলতে লাগল, "তোমার বয়স কম, ধৈর্যও কম, কিন্তু একটু ধৈর্য ধর।"

শশধরের নির্বিকার ভাব দেখে ভবানী অবাক হয়ে গেল। এই ভদ্র মুখোশধারী লোকটার কি চক্ষুলজ্জাও নেই? ভবানীর চোখে মুখে তখনও বিজয়ীর দৃঢ়তা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শশধর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবানীর দিকে চেয়ে বলল, "শুনবে আমার কথা?"

"সংক্ষেপে হয় তো শুনব। কিন্তু এর পরেও কি কিছু বলবার আছে আপনার ?"

"আছে, শোন।"

শশধর ভবানীর মুখের উপর মুখ নিয়ে, তার দৃষ্টি ভবানীর দৃষ্টিতে বিঁধিয়ে বলতে লাগল, "ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—"

ভবানী বাধা দিয়ে বলল, "ছেলেবেলার কথা থাক"

"না। অভিযানে এসেছ যখন সবই শুনতে হবে। শোন, বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না, বাঙালীরা চাকরি করতে পেলে আর কিছু চায় না—"

ভবানী আবার বাধা দিয়ে বলল, "কে বলেছে এ কথা ?"

"বলেছে তোমাদেরই দেশের লোকেরা। বলেছে—কিন্তু যাক শোন। সামান্য মূলধনে অনেক টাকা লাভ করা যে কত গৌরবের এ কথা যে আমার নয়, এ কথা স্বীকার কর ? অমুক হিন্দুস্থানী দু-আনার জিনিষ কিনে রোজ দু টাকা মুনাফা করে, আর বাঙালী বি-এ, এম-এ পাস ক'রে তিরিশ টাকা মাইনের গোলামি করে—এ কথা কে শুনিয়েছে এত দিন ? বাঙালীই শুনিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে এই কথা শুনতে শুনতে আমার মনে ধিক্কার জন্মে যায়। তাই তো এসেছি ব্যবসার পথে।"

ভবানী এ কথায় বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, "আপনার জীবনী শুনতে আসি নি—কি বলতে চান সোজা ভাষায় বলুন।"

"বলতে চাই যে তোমাদের দেশেরই মনীষীরা ব্যবসার মোটা লাভের কথা কি সগৌরবে প্রচার করেন নি এত দিন ?"

ভবানী বিরক্ত ভাবেই বলল, "হ্যাঁ, করেছেন।"

শশধর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলল, "করেছেন! হুঁ! তা হ'লে জ্ঞান দেখছি।—"

তারপর জিব দিয়ে দুটো ঠোঁট মুছে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল, "চারদিকে বাঙালী পেয়েছে বিদ্রূপ আর ধিক্কার। কেন? না, বাইরের লোকেরা এসে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা দেশ থেকে। বাঙালী তরুণেরা কেবল শুনেছে, বাঙালী নির্বোধ। শুনে শুনে মন বিদ্রোহ করেছে। সে সব কথা মনে কেটে কেটে বসেছে। আজও তার দাগ মেলায় নি। আজও সেই সব শুভার্থীদের ধারালো কথার ধ্বনি কানে বাজে মাঝে মাঝে। কিন্তু শোন ভবানী, তোমরা তরুণে দল, তোমাদের আমি ভালবাসি। আমিও এককালে তরুণ ছিলাম—তোমাদেরই মতো দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ব্যবসার পথে এসেছি। কিন্তু ব্যবসা মানেই তো লাভ করা—আর লাভ করার মধ্যেই তো আছে অসাধুতা। কখনও তো ভাবি নি যে ব্যবসা করব অথচ লাভ করব না। ভাবি নি তো যে লাভ করব—অথচ সাধু থাকব। যত লাভ তত বাহবা! যত বেশি লাভ, তত বেশি খাতির! পাই নি খাতির এতদিন আমার দ্রুত সাফল্যে? পেয়েছি। তোমরাই খাতি করেছ। এখন ভুললে চলবে কেন? তুমি ভবানী আজ চোরাবাজার দমনের অভিযান চালাচ্ছ, তুমিও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের গুণগান করেছ। আমারই কাছে বসে কত ফোর্ড—কত রকফেলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছ। তা আমার মনে আছে। ব্যবসা করব, মুনাফা করব, এই হ'ল ব্যবসায়ীর ধর্ম। এ ধর্ম তার রক্তে, তার মজ্জায়। আজ হঠাৎ আইনের বলে সে পথ যদি বন্ধ হয় তবে আইনটাকেই বড় ক'রে দেখা তোমার মতো শিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সত্যই বাড়াবাড়ি নয়?"

"ভবানী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল শশধরের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা। তাঁর

এই প্রশ্নে সে যেন চমকে উঠল। সে সংক্ষেপে বলল, "লোকে যে াপড়ের অভাবে আজ মারা যাচ্ছে, এ অবস্থায়—"

ইতিপূর্বে ভবানী শশধরের হাত চেপে ধরেছিল, এবারে শশধর বজ্রমুষ্টিতে ভবানীর কব্জী চেপে ধরল। তার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "লোকের মারা যাবার দুঃখ কবে থেকে অনুভব করতে শুরু করেছ? যুদ্ধ তো সে দিন বেধেছে—তার আগে চিরদিনই এ দেশের লোক ভাত কাপড়ের অভাবে মারা গেছে। কবে কোন্ ব্যবসায়ী তাদের দুঃখে গ'লে কাপড় আর চাল বিতরণ করেছে দেশের কোটি কোটি লোককে? কোনো অবস্থাতেই, ্যবসায়ী তার ধর্ম ছেড়েছে? লজ্জা করে না বলতে? আজ হঠাৎ তোমাদের এই নীতিজ্ঞান দেখে আমি বিচলিত হচ্ছি। বহু কালের অসুখ। কিন্তু অসুখের মূলে না গিয়ে এসেছ তার সহস্র লক্ষণের একটিকে আইনের ওষুধে সারাতে। বলছি, পারবে না। কিছুতেই পারবে না। শুধু নিজেকে ভোলাবে।" —শশধর হাঁপাতে লাগল।

শেষের কথাগুলোর একটাও ভবানীর কানে গেল না। শশধর হঠাৎ বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের মতো বড় হয়ে উঠল, আর তার নিজেকে মনে হতে লাগল যেন একটি ছোট্ট ইঁদুর সেই বিরাট পাহাড়ের পাশে বসে আছে।

কোনো কথা না বলে নীরবে সে সেখান থেকে উঠে গেল। তার মাথা ঝিম ঝিম করছিল, পা টলছিল।

সমস্ত রাত তার ঘুম হ'ল না!

পরদিন সকালে উঠেই সে শশধরের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বিকেলে আবার দেখা হ'ল তাদের!

এই ভাবে মাসখানেকের মধ্যে দু-জনে ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হয়ে উঠল।

এর পর আরও কয়েক মাস কেটে গেছে। ভবানী এম-এ পাস ক'রে বেকার ছিল, এখন তার আয় মাসে দু শ থেকে পাঁচ শ টাকা।

শশধরের কাপড়ের গাঁট সে একাই রাত্রে চালান করে। তার দহিক শক্তি এত দিনে সার্থক হ'ল এইটে বুঝতে পেরে সে খুশি আছে।

(প্রবাসী, ১৯৪৫)

বাড়িওয়ালা তিনকড়ি দত্ত জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন আদেশের অপেক্ষায় ; এতক্ষণ তিনি স্বয়ং মিস্ত্রির সঙ্গে উপস্থিত থেকে আমার ঘরের প্রত্যেকটি ফাটল সিমেন্ট করিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন, চুণকামটা কবে করিয়ে দিলে আপনার সুবিধে হবে, সার ?

সত্যিই তিনকড়ি দত্তের মতো বাড়িওয়ালা সহজে দেখা যায় না। এ রকম বিনয় বৈষ্ণব পাড়াতেও দুর্লভ।

কিন্তু কেন ?

এ কথার উত্তর দিতে হ'লে একটুখানি পটভূমিকা দরকার।

যখনকার কথা বলছি তখন আমার কলকাতা-বাস প্রায় দু'বছর পূর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের সম্পর্কিত একটি করি নিয়েই প্রথম কলকাতা এসেছি, কিন্তু তখন কে জানত যুদ্ধের ঢেউ কলকাতার গায়েও লাগবে ? জাপানীরা বর্মায় পা দিতে না দিতে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। কলকাতা শহরটি হয়ে পড়ল একটি প্রকাণ্ড কড়ার মতো। সে না দেখলে

বিশ্বাসই হবে না এত-বড় কড়াটা এমন তরল পদার্থে পূর্ণ। এমনি

অবস্থায় জাপানী বোমার ঝাপট্টা লাগল তার গায়ে। কড়াটা একবার পূবে, একবার পশ্চিমে হেলতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের তরল পদার্থ একবার শিয়ালদ, একবার হাওড়ায় ঢেলে পড়তে লাগল। এমনি ভাবে ১৯৪২-এর শেষে দেখি, তলানী যেটুকু পড়ে আছে তারই মধ্যে পড়ে আছি আমি শ্রীজলধর গাঙ্গুলী, আমার পরিবার এবং আমাদের বাড়ির মালিক তিনকড়ি দত্ত। কিছু সান্ত্বনা পাওয়া গেল তাতেও।

আমার পালাবার উপায় ছিল না। পৃথিবীতে তখন দু'জন লোক জীবন-যুদ্ধে বিব্রত—হিটলার ও আমি। আমরা দু'জনেই জানতাম, যুদ্ধের শেষ মানে আমাদেরও শেষ। আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ উপলক্ষে নিজেদের সুবিধে ক'রে নেওয়া।—কিন্তু সে কথা যাক্।

শূন্য শহরের দৃশ্য জীবনে ভুলব না। এত বড় প্রকাণ্ড একটা দেহ অথচ হৃৎপিণ্ড নেই! দিনে মন উদাস হয়ে যায়, রাত্রে গা ছম-ছম করে, মনে হয় শ্মশানে বাস করছি। পথের আবর্জনা পথেই পড়ে আছে, কারও কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, পথের ধারে ধারে দু'-চার জন লোকের জটলা, কিন্তু তারা যেন মানব-সমাজের কেউ নয়, যেন সব ছায়া-মূর্তি। এর উপর আবার প্রতিরাত্রে সাইরেন বাজার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকা এবং বাজলেই আশ্রয়ে গিয়ে ঢোকা! বোমা ফাটার শব্দ শুনলে কেবলই মনে হ'তে থাকে পেট বড় না প্রাণ বড়?

কিন্তু সব অন্ধকারই আলোহীন নয়, সব দুঃখেই সান্ত্বনা আছে। যে দিন রাত্রে বোমাগুলো কানের কাছেই ফাটল, তার পরদিনই তিনকড়ি দেখা দিলেন করুণার অবতাররূপে। কণ্ঠে তাঁর গভীর অনুকম্পা। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িতে কোনো দিকে অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

তাঁর এই পরম আত্মীয়জনোচিত কথায় মন বিগলিত হ'ল।

বললাম, "না অসুবিধা তেমন কিছু হচ্ছে না, তবে ভাবছি থাকব কি যাব।"

তিনকড়ি দত্ত বিচলিত ভাবে বললেন, "না না, যাবেন কেন? গেলে বড্ড ভুল করবেন, ভীষণ ঠকবেন, আমার দিক দিয়ে যতটা পারি সুবিধে ক'রে দিচ্ছি, আপনি থাকুন।"

"সুবিধে আর কি করবেন? প্রাণটাই যদি যায়—"

"প্রাণটাকে খুব মূল্যবান মনে করছেন বুঝি? তা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু প্রাণের চেয়েও দামী কি কিছু নেই? তার জন্যেও কি থাকতে চাইবেন না?"

"সেটা কি জিনিস?"

"টাকা, মশাই, টাকা। বাড়িভাড়া কমিয়ে দিচ্ছি, খুব সুবিধে ক'রে দিচ্ছি। ভাড়াটেদের সুবিধে যদি আমরা না করি তো কে আর করবে?"—এই ভাবে আমাকে তিনি অনেক বোঝালেন।

অবশেষে তিনকড়ি দত্তের কাছে আমি হার মানলাম। আমাকে স্বীকার করতে হ'ল প্রাণের চেয়ে টাকা বড়।

"কিন্তু কত কমাবেন ভাড়া?"

"কত দিলে আপনি খুশি হন?"

একটু ভেবে বললাম, "গোটা দশেক টাকা দেব মাসে।"

তিনকড়ি আমার দিকে চাইলেন, তাঁর মুখে হাসি, চোখে কাতরতা, চল্লিশ টাকা দশ টাকায় নেমে আসার বেদনা তাঁর অন্তরে।

"হ্যাঁ, ঐ দশ টাকাই নেবেন। কত বাড়ি, মশাই, খালি পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে বিনা ভাড়ায় থাকা যায়।"

তিনকড়ি হেসে বললেন, "আর বলতে হবে না, কি দুর্দিনই এলো—দড়াম ক'রে এক বিপর্যয় কাণ্ড!—আপনি দশ টাকাই দেবেন, তবু তো থাকবেন, তাতেই আমি খুশি হয়েছি।"

তিনকড়ি আমাকে কড়ির মায়ায় আবদ্ধ করলেন, নইলে হয় তো আপাততঃ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই বড় হয়ে উঠত। যুক্তিও একটা জাগল মনের মধ্যে।—বোমা ঠিক আমাদের মাথাতেই পড়বে কেন? লটারিতে টাকা পাওয়া যেমন কঠিন, বোমায় মরাও তেমনি কঠিন—দুটিই ভাগ্যের ব্যাপার।

তার পর কালিঘাট, কোষ্ঠীবিচার, মাদুলিধারণ এবং নিশ্চিন্ত হওয়া। সাইরেন বাজলে আর বুক কাঁপে না। এই আশ্চর্য পরিবর্তনে একটা মস্ত উপকার হ'ল। এবারে অন্তর-প্রদেশ থেকে বাইরে চোখ ফেরাবার সুযোগ হ'ল। তাকিয়েই সবিস্ময়ে দেখি, বহিঃপৃথিবীতে পরম সুযোগ উপস্থিত। অর্থাৎ পলায়মান লোকদের আসবাবপত্র বড় শস্তায় যাচ্ছে।—সেই দিকেই মন দিলাম কিছু দিন।

বোমা-ভীত লোকেরা দেখে অবাক হ'ল, আমিও নিজের ব্যবহারে কম অবাক হইনি। ওদিকে হিটলারও রাশিয়া আক্রমণ করে আমারই মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু যে ঘরে বাস করি তার সকল দেয়ালে ফাটল,—দামী আসবাব পত্র সে ঘরে মানায় না। চূণকামও করা হয়নি দু'বছর। কথাটা তিনকড়ির কাছে পাড়ামাত্র তিনি ত্রুটির জন্যে বার বার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, "আমার কাছে ফর্মালিটি করবেন না, সার্। যখন যা দরকার হয় ঘাড় ধ'রে করিয়ে নেবেন।"

ক্রমে একটার পর একটা অসুবিধা চোখে পড়তে লাগল—এবং তিনিকড়িও নিজে মিস্ত্রির সঙ্গে উপস্থিত থেকে সব ঠিকঠাক ক'রে দিতে লাগলেন। এক দিন হেসে বললেন, "বলুন তো এ ঘরে একটা মস্ত বড় দোষ কি আছে?"

আমি চিন্তা করতে লাগলাম। তিনকড়ি বললেন, "বুঝতে পারেননি, আশ্চর্য! আরসোলার মস্ত এক আড্ডা আছে রান্নাঘরের ঐ কোণে।"

"ঠিক বলেছেন তো! আরসোলার উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; খাওয়ার সময় সব দল ধরে উড়তে আরম্ভ করে"—

"কিছু ঘাবড়াবেন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

সেই দিনই লোক লাগিয়ে তিনি হাজার কয়েক আরসোলা মেরে দিলেন। আমারও চোখ খুলে গেল সেই মুহূর্ত থেকে; আগে যা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এখন থেকে তা একে একে সবই চোখে পড়তে লাগল। পরদিন তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হ'তেই আমার পরবর্তী আবিষ্কারের কথাটা জানিয়ে দিলাম। বললাম, "মশাই, আপনার বাড়িতে ইঁদুরের অত্যাচার বড্ড বেশি—এ কথাটা এত দিন গোপন করা আপনার অন্যায় হয়েছে।"

"কেন, ইঁদুর কি এত দিন আপনার চোখে পড়েনি?"

"হয় তো পড়েছে, কিন্তু এত দিন কি আর দেখবার মতো চোখ ছিল?—এবারে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

তিনকড়ি ভয়ে ভয়ে বললেন, "মুস্কিলের কথা।"

"তার মানে?"

"মানে, ইঁদুর ধরাও যেমন শক্ত, মারাও তেমনি শক্ত। ঐ উৎপাতটা, সার, মেনেই নিতে হবে।"

"তার মানে ইঁদুর সম্পর্কে আপনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান?"

"না—ঠিক তা নয়"—

"ও সব চালাকি চলবে না, ব্যবস্থা করুন, নইলে বাড়ি ছেড়ে দেব।"

দাবী করলেই সুবিধা আদায় হয়, দাবী বাড়িয়েই চললাম, এবং সেই সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সুর ক্রমশঃ চড়া ও কড়া হতে লাগল। তিনকড়িকে অগত্যা বলতে হ'ল, "আচ্ছা দাঁড়ান, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সন্ধ্যায় হঠাৎ মিউ মিউ শব্দে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখি, তিনকড়ির

গোমস্তা কোত্থেকে দু'টি বেরালছানা জোগাড় ক'রে এনেছে। তিনকড়ি কিছু দুধও ঐ সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

এই ক'দিনের মধ্যে আমি জমিদার হয়ে উঠেছি—তিনকড়ি হয়েছেন আমার প্রজা। তাঁকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' সম্বোধন ধরেছি। কিন্তু তাতে ফল আরও ভালই হয়েছে। ঘরের ঝুল পরিষ্কার ব্যাপারেই সেটা আরও বুঝতে পারলাম।

দেয়ালের কোণে কিছু ঝুল জমেছিল, তাঁকে ডেকে বললাম, "তোমার এই নোংরা বাড়িতে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না, অবিলম্বে ঝুল পরিষ্কার করিয়ে দাও, নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।"

তিনকড়ি তখুনি লোক পাঠিয়ে দেবেন বলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে গেলেন, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও কোনো ব্যবস্থা হ'ল না। আমার গলা চড়ে গেল। তাকে চোর-জোচ্চোর যা মুখে আসে গাল দিতে লাগলাম।—হিন্দী ভাল বলতে পারি না, অবশেষে বাংলা ভাষার চরম কথাটি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, "শালা জোচ্চোর।"

তিনকড়ি জোড় হস্তে বিনীত সুরে প্রায় কেঁদে এসে বললেন, "এই বারটি মাপ করুন, সার্, লোকজন কেউ ছিল না, তাই পাঠাতে পারিনি—এলেই পাঠিয়ে দেব।"

"বেশ, আমি আরও এক ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যেও যদি ঝুল পরিষ্কার না হয় তা হ'লে আমি এক পয়সা ভাড়া দেব না।"

"উপরন্তু, সার, পিঠে জুতো মারবেন।"—বলে তিনকড়ি

বিদায় হলেন, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই লোক পাঠিয়ে ঘরের যাবতীয় সাফ করিয়ে দিলেন।

বাড়িভাড়ার দশটা টাকাও সময় মতো দিতাম না। তিনকড়িও যেন নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে টাকাটা নিতেন। অনেক সময় এ নিয়েও ধমকানি দিয়ে বলেছি, "ন্যাকামি না ক'রে টাকাটা নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর!"

সময়ের দ্রুত পরিবর্তন হ'তে লাগল। ইতিমধ্যে হিটলারও স্টালিনগ্রাড থেকে ফিরে আসার আয়োজন করছেন।

আমার কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে গেছে। তিনকড়ির সঙ্গে ঝগড়া করার সময় আর আমার নেই। ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরি তখন নিজেকে হিটলারের মতোই পরাজিত মনে হয়।

১৯৪৩ সাল। শহরের অবস্থাও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কলকাতার পথে যত লোক মারা গেল না খেয়ে, তার পঞ্চাশ গুণ জীবন্ত লোক এসে শহর ছেয়ে ফেলল। খালি বাড়িগুলো দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল, বাড়িভাড়া চড়তে লাগল মিনিটে মিনিটে।

তিনকড়ি দত্ত দেখা হ'লে এখন আর মাথা নত করেন না, কথাও বলেন না, তাঁর নোয়ানো শির খাড়া হয়ে উঠেছে, তাঁর এখন সময়ের বড় অভাব।

অবশেষে যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। যথাসময়ে ভাড়াবৃদ্ধির নোটিস্ পেলাম। এ দিকে বাড়িটি যথাপূর্ব আরসোলা, ইঁদুর এবং ঝুলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেরালগুলো সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়, ইঁদুরের চেয়ে মাছই তাদের বেশি পছন্দ।

এমনি নোংরা ঘরে আসবাবপত্র বেমানান হয়ে উঠল। আমার হঠাৎলব্ধ জমিদারি মনটিও নানা কারণে বিষিয়ে উঠল।

ভাড়াবৃদ্ধির জন্যে অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম, তবু ভেবেছিলাম দু'-একটা

কথা বলব তিনকড়ির সঙ্গে। ভেবেছিলাম, বলি, বিপদের সময় ছেড়ে যাইনি, এখন কি একটুও বিবেচনা করবেন না? কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না। দেখলাম, আমাদের বাড়িতে যতগুলো পৃথক ফ্ল্যাট ছিল, সমস্ত ভর্তি হয়ে গেছে, পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে নতুন সব ভাড়াটে এসেছে, আরও ফ্ল্যাট খালি আছে কি না তার সন্ধান নিতে প্রতিদিন দলে দলে লোক আসছে। সুতরাং দশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায় বিনা প্রতিবাদেই ফিরে গেলাম।

বর্ষাকাল এল। পুরনো বাড়ি, ছাদের একটা কোণ থেকে ভিতরে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল। তিনকড়িকে জানিয়েও কোনো ফল হ'ল না। তাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করছিলাম, আবার 'আপনি' ধরলাম, কিন্তু তাতেও কোনো সুবিধে হ'ল না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এক দিন—দু'টি বেরালছানার জন্যে দু'টাকার এক বিল এসে হাজির! বিল পেয়ে বুঝলাম এবারে তিনকড়ির পালা।

তাঁরই বা দোষ কি? শহরের যেখানে যেটুকু জায়গা ছিল সমস্ত দখল হয়ে গেছে। মোটর গারাজে, গোরুর ঘরে, লোক বাস করতে শুরু করল। ছাদে তাঁবু খাটিয়ে নতুন ভাড়াটে বসানো হল। আত্মীয়-স্বজনে গৃহস্থবাড়ি ভরে উঠল, বাকী রইল শুধু গাছের ডাল।

তিনকড়ি কিছুতেই ছাদ মেরামত করলেন না। ভয় দেখানোর উপায় নেই, উঠে যাবার উপায় নেই, উঠলেই দ্বিগুণ ভাড়ায় লোক আসবে—তিনকড়ির তো সেটাই কাম্য।

আরও একবার চেষ্টা করলাম। অতি বিনীত ভাবে একখানা চিঠি পাঠালাম তাঁর কাছে। উত্তরে পেলাম এক নোটিস্—বাড়িভাড়া বৃদ্ধি হ'ল আরও দশ টাকা। নিজে গিয়ে আবেদন জানালাম, "অনেক দিন আছি, একটু দয়া হবে না, সার্?"

'দয়া?"—তিনকড়ি নির্মম ভাবে বললেন, "দয়া?—যে বাড়িতে

আছ তার ভাড়া এখন আশি টাকা। সেখানে পঞ্চাশ টাকা দয়া ?”

“কিন্তু ছাদ দিয়ে জল পড়ে”—

কুৎসিত রসিকতা ক'রে তিনকড়ি বললেন, “বৃষ্টি হ'লে জল পড়বে না তো পড়বে কি সোনা-রূপো ?” এ ভাবে অকারণ বিরক্ত কর তো জুতিয়ে লম্বা করব।”

জোর ক'রে হাসার চেষ্টা করলাম।

তিনকড়ি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে বললেন, “যাও, যাও, পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় নবাবী করা চলে না, খুশি হয় থাক, না হয় উঠে যাও। এত যা চেয়েছ তা দিয়েছি, এখন আর পারব না, মাপ কর।”

তিনকড়ি ক্রমেই আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল, আমাকে বোধ হয় তুলে দেওয়ার মতলব করছেন। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব ? আমি সাবধান হ'লাম কিন্তু ভাড়ার টাকাটা পয়লা তারিখে দেবার চেষ্টা ক'রেও তাঁকে ধরতে পারা গেল না। রোজই শুনি বাড়িতে নেই। এমনি ক'রে সাত আট দিন কেটে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভাড়া না দেওয়ার অপরাধে বাড়ি ছাড়তে হ'লে কলকাতায় আর দাঁড়াবার জায়গা নেই—যেমন ক'রে হোক ভাড়াটা জমা দিতেই হবে।

ভোর বেলা উঠে গেলাম তিনকড়ির দরজায়। ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়লাম।

“কে ?”—প্রশ্ন এল ভিতর থেকে।

“আমি জলধর গাঙ্গুলী, সার্।”

বিরক্তিপূর্ণ চাপা স্বর শোনা গেল, “শালা ভোর রাত্রে এসেছে জ্বালাতে।”

ভাড়াটা হাতে তুলে দিয়ে মনে হ'ল যেন মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু ভাগ্যকে রোধ করবে কে? হিটলার জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হ'লেন, ঐ সঙ্গে আমিও। যুদ্ধের দরুন অফিসটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা : হিটলার নেই, আমিও নেই।

(বসুমতী, ১৯৪৫)

গণতান্ত্রিক জনতা। ডি এস-সি, পি-এচ ডি, ডি লিট, এম এ, বি এ, এম বি, এম এস-সি, বি এল, আই এ, ম্যাট্রিকুলেট, ক্লাস টেন, কেরানি, দোকানদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

একই ছাদের নিচে।

বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি।

কারও জামাকাপড় ভিজে, কারও গায়ে বর্ষাতি, কারও হাতে ছাতা, কারও জামাকাপড় শুকনো—সদ্য গাড়ি থেকে নামা।

এঁদের মধ্যে আলাপ চলছে কিছুক্ষণ ধ'রে। বিষয়, সিনেমা।

ডি এস-সি বলছেন, আমাদের দেশে সিনেমা এত বড় একটা শিল্প, অথচ আজ পর্যন্ত ভদ্রগোছের একটা ছবি তৈরি হ'ল না।

ডি লিট বললেন, হবে কেমন ক'রে? এদেশের লোক কোন্ কাজটায় সীরিয়স? কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে একটা কিছু খাড়া ক'রেই বলে শ্রেষ্ঠ অবদান।

এম এ (ইতিহাস) বললেন, আমার বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলন থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছে।

এম এস-সি বললেন, আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না।

এম এ বললেন, স্বদেশী আন্দোলনের যুগের কথাটি স্মরণ করুন। তখন বাঙালী গাইল "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

আন্‌ডার গ্র্যাজুয়েট, আই এ, ম্যাটিক সমস্বরে বলে উঠল, এতে অন্যায়টা কি হ'ল ?

এম এ বললেন, বলিনি তো অন্যায় হয়েছে। সে সময় মোটা কাপড় পরা অন্যায় হয়নি, কিন্তু কালক্রমে ঐ কথাটির অর্থ লোকে ভুলে গেছে।

বি এ বললেন, কি রকম ?

এম এ বললেন, লোকে ক্রমে ভাবতে শুরু করেছে স্বদেশী মোটা জিনিসমাত্রেই মাথায় তুলে নেওয়া দরকার, আর তা থেকে শেষে এই দাঁড়িয়েছে যে, যা কিছু মোটা এবং খারাপ তাই স্বদেশী, এবং তাই আদর্শ।

পি-এচ ডি বললেন, এটা কি একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না ?

এম এ বললেন, তা হয় তো হচ্ছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের আদর্শ সেই থেকে আর উঁচুতে ওঠেনি।

ডি লিট বললেন, বাঙালীদের কিন্তু ধারণা, তারা আর্ট বোঝে।

ডি এস-সি বললেন, সেটা একমাত্র বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নয়, সব দেশের সব লোকেরই ধারণা তারা সব কিছু বোঝে। সব কিছু বুঝি না বলতে পারেন তিনিই, যিনি অন্ততঃ একটা জিনিসও ভাল ক'রে বুঝেছেন।

পি-এচ ডি বললেন, সিনেমা যারা করবে তাদের কল্পনার জোর নেই। গল্প অবশ্য তারা মনে মনে একটা ভাবে কিন্তু তা অখণ্ডভাবে ভাবতে পারে না।

আন্‌ডার গ্র্যাজুয়েট বলল, বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

পি-এচ ডি বললেন, গল্পের অংশগুলো পৃথকভাবে কল্পনা করে, কিন্তু সেই অংশগুলো একত্র ক'রে মোটের উপর কি দাঁড়াচ্ছে তা কল্পনা করতে পারে না। অথচ গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে তারই উপর।

ডি এস-সি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আমাদের সিনেমাকে হিটলারের যুদ্ধ-পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। খণ্ড অংশগুলো পর পর বেশ সাজানো হ'ল, কিন্তু সব মিলে কোনো সফল পরিণতির দিকে নিয়ে গেল না।

ডি লিট বললেন, তার চেয়ে বলুন সিনেমা ডাইরেক্টর সামান্য সাঁতার শিখেই বড় বড় নদী পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু দু' চার গজ গিয়েই হাবুডুবু খেতে থাকে। তারপর কোনো রকমে অপর পারে গিয়ে হাজির হয় বটে, কিন্তু তখন আর তাকে চেনা যায় না, জল খেয়ে পেট ঢাক হয়েছে, চোখ হয়েছে রক্তবর্ণ, মাথা দপদপ করছে, সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন। পারে গিয়েই ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

পি-এচ ডি বললেন, আরও একটা উপমা চলতে পারে। ডাইরেক্টর রওনা হ'ল অন্ধকারে। উদ্দেশ্য, অন্ধকারের শেষে আলোর দেশে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আলো তার সহ্য হয় না। তাই সে ঠিক করল আলো থেকে ফের অন্ধকারে ঢুকবে। যতক্ষণ আলো ততক্ষণ তার চোখ বাঁধা, তারপর অন্ধকারে পুনঃ প্রবেশ ক'রে পরম নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিল।

আন্‌ডার গ্র্যাজুয়েট বলল, আপনারা এ ভাবে নীতি আলোচনা না ক'রে কোনো একটা বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করুন না?

ম্যাট্রিক এ কথার সমর্থন করল।

পি-এচ ডি বললেন, একটার নাম করুন।

ম্যাট্রিক বলল, "বেলা ব'য়ে যায়" ছবিটাই ধরুন না।

দোকানদার বলল, ও ছবিতে আবার নিন্দার কিছু আছে না কি? এমন চমৎকার ছবি!

কেরানি এতক্ষণে সাহস পেয়ে বলল, পাঁচবার দেখেছি মশাই, আরও দেখব ব'লে বেরিয়েছি।

বি এল বললেন, ভালমন্দ তোমরা কি বুঝবে ?

এম বি বললেন, বেশ তো "বেলা ব'য়ে যায়" নিয়েই আলোচনা হোক।

শেষে সবাই রাজি হ'ল আলোচনা শুনতে। বৃষ্টি আরও জোর আরম্ভ হয়েছে, আলোচনাও বেশ জমে উঠল।

পি-এচ ডি বললেন, ধরুন এই ছবিটার নায়ক শিক্ষিত যুবক, সে দেশের কাজ করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়েছে। তার বাবা নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "বাবা, বাড়িতে বিষয় সম্পত্তি আছে, জমিজমা আছে তাই দেখ।" ছেলে বলল, "না, আমি দেশের কাজ করব।" "তবে বেরিয়ে যাও হতভাগা" ব'লে বাপ তাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেন।—কেমন, ঠিক নয় ?

সবাই বললেন, ঠিক।

পি-এচ ডি বলতে লাগলেন, ছেলে তো দেশের কাজ করবে ব'লে বেরিয়ে এলো, কিন্তু দেশের কোন্ কাজ সে করবে ? ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল পথে বিপথে। কাজ খুঁজে পায় না কোথায়ও। ইতিমধ্যে হঠাৎ পথেই এক মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হ'ল। সেও বোধ হয় কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই না ?

সবাই বললেন, ঠিক তাই।

পি-এচ ডি বলতে লাগলেন, তারা আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে ব'সে মিনিট পনেরো ধ'রে গান গাইল। তারপর দেখা গেল দু'জনেই দু'জনকে ভালবেসেছে। এইখানে গল্প জমে উঠল। মেয়েটি যুবকের হাতে হাত রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কিন্তু বিয়ে করবার উপায় নেই।" "কেন নেই ?" যুবক কাতরভাবে প্রশ্ন করল। মেয়েটি কিছুতেই তা বলল না। তখন দু'জনে আবার গান গাইতে লাগল। একটার পর একটা গান গেয়ে চলল—মিনিটে

একটা ক'রে। তারপর থেকে এদের যেখানে যখন দেখা হয় তখনই গান গায়।

কেরানি হঠাৎ ব'লে উঠল, কি গান মাইরি! যতবার শোন ততবার নতুন।

ডি লিট তাকে ধমকে থামিয়ে দিলেন।

পি-এচ ডি বলতে লাগলেন, দেশের কাজ করবে ব'লে যে ছেলে প্রতিজ্ঞা করল, সেই প্রতিজ্ঞা তার কোথায় গেল? এত সহজে যদি ভুলবে, তা হ'লে ছেলেটাকে শিক্ষিত করা হ'ল কেন?

এম বি বললেন, বোধ হয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই দেখে বুঝতে পারবে ব'লে তাকে একই সঙ্গে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত করা হয়েছে।

ডি লিট বললেন, এবং গান দেওয়া হয়েছে যারা গান শুনতে ভালবাসে তাদের জন্যে।

ডি এস-সি বললেন, এবং নায়ক ও নায়িকা পরকালে গিয়ে মিলবে ব'লে শেষ দৃশ্যে তাদের বিষ খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য নাস্তিক দর্শকদের পরকালে বিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে।

এম এ বললেন, এবং শিক্ষিত যুবকের আর কোনো কাজ নেই, সে কেবল একটি মেয়ের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এটা করা হয়েছে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যে।

এম এস-সি বললেন, আর আলাপ করতে করতে ওরা ছাদ থেকে পাঁচ বার নিচে পড়ে গেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রমাণ করার জন্যে।

ম্যাট্রিক সবিস্ময়ে বলল, সে তো নিউটনের সময় একবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

এম এস-সি বললেন, সে হয়েছে ইউরোপে। আমাদের দেশে দিনে প্রমাণ হ'ল।

দোকানদার ভয়ে ভয়ে বলল, একটা কথা আপনারা বাদ দিচ্ছেন। ওরা দু জনে তিন চার বার লরির নিচে চাপা পড়েছিল না?

ডি এস-সি বললেন, হ্যাঁ, পড়েছিল "দেখেশুনে পথ চল" অভিযানকে সাহায্য করার জন্যে।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রশ্ন করল, কিন্তু ছবির নাম "বেলা ব'য়ে যায়" হল কেন? নামের সঙ্গে গল্পের তো কোনো মিলই নেই।

পি-এচ ডি বললেন, পরকালযাত্রী যেসব বৃদ্ধ এই ছবি দেখবে তারা খুশি হবে ব'লে। তারা পাছে ভুলে যায় যে আর তাদের বেলা নেই, তাই এই সতর্কবাণীটি ছবির নামের সাহায্যে মনে করিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আলাপ এই পর্যন্ত অগ্রসর হ'তেই এঁদের পাশের দরজা খুলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। "বেলা ব'য়ে যায়"-এর প্রথম 'শো' শেষ হ'ল। আলাপচারী ভদ্রলোকেরা এতক্ষণের অপেক্ষা সার্থক বোধ করলেন।

খোলা দরজা দিয়ে পুরুষ দর্শকরা গুঞ্জন করতে করতে বেরিয়ে আসছে।

মেয়েরাও বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে, অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, চোখমুখ তাদের ফুলে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি আর নেই।

ডি এস-সির স্ত্রী ক্রন্দনরত অবস্থায় স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ডি লিটের স্ত্রীরও একই অবস্থা। চোখমুখ ফুলে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। তিনি টলছেন, আর এক মিনিটও দাঁড়ালে বোধ হয় পড়ে যাবেন।

পি-এচ ডির স্ত্রীকে মূর্ছিত অবস্থায় ঘর থেকে বের করা হ'ল।

তাড়াতাড়ি ক'রে এঁরা নিজ নিজ স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়িগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সবাই আবার ফিরে এসে পূর্ব-স্থানে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় শো আরম্ভের আগে দরজা খোলামাত্র ডি এস-সি, পি-এচ ডি, ডি লিট, এম এ, বি এ, এম বি, এম এস-সি, বি এল, আই এ ম্যাট্রিক, সবাই ভিতরে ঢুকে নিজ নিজ আসন দখল ক'রে বসলেন।

বলা বাহুল্য, টিকিট এঁদের পূর্বাহ্নেই কেনা ছিল এবং এঁরা প্রত্যেকেই ছবিখানা দু'তিনবার ক'রে দেখেছেন।

(যুগান্তর, ১৯৪৫)

ত্যাগী বলছেন, সংসার অনিত্য, আমরা বহু পাপের ফলে এ সংসারে মানুষ হয়ে জন্মেছি। এই জন্ম চিরদিনের জন্যে ঘুচিয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কাম্য।

সুলতান মামুদ প্রথমবার ভারত আক্রমণ করলেন।

ত্যাগী বলে চলেছেন, সংসার অনিত্য, যাদের আমরা আত্মীয় জ্ঞানে আঁকড়ে ধরছি, সেই তো আমার পরম শত্রু। কারণ সেই আমাকে মায়ায় আবদ্ধ ক'রে রাখছে। মায়া ত্যাগ কর, মোহ ত্যাগ কর।

সুলতান মামুদ দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করলেন।

ত্যাগী বলছেন, সমস্ত ত্যাগ ক'রে গোবিন্দকে ভজনা কর। এ সংসারে কেউ কারো নয়। বিত্ত ত্যাগ কর, বিত্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, সুতরাং সেটি বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

ইতিমধ্যে সুলতান মামুদ আরও চোদ্দবার ভারত আক্রমণ ক'রে গেছেন।

ত্যাগী বলে চলেছেন. তোমার স্ত্রীই বা কে, তোমার পুত্রই বা কে ?

শ্রোতাগণ সমস্বরে বক্তাকে ধন্য ধন্য করছে। বলছে, আহা, এমন অমৃতময় বাক্য আমরা আর শুনিনি। আমরা ঘোর পাপী। এখনও আমাদের সংসারের প্রতি লোভ, পরিবার পরিজনের প্রতি মায়া—ধিক আমাদের।

মামুদের ভারত আক্রমণ সতেরো বার পূর্ণ হ'ল। ইতিমধ্যে তিনি বহু হত্যা, লুণ্ঠন এবং ধ্বংস শেষ করে পঞ্জাব অধিকার করে নিয়েছেন। এইবার তিনি গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করলেন।

ত্যাগীর অমৃতময়ী বাণীর বিরাম নেই।

তিনি যুগের পর যুগ বলে চলেছেন, হে মূঢ়মতি, নিচের দিকে তাকিও না, দৃষ্টি সর্বদা রাখ উপরে—সেই ব্রহ্মপদের দিকে, কারণ সেই-খানেই তোমার সকল অশান্তির চির অবসান। তুমি পার্থিব কোনো কিছুর দিকেই দৃষ্টি দিও না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। মোগলেরা এখানে স্থায়ীভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন।

ত্যাগী বলছেন, সবই কর্মফল। তুমি পূর্বজন্মে যা যা করেছ এ ন্মে তারই ফল ভোগ করছ। তুমি যদি আজ খেতে না পাও তো জানবে পূর্বজন্মে তুমি পাপ করেছিলে। তুমি যদি আজ দুঃখ ভোগ কর তো জানবে পূর্বজন্মে তোমার কর্মের দ্বারা তুমি আপন দুঃখের বীজ বপন করেছিলে। অতএব যা হয়েছে তার জন্যে তোমার কর্মই দায়ী। তুমি আজ যা পেয়েছ ঠিক সেইটুকু পাবার মতো কাজই তুমি পূর্বজন্মে করেছ, অতএব এজন্মে তোমার অতিরিক্ত চাওয়া বৃথা হবে। উপরন্তু চাওয়া-রূপ লোভের দ্বারা পরজন্মে আরও বঞ্চিত হবে। এ অবস্থায় কি করবে ?

শ্রোতারা মুগ্ধ বিগলিত হয়ে বলে, আর চাইব না।

কিছুই চাইবে না ?

কিছুই চাইব না।

ওরে মূঢ় !

শ্রোতারা নির্বোধের মতো বক্তার দিকে তাকায়। বক্তা বলেন, ওরে মূঢ়, একটি মাত্র জিনিস যে বিনা বিপত্তিতে চাওয়া যায়; এবং চাইলে সকল চাওয়ার অবসান হয়, তার কথা ভুললে তো চলবে না।

শ্রোতারা আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

বক্তা বলেন, রে পাপিষ্ঠ, মন্দমতি, সেই চাইবার জিনিস হচ্ছে ব্রহ্মপদম্।

ইতিমধ্যে ভারতের ইতিহাসে আরও কত কি ঘটে গেছে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির রাজত্ব চলছে এখন। তারা এদেশের একটি একটি ক'রে অংশ নিজেদের অধীনে আনছে। এদেশের অর্থ লুণ্ঠন ক'রে দেশে নিয়ে যাচ্ছে, এদেশের লোকদের উপর অত্যাচার করছে।

ত্যাগী বলে চলেছেন, ভোগে সুখ নেই, বিলাসে সুখ নেই, তোমার সঙ্গে কিছুই যাবে না, শুধু হরি নাম কর—হরিনাম ছাড়া কিছুই সত্য নয়।

হিন্দু রাজত্ব গেল, মুসলমান রাজত্ব গেল, ইংরেজ ভারতের সর্বেশ্বর প্রভু।

ত্যাগী বললেন, রাজাই হচ্ছে প্রজার দেবতা। প্রজার ঈশ্বর। মানবজাতির দুই ঈশ্বর। এক হচ্ছেন করুণাময় বিধাতা, আর হচ্ছেন রাজা। তাঁকে বল রাজ্যেশ্বর। জগদীশ্বর ও রাজ্যেশ্বর দুইই পূজ্য। মুসলমানেরা ছিল যবন, ইংরেজরা ম্লেচ্ছ। ওদের স্পর্শ এড়িয়ে চল। ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হ'ল, ওদের থেকে দূরে থাক। নিজেকে পবিত্র রাখ, বিশুদ্ধ রাখ, তাতে যদি ধ্বংস অনিবার্য হয়, তা হলে জানবে সেটাই বিধাতার অভিপ্রেত !

কোটি কোটি দুঃস্থ ভারতবাসীর বুকের উপর দিয়ে বিলাসী ইংরেজ ঘুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

ত্যাগী বললেন, দেখেছ ওরা কত বর্বর কত স্থূলধর্মী? ওরা করুণাময় ভগবানের অসীম লীলার কথা কিছুই জানে না। ওরা পার্থিব বস্তু নিয়ে মাতামাতি করে, ছোট ছেলেরা যেমন খেলনা পেলে আর সব ভুলে যায়। ওরা বাইরেই উজ্জ্বল. অন্তরে ওরা বর্বর। ওরা মাত্র সেদিন সভ্য নামে পরিচিত হয়েছে—অথচ সভ্যতা কাকে বলে তাই জানে না। ভারতবর্ষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ বলে সম্মানিত, তখন কোথায় ছিল ওরা? ওরা তখন ছিল বনে জঙ্গলে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায়; খেত কাঁচা মাংস আর করে বেড়াত দস্যু-বৃত্তি। আমরা ওদের গুরু, আমরা ওদের অধ্যাত্ম ধর্মে দীক্ষা দেব।

ইংরেজরা এয়ারোপ্লেন নিয়ে এলো এদেশে।

ত্যাগী বললেন, ঐ বিমান দেখে বিস্মিত হয়ো না, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিমান ছিল ভারতবর্ষে, ওদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি উন্নত ছিল আমাদের দেশের যুদ্ধাস্ত্রগুলি। কিন্তু মনে রেখো সংসার অনিত্য।

ভারতবর্ষ ইংরেজের চাতুর্যে চির অশান্তির উৎস হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘটতে লাগল, ক্রমে হিন্দু মুসলমানে কলহ্ বাড়তে লাগল। ভারতবাসী পার্থিব বস্তুতে লোভ করবে না ব'লে ছোট খাটো চাকরি নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি করতে লাগল। কিন্তু চাকরি যত ছোটই হোক. লোভ তো বটে। ত্যাগী বললেন, ওটাকে লোভ বলা ভুল। এই উপলক্ষে সামান্য পরিমাণে রাজসেবা করা যাচ্ছে সেটাকে সৌভাগ্য বলেই গণ্য কর। কিন্তু এর বাইরে যদি আরো কিছু চাও তা হ'লে তাকে বলা যাবে লোভ। জীবন ধারণের পক্ষে ন্যূনতম যেটুকু দরকার, এই পাপজীবনটা কোনো

রকমে কাটিয়ে দেবার জন্যে যেটুকু দরকার, মাত্র সেই টুকুতেই খুশি থাকবে। কদাচ বেশি চেয়ো না।

তারপর এলো দুর্ভিক্ষ। এদেশের মানুষ পশুর মতো মরতে লাগল। না খেয়ে পথে পথে মরতে লাগল। কথা না বলে নীরবে মরতে লাগল। স্বামী স্ত্রী সন্তান একই সঙ্গে অসহায় ভাবে মরতে লাগল। ত্যাগের মহিমায় লোকের মনে সন্দেহ জাগল।

ত্যাগী এবারে পথশায়ীদের সম্মুখে গিয়ে বলতে লাগলেন, লোভ ক'রো না। করুণাময় জগদীশ্বর যা ব্যবস্থা করেছেন তাই ঘটছে। শোন মূঢ় দেশবাসী, আজ তোমাদের কঠিন পরীক্ষার দিন। আজ এই যে তোমরা বিরাট দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছ, এবং তার ফলে ইহলীলা শেষ করছ, এর মধ্যে আমি করুণাময় বিধাতার একটি মহান ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শোন মূঢ়গণ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের যে একটি অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে সেই কথাটি তোমরা কোনো অবস্থাতেই ভুলে যেয়ো না। আমাদের দেশের আদর্শ হচ্ছে আত্মবঞ্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন, বৈরাগ্য এবং ত্যাগ। বিধাতা আমাদের সহায়। আমরা নিজেরা যতই চেষ্টা করি আমাদের লক্ষ্যপথে যেতে, ততই আমাদের সম্মুখে আসে নানা প্রলোভন; তারা আমাদের পথ ভুলিয়ে দেয়। তবু আমরা অন্যান্য দেশকে লজ্জিত ক'রে আমাদের আদর্শ-পথে অনেক খানি সাফল্যলাভ করেছি। কিন্তু তবু, আমরা ক্ষীণ দুর্বল অসহায় মানুষ, আমরা ইচ্ছে করলেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারি না। আজ যে আমরা প্রবলের হাতে লাঞ্ছিত, প্রতি পদে অপমানিত, কোথাও আমাদের সম্মান নেই, জাতি হিসাবে আমরা ঘৃণ্য, এ সমস্তই আমাদের নিজগুণে। এ সমস্তই হিন্দু-জাতির ত্যাগাদর্শের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তবু আমরা আদর্শ থেকে কত দূরে সরে আছি। মন আমাদের যে লক্ষ্যে পৌছতে চায়, আমাদের স্থূলদেহ

তাতে বার বার বাধা দিয়ে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। এইখানে দরকার হয় আমাদের দৈবশক্তি। তোমরা আজ তোমাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছে—তোমাদের এই ভঙ্গুর নশ্বর দেহ। বিধাতাই দয়া ক'রে তোমাদের এই অবস্থায় এনেছেন। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে এর যে কত দরকার ছিল তা উপলব্ধি করতেই হবে। আমাদের সবাইকে এই ভাবে মরতে হবে আজ। আমি বুঝতে পারছি দেহমন সাময়িকভাবে বিদ্রোহ করতে চাইছে, সেজন্যে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের দৈহিক এবং মানসিক বিদ্রোহ দমন কর। আমার বিশ্বাস তা তোমরা পারবে। আজ তোমাদের ভেবে দেখতে হবে তোমরা কি চাও। তোমরা যে পথে চলেছে, সে পথে চলতে হ'লে এখন কিছুকাল একটু চুপ ক'রে থাকতে হবে।—শুধু চোখ কান বুঁজে পড়ে থাক—তাহ'লেই তোমরা বিধাতার মহান উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে তোমাদের জীবনে।—বল তোমরা কি চাও? খুব চিন্তা করে বল, এমন শুভ মুহূর্তে তোমরা কি চাও?—আমি জানি তোমরা কি চাইবে। আমি জামি তোমরা চাইবে—ব্রহ্মপদ। তোমরা অমৃতের সন্তান—তোমরা অমৃতই চাইবে। তাই নয় কি?

পথশায়ী লক্ষ লক্ষ শ্রোতা অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে এক সঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা একটুখানি ফেন চাই।'

ত্যাগী হতাশ হ'য়ে স্থান ত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রকাশ্য দিবালোকে ঘোষণা করল তারা স্থূল জিনিসের সাহায্যে প্রাণই বাঁচাতে চায়। তারা আত্মরক্ষা করতে চায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ভারতীয় চিরন্তন ত্যাগী হিন্দু, হিন্দু জাতির ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করল।

(প্রত্যহ, ১৯৪৫)

—এক—

বাংলা দেশে এই রকম একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠারই প্রয়োজন ছিল।

কলকাতা শহরে যে বিরাট প্রাসাদটি যাদুঘর নামে পরিচিত তার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের যোগ অতি সামান্য এবং যেটুকু যোগ তা সীমাবদ্ধ, কিন্তু নবগঠিত যাদুঘরটি আজ শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতের সমস্ত প্রদেশের, এবং শুধু বাঙালী বৈজ্ঞানিক নয়, ভারতের সমস্ত বৈজ্ঞানিক, এবং শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং পুরাতত্ত্ববিদ সকলের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগ রক্ষা করে চলতে পারবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

যাদুঘরের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে বঙ্গ গৌরব যাদুঘর।

আপাততঃ বাংলাদেশের সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ছেলেদের অভিভাবক ছেলেদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে এই যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় অপরিসীম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গঙ্গার ধারে নিমতলা ঘাটের পাশে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলো ঘর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ায় তাতে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আপাততঃ ছত্রিশজন বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং পুরাতাত্ত্বিক

সেখানে এসে গেছেন। কতকগুলো ঘরে কাচের আলমারি, র‍্যাক, শেলফ, স্ট্যাণ্ড প্রভৃতি সাজনো হয়েছে।

যাদুঘরে রাখবার মতো জিনিষ এখনও সংগ্রহ করা হয় নি। সমস্তই এখন নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিকদের কতকগুলো জিনিষের পুনর্গঠন সাফল্যের উপর।

প্যালিওজোইক সময়ের প্রথম দিকে যে সব মাছের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তার নক্সা সংগ্রহ করা হয়েছে একটা ঘরে। তার সঙ্গে মেসোজোইক সময়ের কয়েকটি মাছের কঙ্কালও আছে। তা থেকে চারজন শিল্পী কয়েকটি বিশেষ মাছের চেহারা কি হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশে তার নক্সা তৈরি করছেন কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনের মতো জিনিসটি হচ্ছে না।

অন্য একটি ঘরে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বিশেষ একটি তেল তৈরির চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতীই যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন, সুতরাং সাফল্যে বিলম্ব ঘটায় তাঁরা প্রায় ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ছেন এবং চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছেন।

একজন লিখছেন, দেশের ছেলেরা এতদিন কোনো কিছু না দেখে কোনো কিছু না বুঝে বই মুখস্থ করেই তো পাস করে আসছিল কিন্তু আপনারা তাদের মনে চোখে-দেখে শেখার যে আশা জাগিয়ে তুলেছেন, তাতে আপাদের কি উচিত নয় যে যাতে যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় আর বিলম্ব না ঘটে তাই দেখা ?

একজন অভিভাবক লিখেছেন, ছেলেরা যেসব পদার্থের কথা সাধারণতঃ শোনে না অথবা যেসব পদার্থ বা প্রাণী-জগতের কথা তারা বইতে সাধারণতঃ পড়ে না, সে সম্বন্ধে তাদের উগ্র কৌতূহল না থাকা অন্যায় নয়, কিন্তু যে সব প্রাণী বা পদার্থের কথা তারা গৃহে এবং গৃহের

বাইরে সর্বদা শুনছে, সে সম্বন্ধে তাদের কি পরিমাণ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। তাতে এদের যে ক্ষতি হচ্ছে তাও অপূরণীয়।

যাদুঘর পরিচালকগণের অবশ্য এই বিলম্বের জন্যে কোনো অপরাধ ছিল না। কঙ্কাল থেকে কোনো প্রাণীর পূর্ণাবয়ব পূর্বচেহারা, কল্পনার সাহায্যে পুনর্গঠিত করার শিক্ষা শিল্পীদের ছিল না। তা ছাড়া যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ যে সব শিল্পী নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এ কাজের ঠিক উপযুক্ত নন। কাজেই বৈজ্ঞানিকদের কল্পনাকে তাঁরা রূপায়িত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

শিল্পীদের মধ্যে কেউ ছিলেন কিউবিস্ট, কেউ ছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট, কেউ ছিলেন প্রাচীন ভারতীয়, কেউ ছিলেন পিকাসোর স্বপ্নপন্থার অনুগামী।

এঁদের বিভিন্ন হাতে একই কঙ্কালের উপর যে সব বিচিত্র কল্পিত রূপ গড়ে উঠছিল, তা বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের হাতেই আদর্শ রূপ একমাত্রা থেকে শুরু ক'রে বিশ পঁচিশ মাত্রা তফাৎ হয়ে যাচ্ছিল।

এঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় ক্ষেপে গেলেন।

একই কঙ্কালের ভিত্তিতে চার জনের হাতে একই প্রাণীর রূপ চার রকম হবে এ কেমন কথা?

কিউবিস্ট যে মূর্ত্তি আঁকলেন একমাত্র তাইতেই নির্দিষ্ট কঙ্কালটিকে কোনো রকমে খাপ খাওয়ানো যায়।

কঙ্কালটিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দূরে দূরে ছড়িয়ে ফেলে তার উপর রক্ত-মাংসের প্রলেপ লাগালে খাপছাড়া ধরনের যে প্রাণীটির আভাস পাওয়া যায়—তেমনি প্রাণী আঁকলেন ইম্প্রেশনিস্ট।

ভারতীয়পন্থী আঁকলেন লতার মতো একটি জীব, তার মধ্যে কঙ্কালটিকে চূর্ণ না করলে ঢোকানো যায় না।

পিকাসোপন্থী যা আঁকলেন তা' কেউ বুঝতেই পারল না

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের অনেক বোঝালেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই সংক্ষেপে বললেন, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

কিউবিস্ট বললেন, অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপই হচ্ছে দৃশ্যজগতের চরম রূপ; আমার ধর্মও চরম ধর্ম।
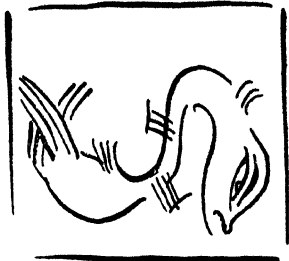
ইমপ্রেশনিস্ট বললেন, বাস্তব বাস্তব বলে যতই চীৎকার করুন, বাস্তব ব'লে কোনো জিনিস নেই। অন্য কথায়, আমরা কোনো জিনিসেরই বাস্তব রূপ দেখি না। স্মৃতির মধ্যে যার ছাপ থাকে এক-মাত্র সেই অবিন্যস্ত রূপই রূপ।

ভারতীয়পন্থী বললেন, ধ্যান-দৃষ্টিতে যে রেখারূপ ধরা পড়ে তা ছাড়া আর্টে আর সব রূপই মিথ্যা।

পিকাসোপন্থী বললেন, আমি আগে থাকতে জানি না কি আঁকতে যাচ্ছি। ভিতর থেকে প্রকাশের একটা উগ্র রকমের তাগিদ অনুভব করি, তারই আবেগে আমার হাত চলতে থাকে, যেন আমি সে সময়ে একটা অনির্দিষ্ট অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তার ফলে যা সৃষ্টি হয় তা কেউ ভাল বলে, কেউ বলে না, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না।
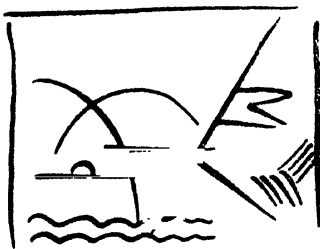
কর্তৃপক্ষ তখন বললেন তা হ'লে আপনারা আসুন। আমরা আর্ট চাই না, চাই ডিজাইন এবং যেভাবে চাই তাই আঁকতে হবে।

শিল্পীরা বললেন, আমরা আনন্দের সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি। সামান্য টাকার জন্যে ধর্মভ্রষ্ট হ'তে পারি না।

শিল্পীরা বিদায় নিলেন।

আর একটা ঘরে কৃত্রিম উপায়ে তেল তৈরির পরীক্ষা চলছিল। অনেক বিবরণ সংগ্রহ ক'রে, প্রাচীন ও আধুনিক বহু সাহিত্য থেকে রূপ-গুণ-গন্ধের পরিচয় সংগ্রহ ক'রে এতদিনে এখানে এমন একটা জিনিষ তৈরি হয়েছে যা বৈজ্ঞানিকদের মতে এখনি যাদুঘরে রাখা চলতে পারে।

অন্য একটি ঘরে ডিম্ব-বিশারদেরা দু'টি বিশিষ্ট ডিমের তৈরিতেও কৃতকার্য হ'য়েছেন। তাঁরা বলছেন, এত সহজে যে ডিম পুনর্গঠনে কৃতকার্য হ'য়েছেন, তা কেবল তাঁদের মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যেই। পূর্ববর্ণিত শিল্পীরা ডিমের নক্সা আঁকাতেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জিদ না ছাড়ায় একটু যা দেরি হয়েছে। ডিম্ব-বিশারদেরা শিল্পীদের যথা-সময়ে ত্যাগ ক'রে নিজেরাই নক্সা তৈরি করে নিয়েছিলেন।

আর একটি ঘরে পরীক্ষা চলছিল একটি শ্বেত তরল পদার্থ তৈরির। অনেক পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকেরা এ কাজেও অনেকখানি সফল হয়েছেন।

—দুই—

যাদুঘরের উদ্বোধন এইবার হ'তে পারে, পরিচালকেরা এ বিষয়ে একমত হ'লেন। তাঁরা প্রকাশ করলেন, আপাতত যে সব নমুনা তৈরি হয়েছে তাঁরা তাই এখন যথেষ্ট মনে করেন, তারপর প্রতি বৎসর যথা-

প্রয়োজন দু-একটি ক'রে নমুনা বা নিদর্শন যোগ করলেই চলবে। ময় পরিবর্তনশীল। যাদুঘরও এই পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে যোগ রখে চলতে চায়।

উদ্বোধনের দিন বিশেষ ক'রে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরই ডাকা হয়েছে, সঙ্গে অবশ্য শিক্ষকেরাও আছেন। দেশের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকাই য এ যাদুঘরের উদ্দেশ্য এইটে বিজ্ঞাপিত করার জন্যেই এই রকম ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

ছেলেমেয়েরা প্রথমে গেল জীব বিভাগে, সেখানে তারা দেখতে পেল দু'রকম মাছের মডেল রাখা হয়েছে। এই মাছগুলো তারা অনেকে আদৌ দেখেনি, কেউ কেউ শিশুকালে দেখে থাকবে, এখন মনে নেই।

বক্তা বললেন, একটি রুই মাছ, একটি ইলিশ মাছ। তোমরা অবশ্য আমাদের সমসাময়িক অনেক মাছই দেখনি, তবু বাংলা দেশের বহু মাছের মধ্যে এই দু'টি সর্বজনপ্রিয় মাছই মনোনীত ক'রে তাদের কঙ্কাল থেকে এই কল্পিত চেহারা গড়ে তোলা হ'য়েছে। কঙ্কালগুলিও অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করা গেছে। মাছ দুটি আমাদের সময়ে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং সর্বত্রই প্রচুর মিলত। কিন্তু তোমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বশতঃ বাংলা দেশে এ সব মাছ আর নেই। দুর্ভাগ্য তোমাদের চেয়ে আমাদেরই অবশ্য বেশি ; কারণ, একবার আমরা এর স্বাদ পেয়েছি।

একটি ছোট মেয়ে বায়না ধরল সে ইলিশ মাছ খাবে।

তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল ওটা সত্যিকারের মাছ নয়।

ছেলেমেয়েরা বিস্মিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে মাছ দু'টির নমুনা দেখল এবং নানারকম প্রশ্ন করে জানতে পারল ইলিশ মাছ গঙ্গা এবং পদ্মা-নদীতে এবং রুই মাছ নদী ভিন্ন অন্য জলাশয়েও মিলত এবং খাওয়া হ'ত কেটে রান্না ক'রে।

ডিমের ঘরের বক্তা বললেন এই দুটি পাখীর ডিমই এক সময়ে আমাদের খাদ্য তালিকার একটি লোভনীয় অঙ্গ ছিল, কিন্তু এই সুলভ বস্তু দুটি খাওয়া দূরে থাক, তোমরা চোখেও দেখনি। এর একটি হাঁসের ডিম, অন্যটি মুরগীর।

পাখীর ডিম যে মানুষে খেত তা ওরা এই প্রথম শুনল।

এবারে ওরা তেলের ঘরে গেল।

বক্তা বললেন, এরই নাম হচ্ছে সরষের তেল। তোমরা এ জিনিষ কখনো চোখে দেখনি। অবশ্য এখন যা দেখছ তা আসল তেল নয়, তার নকল মাত্র। তবে এর রং এবং গন্ধ ঠিক আসল সরষের তেলের মতোই করা হ'য়েছে।

ওরা গন্ধ শুঁকে দেখল, এবং কারো কারো কাছে তা ভালই লাগল।

বক্তা বললেন, সরষের তেল বাংলা দেশে আর নেই।

খেতে কেমন ছিল জিজ্ঞাসা ক'রে ওরা জানতে পাগল, এ জিনিষ শুধু ভাজার কাজে ব্যবহৃত হ'ত, ভাতে সেদ্ধর সঙ্গে কাঁচা তেল মেখেও খাওয়া চলতা। সরষের তেল শস্তা এবং সুস্বাদু ব'লে বাঙালীর কাছে বড়ই প্রিয় ছিল। আগের লোকেরা এ তেল গায়েও মাখত।

তারপর গেল ওরা দুধের ঘরে। দুধের নাম খুব শুনলেও গো-দুগ্ধ ওরা কখনও দেখেনি। দেখে অবাক হল। আশ্চর্য! গোরু নামক একটা পশু থেকে এই দুধ পাওয়া যায় তাই আবার শিশুদের প্রধান খাদ্য!

এ সব কথা ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং বিস্মিতও হ'ল, কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে মনে হ'ল না যে, ওরা সব কথা বিশ্বাস করেছে।

বক্তা বললেন, আজকের মত তোমাদের দেখার কাজ শেষ হ'ল, আশা করি যা দেখলে এবং শুনলে তা ভুলবে না।

ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল, অন্য ঘরগুলোয় কি আছে ?

বক্তা বললেন, ওসব ঘরে এখনও কিছু সংগ্রহ করা হয়নি, আশা করছি অল্পদিনের মধ্যেই কতকগুলো শাকসব্জী ও আনাজের নমুনা রাখতে পারব। তারপর আরও ঘরের সংখ্যা বাড়বে এবং সম্ভবত এই বছরের মধ্যেই ধুতি-শাড়ীর নমুনাও রাখতে পারব। ঘর আরও বাড়বে বলে আমরা খুবই আশান্বিত। আমাদের এ যাদুঘর আকারে দেখো অনেক বেড়ে যাবে।

ছেলেরা এসব শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। তারা একটি ঘরের দরজার উপরে "বাঙালী" কথাটা খোদাই করা হচ্ছে দেখে প্রশ্ন করল, ' কথার মানে কি ?

বক্তা বললেন, তা জান না ? ঐ ঘরেই তো বাঙালী জাতি দেখতে কেমন তার নমুনা থাকবে, আর সে জন্যে এখন থেকেই মাড়োয়ারী বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলছে।

(কৃষক, ১৯৪৫)

রামচরণ, হরিধন, শ্যামাকান্ত, রহিমউদ্দীন, ফয়জল, রেবতী, নিকুঞ্জবিহারী, কেতাবুদ্দীন, ইসমাইল, নাসিরউদ্দীন, রামজীবন, কালীচরণ, তারিণী, কেশব, আবুল, তমিজ এবং জীবন—এই সতেরো জন লোক এক জায়গায় ব'সে তাদের অতীত জীবনের সব কথা আলোচনা করছিল।

বেশি দিনের কথা নয়—১৬ আগষ্ট—১৯৪৬ সাল। তারিখটি এমনই ভয়ঙ্কর যে ঐ তারিখে সতেরো জন হিন্দুমুসলমান এক সঙ্গে আলাপ করছিল, এই কথাটাই পাঠক প্রথমে অবিশ্বাস করে বসবে। কিন্তু অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ জগতে সব জিনিসই সম্ভব হ'তে পারে।

পাঠক বলবেন, বুঝেছি, তোমার ঐ বৈঠক নিশ্চয় কলকাতা শহরে নয়—কলকাতার বাইরে; হয়তো বাংলা দেশের বাইরে, কিংবা হয়তো ভারতবর্ষের বাইরে,—বিলেতে না হয় রুশিয়ায়।

কিন্তু আমি বলি, অতটা দূরে যাবার দরকার কি? কলকাতা শহরেরই একটা বাড়িতে ব'সে ওরা আলাপ জমিয়েছে। ওরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, দূরে যাবার সামর্থ্যও নেই, শিক্ষাও নেই।

এদের পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। রামচরণ হচ্ছে মৎস্যজীবী, জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরে। হরিধন বুড়ো মানুষ, ছোট্ট একখানা মশলার দোকানের মালিক। শ্যামাকান্ত বাজারে পান বিক্রি করে। ফয়জল দপ্তরীর কাজ করে। রেবতী ফেরিওয়ালা। নিকুঞ্জ বাড়ির চাকর। কেতাবুদ্দীন, ইসমাইল, নাসিরউদ্দীন একসঙ্গে ব'সে বিড়ি তৈরি করে। রামজীবন, কালীচরণ, তারিণী গ্রাম থেকে তরিতরকারী নিয়ে এসে কলকাতায় বিক্রি করে। কেশব দুধওয়ালা। আবুল, তমিজ, প্রেসে চাকরি করে। জীবন দোকানে খাতা লেখে।

কোনোদিন এরা পরস্পরের এত কাছে আসেনি—একজন আর কজনের কাজের কি সুবিধা অসুবিধা তাও জানতে পারেনি। তাই আজ এরা পরস্পরের অপরিচিত হয়েও পরস্পর আলাপ আলোচনায় বেশ একটা আত্মীয়তা অনুভব করছে।

প্রত্যেকেই তার নিজের কাজের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করে, যে গৌরব অনুভব করে, তা খুব গর্বের সঙ্গেই বলছে।

রামচরণের বয়স হয়েছে পঞ্চাশ। বাল্যকাল থেকে সে নদী থেকে মাছ ধ'রে আসছে তার বাপ কাকার সঙ্গে। গ্রীষ্মকালের গরমে নাদিন অস্থির হয়ে ওঠেনি, মাঘের শীতের রাত্রে জলে ডুবে ডুবে মাছ ধরতে কখনো কাঁপেনি। শুধু তাই নয়, অসুখ কাকে বলে তাও সে কখনো জানেনি।

হরিধন তার মশলার দোকানের গৌরব প্রচার করল ঘণ্টাখানেক ধ'রে। কত রকম রংবেরঙের সব জিনিস। প্রত্যেকটি সে অতি যত্ন ক'রে সাজিয়ে রাখে। দিনে কত বিক্রি হ'ল তা হিসেব না ক'রেই বুঝতে পারে কত লাভ হ'ল সেদিন। তারপর রাত্রে বসে হিসেব নিয়ে। তন্ন তন্ন ক'রে হিসেব মেলাতে কি যে আনন্দ। তখন র কিছু তার মনে থাকে না। সে তখন দুনিয়াকে ভুলে যায়।

শ্যামাকান্তও কম যায় না। দেশে তাদের পানের বরোজ আছে। এক একটা পান নয় তো যেন এক একটা রাজরানি। সূর্যির আলো লাগলে মূর্ছো যান। চার দিকে বেড়া দিয়ে ঘিরেই কি রক্ষা আছে? মাথার উপরেও ঢেকে দিতে হবে—নইলে পাটের-রানিরা শুকিয়ে উঠবেন রোদ লেগে। তার উপর আবার ঠাকরুণদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই—কাঠির সঙ্গে বেঁধে বেঁধে দাঁড় করাতে হবে। পানের বরোজ নয় তো রানিদের অন্দর মহল। সেবা করতে করতেই দিন যায়।

ফয়জল বলল, ওসব বুঝি না, আমার বই বাঁধাইয়ের কাজে আমি যে আনন্দ পাই দুনিয়ার আর কোনো কাজে তত আনন্দ আছে কি না জানি না। বই-কেতাব দুনিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তারই ছাপা ফর্মাগুলো নিয়ে যখন আমি গেঁথে তুলি একটার পর একটা, আর তারপর মলাট লাগিয়ে তার একটা চেহারা দিয়ে দিই, তখন মনে হয় কি জান? মনে হয় ওদের ঐ কেতাবী চেহারা দেওয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছি আমি।

এইভাবে ওরা একের পর এক নিজ নিজ কাজের গুণগান করতে লাগল।

বংশ বংশ ধ'রে একই কাজ ক'রে ওরা প্রত্যেক সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে এক একটি শিল্পীর জাত। শিল্পীর যে আনন্দ ওরা সে আনন্দ নিজ নিজ কাজের মধ্যে পায় পূরো মাত্রাতেই।

বুড়ো হরিধন বলল, আমরা যদি আজ সংসার থেকে স'রে যাই তাহ'লে সংসার কি অচল হয়ে পড়বে না?

ইসমাইল ব'লে উঠল, আলবৎ পড়বে।

তমিজ বলল, আমি প্রেসম্যান। প্রেসের কাজ করি। কর্ত

বড় দায়িত্ব আমার। প্রেসের হাজার হাজার টাকার কাজ হয় আমারই হাতে। প্রেস না চললে দুনিয়া অচল হয়ে পড়বে।

ফয়জল বলল, তবে এক কথা। আমরা বই ছাপি বা বই বাঁধি, আমরা জানি না সে সব বইতে কি আছে।

ইসমাইল বলল, জানবার দরকার কি? যাদের জানবার তারা জানুকগে সে সব। আমরা বুঝি আমাদের কাজ—দুনিয়ার আর খবর রাখি না। দরকারও মনে করি না।

প্রত্যেকেই স্বীকার করল তারা দুনিয়ার কিছু জানে না, জানতে চায়ও না। জানতে গেলে নিজেদের কাজের ক্ষেতি।

তমিজ বলিল, একদিন মাত্র কানে এসেছিল আমারই হাত দিয়ে যে হাজার খানেক বই ছাপা হ'ল তাতে নাকি মুসলমানদের গাল দেওয়া আছে। মনটা খারাপ হয়েছিল শুনে, কিন্তু তখনই ভাবলাম, ও সব দিয়ে আমাদের দরকার কি—বাবুদের হাতে কলম আছে, যা খুশি লিখবে, টাকা আছে বই ছাপাবে—আমার তা নিয়ে মাথাব্যথার দরকার কি?

ফয়জল বলল, তা যদি বললে তা হ'লে আমার হাতেও এমন ব কেতাব বাঁধাই হয়েছে যাতে নাকি লেখা আছে হিন্দুদের কাজ করা মুসলমানের গোনা। এতকাল সবার কাজ ক'রে এলাম, কৈ এমন কথা তো কেউ এর আগে বলেনি।

ইসমাইল বলল, আমি হিঁদুদের পাড়ায় ব'সে বিড়ি তৈরি করি —আজ বিশ বরিষ হয়ে গেল, তারা আমার এত কালের খদ্দের—তাদের তো গোনা হয় না আমার বিড়ি খেয়ে। জাত ভাইরাও তো কেউ বলে না যে হিঁদুদের কাছে বিড়ি বেচা মানে হিঁদুদের কাজ করা।

রামচরণ বলল, আর আমি যে ছোট বেলা থেকে হিন্দু মুসলমান

সবার বাড়ি মাছ বেচে আসছি? আজ কম ক'রেও চল্লিশ বছর এই কাজ করছি।

রামজীবন, কালীচরণও সে কথার প্রতিধ্বনি করল।

এইভাবে আলাপ ক'রে ওরা বেশ খুশি হয়ে উঠল। বাইরে তখন হিন্দুমুসলমানের তাণ্ডবলীলা চলছে। আগুন জ্বলছে চারদিকে। রক্তমাখা হিংস্র ছোরা আর লাঠির পাল্লা চলছে। আল্লা হো আকবর আর বন্দেমাতরম্-জয়হিন্দের ধ্বনি আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছে, কিন্তু এই সতেরো জন দরিদ্র দিনমজুর হিন্দু মুসলমানের তাতে কিছুই এসে যায় না।

ওরা যে বাড়িতে ব'সে আলাপ করছিল, কয়েক ঘণ্টা আগে সেখানে এক মহা হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। চার পাঁচটি মৃতদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে ও ঘরের বাইরে। সে মৃত্যু-দৃশ্য অতি বীভৎস। তাদের বাইরে নিয়ে সৎকার করবার লোক নেই। প্রকাণ্ড বাড়িখানার সমস্তগুলি প্রকোষ্ঠ অতি ভয়ঙ্করভাবে নির্জন।

এমন সময়, ধীরে ধীরে, দিনের শেষে যেমন সন্ধ্যা তার অন্ধকার ডানা মেলে পৃথিবীতে নেমে আসে, তেমনি ধীরে ধীরে একটা প্রকাণ্ড ছায়া-মূর্তির আবির্ভাব হ'ল সেই আলাপ-রত লোকগুলোর ঘরের সম্মুখে।

সে এসে গম্ভীর কণ্ঠে ওদের বলল, তোমরা বেরিয়ে যাও তোমাদের যথানির্দিষ্ট স্থানে।

সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল, আমরা কোথায় যাব?

আগের মতোই গম্ভীর স্বরে উত্তর এলো, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আপনা থেকেই তা টের পাবে।

কিন্তু কেন আমরা যাব? আমরা এখানে কারো তো কোনো অনিষ্ট রছি না।

তোমরা মৃত। প্রেতাত্মা তোমরা। আমি আদেশ করছি বেরিয়ে যাও।

আমরা মৃত? কি বলছেন আপনি?

তিন ঘণ্টা আগে তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে। তোমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের মেরেছে মুসলমান, আর যারা মুসলমান তাদের মেরেছে হিন্দু।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করল, কেন মেরেছে মনে পড়ছে না তো কিছুই। আপনি বলবেন দয়া ক'রে? আমরা তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি। হিন্দুরা বলল, আমরা কোনো মুসলমানের কোনো অনিষ্ট করিনি, অনিষ্ট চিন্তাও করিনি কোনোদিন। মুসলমানেরা বলল, আমরাও হিন্দুভাইদের কোনো ক্ষতি করিনি—আমরা তো এতকাল একসঙ্গে বাস ক'রে আসছি?

ছায়ামূর্তি বলল, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু তবু তোমাদের মরতে হয়েছে। শুধু তোমরা নও, আরও হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান মরেছে, কিন্তু কেন মরেছে তা তারাও জানে না।

আপনি তো জানেন? বলুন না দয়া ক'রে?—কাতরভাবে সবাই উচ্চারণ করল।

ছায়ামূর্তি বলল, তোমরা রাজনীতি বোঝ?

না, ওসব কিছুই তো কোনোদিন শিখিনি।

ও একটা খেলা। কিন্তু তোমাদের আর দুঃখ কি সেজন্যে? কতকগুলো লোক প্রচুর আমোদ অনুভব করেছে এতে। তোমরা তদিন প্রাণপণে লোকের সেবা করেছ, এবার প্রাণ দিয়ে কয়েকজন

লোকের আনন্দ দিলে।—কিন্তু এসব কথা থাক, তোমাদের যাবার সময় হয়ে এসেছে, বেরিয়ে যাও।

ছায়ামূর্তি কঠোরভাবে তাদের যাবার ইঙ্গিত করল।

ওরা নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

(অরণি, ১৯৪৬)

ছাতা

মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে পথিক যেমন বিভ্রান্ত হয়, আমিও তেমনি আজ ছমাস ধ'রে কলকাতা শহরে ছাতার মরীচিকা দেখে বিভ্রান্ত হয়েছি। ছাতা মেলেনি কোথায়ও। এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম ছাতার নিয়ন্ত্রিত মূল্য পাঁচ টাকা এবং বিশেষ স্থানে কার্ড সংগ্রহ করলে নির্দিষ্ট দোকানগুলোতে পাওয়া যায়।

কিন্তু বিজ্ঞাপন পড়ে ছাতা সংগ্রহ যত সহজ মনে হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলাম সে আর এক অভিজ্ঞতা। একটি ছাতা কিনতে সাত দিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং সেও আমি একা পারিনি, আমার এক পরম অভিজ্ঞ বন্ধুর সাহায্যে কিনেছিলাম।

ছাতার প্রতি এই অহেতুক আকর্ষণ কেন তার ইতিহাস আছে। সমস্ত পরিবারে আমার একটি মাত্র ছাতা; সেও আবার সাত বছরের পুরনো। বলাবাহুল্য আমি পরিবারের প্রধান ব'লে আমিই একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে সাতটি গ্রীষ্ম এবং বর্ষা কাটিয়ে দিলাম আর কাউকে গ্রাহ্য না ক'রে। কিন্তু দুটি ছেলে কিছুদিন আগে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের জন্যে এবারে যদি অন্তত একটি ছাতা সংগ্রহ করতে না পারি, তাহ'লে

বর্ষায় তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। আমার ছাতাটি তাদের দেবার উপায় নেই, দিলে আমার অফিসে যাওয়া হয় না। তা' ছাড়া ছাতাটি এমন জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, তা খোলার কৌশল আমি ভিন্ন আর কারো পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। তার একটি শিকের শিকড় নেই, অর্থাৎ তার ছিদ্র-পথসুদ্ধ মাথাটি মরচে ধ'রে খসে গেছে। এমনি অবস্থায় হঠাৎ খুলতে গেলে সেই শিখ কাপড় ফুটো করে বেরিয়ে পড়ে। খুব সাবধানে খুলতে হয়। আস্তে আস্তে সমস্ত ছাতাটি হাতল ধ'রে ঘোরাতে হয়, সেই ঘোরানোতে যে সেনট্রিফ্যুগ্যাল শক্তি জাগে তাতে বাঁটের দিক থেকে সমস্ত শিকগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর ঠিক সেই সময় ধীরে ধীরে ছাতাটি খুলতে হয়। প্রক্রিয়াটি এমনই শিক্ষাসাপেক্ষ, এবং এর প্রত্যেকটি ধাপ এমনই সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের পরিচায়ক, যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার ছাতা খোলা আমি তুলনা করি আমার হৃদয়ের সঙ্গে। তবে হৃদয়ের অপেক্ষা ছাতার সুবিধা একটু বেশি। হৃদয় সম্পূর্ণ খোলা যায় না, কিন্তু আমার ছাতাটি এখনও সম্পূর্ণ খোলা যায়। আপনারা যে-কেউ আমার কাছে এলে ছাতা খুলে দেখিয়ে দেব কি অপূর্ব কৌশল আছে তার মধ্যে।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ছাতাটি সংগ্রহ করে মন পুলকিত হয়ে উঠল। এতখানি কূলকিনারাহীন নৈরাশ্যের অন্ধকারে হঠাৎ এতখানি আলো ইতিপূর্বে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। খুব গর্বের সঙ্গে পাঁচ টাকার ছাতাটি এনে দিলাম ছেলেদের হাতে। মনে হল এমনি মহার্ঘ্য বস্তু দিলাম যাতে আগামী পুজোয় আর কিছু ওদের না দিলেও চলবে।

এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে সুখে ছিলাম কয়েকটা দিন। ছুটি বালকের মাথা ঐ একটি ছাতা মাতৃস্নেহের মতোই ঘিরে রাখবে মনে করে ওদের মাও খুব খুশি হয়ে উঠলেন।

ক'দিনের মধ্যেই দেখি পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের ভিড় লেগে গেছে আমাদের বাড়িতে। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। আমি আমার বসবার ঘরে অফিসের খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ছুটি উপভোগের জন্যে এক এক সময় মনটা ছটফট করতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ কাজের এমন চাপ পড়েছে যে, আর এক মুহূর্ত অবসর পাবার পায় নেই। এমনি সময়ে ছোট ছেলেদের আনন্দ কোলাহল মনকে তলা করে দিচ্ছে। ওদের আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে আমার মনে। কাজ ভুলিয়ে দিচ্ছে বারবার। মনে হচ্ছে আমিও ছোট হয়ে পড়েছি ওদেরই মতো, বাল্য জীবনের বহু রঙীন স্মৃতি জেগে উঠছে মনে।

ক্রমশঃ পাড়ার মেয়েরাও একে একে এসে জুটতে লাগল আমার মেয়ের কাছে।

একটা ছাতার জন্যেই কি আমাদের বাড়ি ছেলেমেয়েদের কাছে এত প্রিয় হয়ে উঠল? তা হবে। এই অনুমান সত্য প্রমাণিত 'ল যখন আমার প্রতিবেশী বন্ধুরা দু'একজন আমাকে ছাতা সংগ্রহ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে এলেন আমার কাছে।

ছাতার গর্বে আমি ফেঁপে রইলাম।

পরদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। এ সময়ে রোজই প্রায় বৃষ্টি হয়। আমি এগারোটার সময় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি অফিসে যাবার জন্যে এমন সময় দেখি ছেলেরা তখনও স্কুলে যায়নি।

আজ ছুটি নাকি রে? প্রশ্ন করলাম।

জ্যেষ্ঠ সঙ্কুচিতভাবে বলল, না।

তবে স্কুলে যাসনি কেন?

এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না ওদের কাছ থেকে। আমি একটু বিরক্ত ভাবে বললাম, অকারণ স্কুল কামাই করা আমি পছন্দ করি না। এখুনি যা স্কুলে।

কনিষ্ঠ উঠে এসে মাথা নিচু ক'রে কম্পিত কণ্ঠে বলল, বাবা ছাতা নেই।

ছাতা নেই? হঠাৎ যেন মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। মনে হ'ল ঘাড়ের উপর আমার মাথাটিও নেই। বলে কি? এমন দুর্লভ জিনিষ নেই? ছাতা নেই কি রে? এ রকম হ'লে কি করে চলবে? একটি ছাতায় আমার সাত বছর চলছে, আর নতুন ছাতা তোদের হাতে সাত দিনের মধ্যে নেই? কোথায় হারিয়েছিস বল?

চীৎকার শুনে স্ত্রী ছুটে এলেন। আমাকে উত্তেজিত হ'তে নিষেধ ক'রে দরজার কোণ থেকে ছাতাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, ধর, আমি আসছি এখনি।

এ কি রসিকতা!

আমি স্তম্ভিতভাবে ছাতা ধরে রইলাম। ছাতা ঠিকই আছে কেবল তার আচ্ছাদনের কাপড়খানা নেই।

সবটাই একটা হীন ষড়যন্ত্র মনে ক'রে মনটা বিষিয়ে উঠল।

স্ত্রী ফিরে এলেন রান্নাঘর থেকে। এসে বললেন ছাতা গেছে ওর জন্যে ভেবো না কিছু, কিন্তু একেবারে লোকসান হয় নি। একদিন ভেজার পরেই ঐ ছাতার জল থেকে দশ বোতল ব্লু ব্ল্যাক কালী তৈরি হয়েছে। পাড়ায় ছেলেদের ত্রিশ চল্লিশ দোয়াত বিলি করেও আমাদের এখনও সাত বোতল কালী বেঁচেছে।
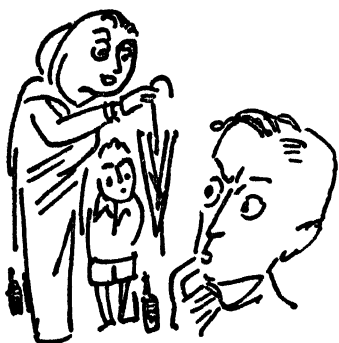
এ কথায় রহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল। আমি চিন্তামূঢ় অবস্থায় ীর দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, তোমার ঐ ছাতা বৃষ্টি ঠেকানোর ছাতা নয়, রোদের ছাতা। বর্ষায় বের করাই ভুল হয়েছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু ছাতার কাপড়খানা গেল কোথায়?

স্ত্রী বললেন, ওর সব কালী বেরিয়ে যাবার পর জালের মতো সাদা কাপড় বাকী রইল। তা দেখে মেয়ে বায়না ধরল, সে ঐ কাপড় দিয়ে পুতুলের জামা তৈরি করবে। তা আমি আর নিষেধ রব কেন? ওতে আর কি হত? জাননা তো ওর বন্ধুদের কত তুল এ বাড়ি থেকে জামা পরে গেছে। কি খুশি তারা।

আমিও ধীরে ধীরে খুশি হয়ে উঠলাম। সাত বোতল কালী, দাম সাড়ে তিন টাকা। আরো দেড়টাকা চাই। তা এর শিকগুলো আর ছড়িটি বিক্রি করলে উঠবে নিশ্চয়।

শান্ত মনেই অফিসে রওনা হলাম।

(স্বরাজ ১৯৪৫)

সমস্ত সন্ধ্যাটা কলকাতার ময়দান বিপুল এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। দু-তিন লাখ লোকের চীৎকার, হাতাহাতি, ছোরা মারা, ঘোড়া-পুলিসের আক্রমণ, অশ্রুবোমা ফাটা এবং শেষ পর্যন্ত মিলিটারির আবির্ভাবে যুদ্ধবিরতি।

বাক্যযুদ্ধের জের তখনও চলছে।

ইস্টবেঙ্গলের সমর্থনকারীরা বলছে, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। যদি দলে লোক ঘাটতি পড়ে তা হলে পূর্ববঙ্গের বাকী হিন্দুরাও আশ্রয় প্রার্থী হবে এসে এই শহরে।

পশ্চিমবঙ্গীরা বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। সংখ্যাধিক্যের দরকার হলে আমরা বিহারের বাংলাভাষী অংশ যেমন করে হোক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করব।

পুলিস বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। দরকার হলে মিলি-টারির সাহায্য নেব।

ময়দানের খেলোয়াড়রা বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। দরকার হলে আমরা খেলা বন্ধ করব।

কলকাতা শহরের চল্লিশ লাখ অধিবাসী সমস্বরে বলল, সে অন্যায় আবার আমরা সহ্য করব না—খেলা বন্ধ হলে আমাদের জাতীয় অধঃ-পতনের আর বাকী থাকবে কি?

দার্শনিক বলল তোমরা খেলার নামে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, দেশের দুর্দশার দিকে ফিরে চাইছ না—জীবনটাকে খেলা মনে করছ, কিন্তু জেনো জীবন খেলা নয়।

শহরবাসীরা বলল, আমরা কখনো মনে করি না যে "জীবন খেলা।" আমরা এর উল্টোটা সত্য বলে জানি—অর্থাৎ আমাদের "খেলাই জীবন।"

পুলিস বলল, খেলায় বাধা নেই, কিন্তু খেলার মাঠে মারামারি হতে দেব না।

দর্শকেরা বলল, ঠেকাবে কি করে? জীবনের সকল দিকেই একটা মাঞ্চের স্বাদ পেয়ে গিয়েছি আমরা, সে স্বাদ থেকে আমাদের আর কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। এ স্বাদ পেয়েছি আমরা চোরাবাজারে, পেয়েছি ঘুস নেওয়ায়, পেয়েছি পরীক্ষার হলে বই থেকে টোকায়, পেয়েছি বিনা টিকিটে ভ্রমণে, পেয়েছি মুনাফা শিকারে। তোমরাও পেয়েছ অশ্রুবোমা নিক্ষেপে, পেয়েছ গুলি ছোঁড়ায়—সুতরাং আমাদের মারামারি করতে দাও, আমরা অবাধে তোমাদের গুলি চালাতে দিচ্ছি।

সরকার পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হল। খেলোয়াড়রা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আমাদের কোনো মত নেই। আমরা কতকগুলো পশু, আমাদের বেঁধে এনে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় লক্ষ লক্ষ লোকের স্ফূর্তির জন্যে। যেমন লোকে ষাঁড়ের লড়াই দেখে, মুরগীর লড়াই দেখে, আমাদের খেলাও লোকে সেইভাবে উপভোগ করে আর আমাদের অবস্থাও ঠিক পশুর মতোই। খেলা শুরু হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিপক্ষীয় দুইদল দর্শক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—আর সেজন্যে আমাদের ক্ষতি হয় দুভাবে। প্রথমত আমাদের মানুষের সম্মান দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়ত খেলার মাঝখানে

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের অন্তরস্থিত খেলোয়াড়ি মনের অপমৃত্যু ঘটে। তাই আমরা দর্শকদের কথা না ভেবে এখন আমাদের কথাই ভাবছি এবং মনে করেছি আমরা খেলা বন্ধ করে দেব।

খেলোয়াড় দল সত্যই বেঁকে দাঁড়াল। তারা আর খেলবে না এই তাদের পণ। তারা নিজেরা মৃত্যুপণ করে লক্ষ লক্ষ লোকের স্ফূর্তি দিয়েছে,-এখন আর তারা তা পারবে না।

এ অতি মারাত্মক কথা! খেলা বন্ধ হলে যে লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে সমস্ত শহরটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে। দেশ অরাজক হয়ে উঠবে। দেশের দুঃখ দুর্দশা ভুলে থাকার যে এটাই একমাত্র পথ। খেলার মাঠ যে আমাদের ইহলৌকিক অস্তিত্বের সকল অভিশাপ হরণ করে নেয়! খেলার মাঠে দর্শকেরা ক্ষেপে যায়, কিন্তু সে ক্ষেপা কীর্তনের আসরের ক্ষেপার মতো—আধ্যাত্মিক ক্ষেপা। এই ক্ষিপ্ততা যদি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় তা হলে তার পরিণাম কি হবে কল্পনাই করা যায় না যে!

পুলিস বলল, (সরকারের নির্দেশে) আমরা তোমাদের রক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করব। তাতে তোমরা নিরাপদে খেলতে পারবে।

দর্শকেরা দিল এ কথার উত্তর। তারা বলল, তোমরা তা পারবে না।

কেন ?

কারণ আমাদের মধ্যে মারামারি নিয়ে যে একতা গড়ে উঠেছে তা ভাঙা তোমাদের সাধ্য নয়। আর মারামারি শুরু হলে তার উত্তাপ খেলোয়াড়দের গায়ে লাগবেই। তবে কামান দেগে কিংবা আকাশ থেকে বোমা ফেলে সব উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু তাতে তো খেলোয়াড় এবং দর্শক দুইই ধ্বংস হবে, তোমাদের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না।

খেলোয়াড়রা বলল, আমরাই খেলা ছাড়ব।

খেলোয়াড়দের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়াপাত হল। সরকারও অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। যারা দিন-রাত অভাবের দায়ে শহরকে নরকতুল্য করছে তাদের নিয়ে এখন কি হবে? সুতরাং এতবড় একটা তীর্থক্ষেত্র হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাবে এ এক মহাদুশ্চিন্তার বিষয়। অথচ খেলোয়াড়দের অভিযোগও অস্বীকার করা যায় না। তারা এতকাল আত্মত্যাগ করে আসছে অপরের স্ফূর্তিবিধানের জন্তে, আজ যদি তারা বলে তারা চিরদিনের অভ্যাস ও ঐতিহ্য বজায় রেখে আত্মহত্যা করতে বরঞ্চ রাজি আছে, কিন্তু অন্যের হাতে মার খেতে রাজি নয়, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যদি তারা বলে এখন তারা একটু আরাম চায়, তা-হলে সে সুযোগ তাদের দিতেই হবে। যদি তারা বলে খেলার মতো কঠিন কাজে তারা এত-দিন অন্তত এই তৃপ্তি পেয়েছে যে, খেলা চলা অবস্থায় কোনো দর্শকের হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করে নি—প্রাণপণে নিজ নিজ কৌশলে খেলে যেতে পেরেছে, তবে তারা সত্য কথাই বলেছে। খেলার শুরুতে মনের মধ্যে যে গতি জেগে ওঠে তা সার্থক হয় খেলা শেষের শেষ বাঁশির সঙ্গে। মাঝখানের বাঁশিতে মাঝে মাঝে খেলার গতি ফেরে কিন্তু তবু সেটা খেলারই অঙ্গ। কিন্তু খেলার মাঝখানে দর্শকের হস্তক্ষেপে মনের উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। এ তারা কিছুতে সহ্য করবে না।

সুতরাং সরকার থেকে এর প্রতিকার হওয়া চাইই। কিন্তু কেমন করে?

পরামর্শ সভা বসেছে সরকারের তরফ থেকে। বে-সরকারী মাথাওয়ালাদের ডাকা হয়েছে সে সভায়। খেলোয়াড়দের কি করে রক্ষা করা যায় এই হল প্রশ্ন। খেলার

সময় যে দাঙ্গা বাধে তা থামানো যাবে না, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। থামানো উচিতও নয়। কারণ দাঙ্গার পক্ষে ওটা একটা নিরাপদ স্থান। সরকার আশা করে এই যে দাঙ্গা নিয়মিত চললে দাঙ্গাক্ষেত্রের চতুর্দিকে খুব উঁচু করে একটি মঞ্চ গড়া চলবে এবং যারা খেলা দেখতে রাজি নয় কিন্তু দাঙ্গা দেখতে রাজি, তাদের কাছে বহু টাকার টিকিট বিক্রি করা যাবে। আর দাঙ্গা ক্ষেত্রের সমস্ত টিকিট বিক্রির টাকা সরকারের হাতে আসাতে স্বাধীন ভারতে এই হবে আমাদের প্রথম ন্যাশন্যলাইজেশন অব স্পোর্টস রাইয়টিং—ক্রীড়া দাঙ্গার জাতীয়করণ।

এরূপ অবস্থায় এখন যদি শুধু খেলোয়াড় এবং রেফারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে দুটো উদ্দেশ্যই একযোগে সিদ্ধ হতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধিমানদের মধ্যে কে এই ভার নিতে পারেন তাঁকে সরকার তরফ থেকে আহ্বান করা হ'ল।

অনেকে অনেক রকম কৌশলের কথা বললেন। তার মধ্যে একজন বললেন খেলার মাঠ কাঁটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা হোক, কিন্তু আলোচনার পর দেখা গেল তা সম্ভব নয়, কারণ ক্ষিপ্ত দর্শকেরা জাল বেয়ে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়বে।

তখন ঠিক হল উপরের দিকেও জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু এখানেও বাধা আছে। কারণ অনেক খেলোয়াড়ের হাই শট আধ মাইল পর্যন্ত উঁচুতে ওঠে। এতটা উঁচু ফ্রেম তৈরি করতে কয়েক বছর লেগে যাবে, খরচও হবে বেশি। তা ছাড়া অত ইস্পাত।

একজন বললেন, পারমিট পেলে—

কিন্তু সবাই একযোগে বলে উঠলেন, এদেশে ওরকম জাল তৈরি হওয়া অসম্ভব এবং বিদেশে অর্ডার দিলে স্টার্লিং ব্যালান্সের যেটুকু

পাওনা তা ওতেই শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র মার্শাল প্ল্যানে যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করানো যায়…।

কিন্তু তা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ষণ্মুখম চেট্টির পরামর্শ চাওয়া হল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এর সম্ভাবনার আভাসও তিনি দিলেন, কিন্তু একজন মন্তব্য করলেন, যে ব্যক্তির ছটি মুখ তাঁর এক মুখের কথার কোনো দাম নেই, এবং কদিন পরে তাঁর পদত্যাগে এ কথার সত্যতা আরও প্রমাণিত হল।

অতএব বিদেশের অপেক্ষায় না থেকে এবং বহু ব্যয়সাপেক্ষ দীর্ঘ-সূত্রিত পরিকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে অবিলম্বে কিছু করার জন্যে সরকার তরফ থেকে চাপ দেওয়া হল, এবং এই চাপে বেরিয়ে এলেন এক বিখ্যাত ওস্তাদ। সমস্ত জটিল ও দুরূহ কাজকে সরল পন্থায় সমাধা করায় ইনি অতি নিপুণ। ইনি তাঁরই শিষ্য যিনি মৃত্যুর পর বাহকদের ঘাড়ে শ্মশানঘাটে যাবার সময় হঠাৎ খাটিয়া থেকে মাথা তুলে বলেছিলেন, খাটিয়াতে একটি চাকা লাগিয়ে নিলে দুজন লোকের পরিশ্রম বাঁচতে পারত।

তিনি এসে বললেন, পথ পেয়েছি। এর জন্যে লাগবে মাত্র হাজার তিনেক টাকা আর দিন পনেরো সময়। ইতিমধ্যে আপনারা দাঙ্গা দেখার জন্যে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাত্র তিন হাজার টাকায় এবং মাত্র পনেরো দিনে এতবড় সঙ্কট পার হওয়া যাবে শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ওস্তাদকে তৎক্ষণাৎ তিন হাজার টাকা দেওয়া হল, তিনি বললেন, পনেরো

দিন পরে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে যে খেলা আছে সেই খেলায় এর পরীক্ষা হবে।

পনেরো দিন পরে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে বিরাট ভিড়। মোহন-বাগান ঈস্টবেঙ্গলের খেলা। কিন্তু খেলা চলেছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সময় মোহনবাগানের পক্ষে ফাউল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্র যথারীতি যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হয়। পুরো একঘণ্টা দাঙ্গার পর যখন দাঙ্গাকারীদের শক্তি অনেকটা কমে এসেছে তখন আবিষ্কার করা গেল উভয়পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড় এবং রেফারী গ্যালারির সঙ্গে নব-নির্মিত একটি ছোট্ট ইস্পাতের জালের খাঁচার মধ্যে নিরাপদে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা উপভোগ করছে। তারা চীৎকার করে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছে—স্ফূর্তিতে তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এতকাল পরে তারা খেলতে গিয়ে দর্শকের স্থান গ্রহণ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ভোগ্য স্বয়ং ভোক্তা হয়েছে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দাঙ্গার উৎসাহ নিবে এসেছে, কিন্তু খেলোয়াড়দের উৎসাহ তখনও নেবেনি। তারা বলছে, এই খাঁচা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। আবিষ্কর্তা নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্য।

কৌশলটি খুব সহজ মনে হলেও মূল পরিকল্পনাটা সহজ নয়। আবিষ্কারের পর সব জিনিসকেই এই রকম সহজ মনে হয়! এই আবিষ্কারের মূল্য এইখানে যে এতে খেলা বন্ধ হবে না, দুচার মিনিট বা আরও বেশি সময় অথবা কখনো পুরো সময় ধরেই খেলা হতে পারবে এবং বাইরে থেকে বাধা না থাকাতে দাঙ্গা বাধবে আরও সহজে। তা ছাড়া সরকারপক্ষে এর থেকে আয়ের অংশটাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয়। লক্ষ লক্ষ লোকের দাঙ্গা নিরাপদে দেখার ব্যবস্থা করে দিলে টিকিট বিক্রির টাকা থেকে বাংলা দেশের চেহারা ফিরিয়ে

দেওয়া যাবে—অবশ্য যদি টাকা ঠিকমতো সরকারের তহবিল পর্যন্ত পৌঁছায়।

এই অতি মূল্যবান আবিষ্কারের জন্যে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং কথা হয়েছিল নোবেল কমিটিতে এঁর নাম প্রস্তাব করে পাঠানো হবে। কিন্তু ওস্তাদ দুটোতেই আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে এজন্যে পুরো কৃতিত্ব দাবী করেন না। কারণ বাংলা ভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক কবিতা "জুতা আবিষ্কার" থেকে তিনি এই পরিকল্পনাটি পেয়েছেন, এবং ঐ বৈজ্ঞানিক কবিতার ক ইতিপূর্বে নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন।

(যুগান্তর ১৯৪৮)

বিষ
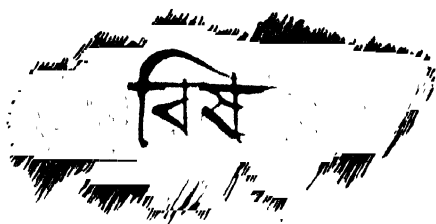
শশধর যখন কলেজ পড়ত তখন মাঝে মাঝে সিনেমা দেখত, কারণ তখন মাসিক খরচ আসত মানি অর্ডার যোগে। আজ সে সিনেমা দেখে না, কারণ মাসিক খরচ এখন নিজে উপার্জন করতে হয়। তদুপরি দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে সিনেমা দেখা দূরের কথা, দৈনন্দিন সংসার চালানোই হয়ে উঠেছে প্রধান সমস্যা। এই গরিব বাংলা দেশের লোক কোনো দিনই দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারনি—তার উপর যুদ্ধ এসে হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে শশধরের মতো মধ্যবিত্ত সংসারী লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেও কি এক-আধ দিনের জন্যে? বছরের পর বছর কাটছে অন্নবস্ত্রের ঘোর দুর্ভিক্ষের ভিতর দিয়ে। একটা দুর্ভিক্ষ সে দিন গেল বাংলা দেশের লাখ লাখ লোককে মেরে—আবার আর একটা দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দুশ্চিন্তায় শশধর উন্মাদপ্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য! মানুষ যে কত সহ্য করতে পারে তা বহু রকম বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে না গেলে সে কি কোনো দিন বোঝে? শশধর ভেবেছিল এই ক'টা বছর মানুষের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল তা তার সহন শক্তির উপরে শেষ আঘাত হেনেছে। কিন্তু এর উপরে যখন কলকাতা শহরের উপর দিয়ে এক অভিনব হিংসার ঝড় বয়ে গেল তখন

দেখা গেল তাকে অতিক্রম করেও শশধর বেঁচে আছে! শহর-জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে চার-পাঁচ দিনের হিংস্র বর্বরতার খেলায়। ঘরে খাদ্য নেই—শহরে বাজার নেই—সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। তবু শশধর বেঁচে আছে—আর বেঁচে আছে তার স্ত্রী আর ছোট ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে।

এমনি অবস্থায় সে দিন নিদ্রাহীন রাত্রে শশধরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল বহু দিন আগে দেখা একটি সিনেমা ছবির কাহিনী।

গল্পটি এই :

ছবির নায়ক হ্যারল্ড বেকার-জীবন কাটাচ্ছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত এক দোকানে কাজ পেয়ে গেল। দোকানটি ছিল কাপড়ের কিন্তু এমন জায়গায় অবস্থিত যে সেখানে খদ্দের বড় একটা কেউ যেত না, অথচ সেখানকার বিক্রির সাফল্যের উপরেই কিন্তু তার চাকরিটির নির্ভর। হ্যারল্ড দিন-রাত ভাবছে কি ক'রে দোকানটিকে জনপ্রিয় ক'রে তোলা যায়। দোকানের সামনে ছিল প্রকাণ্ড উঁচু টাওয়ার—ঐটিকে কি ভাবে দোকানের বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করা যায়, এই চিন্তায় তার মন ভরে রইল। একদিন পথে যেতে হঠাৎ সে এক অদ্ভুত কৌশলী লোকের কতকগুলো খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। লোকটি যে-কোনো বাড়ির দেয়াল এবং পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারে। হ্যারল্ড ভাবল, এই লোকটিকে যদি দোকানের সামনেকার সেই বিরাট উঁচু টাওয়ারের পাইপ বেয়ে উপরে ওঠানোর ব্যবস্থা করা যায় এবং তার আগে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—অমুক খেলোয়াড় অমুক দোকানের সম্মুখস্থ টাওয়ারের মাথায় অমুক দিনে পাইপ বেয়ে উঠে দর্শককে মুগ্ধ করবে, তা হ'লে দোকানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে অতি সহজেই।

এই পরিকল্পনায় কাজ এগিয়ে চলল, ফলও ফলল আশাতীত।

টাওয়ারের নিচে নির্দিষ্ট দিনে লোকে লোকারণ্য। হ্যারল্ড অপেক্ষা করছে খেলোয়াড়ের জন্যে, সে তখনও এসে পৌছয়নি।

এমন সময় হঠাৎ সেই লোকটি যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে ঝড়ের মতো হ্যারল্ডের কাছে এসে বল্‌ল, আমাকে পুলিস অনুসরণ করছে—একটু পরেই আসছি, ইতিমধ্যে টাওয়ারের প্রথম তলাটায় তুমিই ওঠ। আমি দ্বিতল থেকে বাকীটা উঠব।

হ্যারল্ড তখন নিরুপায়। অগত্যা সে নিজেই প্রাণপণ চেষ্টায় দোতলায় উঠে খেলোয়াড়ের জন্যে অপেক্ষা করছে এমন সময় টাওয়ারের ভিতরের সিঁড়িতে পুলিস ও সেই খেলোয়াড় লুকোচুরি খেলার ভঙ্গীতে ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎ দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হ্যারল্ডকে বলে গেল, ভাই, আরও একতলা তুমিই ওঠ, আমি তেতলা থেকে বাকীটা উঠব।

ঐ লোকটা ছিল পলাতক অপরাধী। ফলে শেষ পর্যন্ত হ্যারল্ডকেই পাইপ বেয়ে পঁচিশ তলার উপরে উঠতে হ'ল। আর জনতা হ্যারল্ডকেই ওস্তাদ খেলোয়াড় মনে করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

শশধর এই গল্পটা ভাবছিল শুয়ে শুয়ে। তার জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে এর ঘটনা। যেন যুদ্ধ এসে বলল, একতলাটা ওঠ, তার পর মুক্তি পাবে। শশধর যুদ্ধ-সময়টা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর দুর্ভিক্ষ এসে বল্‌ল, আরও একটু এগিয়ে যাও তার পরে মুক্তি পাবে। শশধর তার সমস্ত শক্তিতে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে আর এক দুর্ভিক্ষ এসে বল্‌ল, আরও কিছু দিন চল, তার পর মুক্তি। শশধর নিরুপায়। চলতেই হবে দুর্বল পায়ে—উঠতেই হবে ধাপের পর ধাপ। তার পর এল দাঙ্গা!—এর পরেও বাঁচতে হবে।

শশধর মানুষের জীবনের এই পরম রহস্যময় টিকে থাকার প্রবৃত্তির কথা ভাবতে ভাবতে একটি রাত্রি বিনা নিদ্রায় কাটিয়ে দিল। এর সঙ্গে রাত্রি জাগবার মতো অবশ্য আরও অনেক উপদ্রব ছিল। শশধর একা নয়, পাড়ার সবাই রাত জাগছে, যাদের গলার জোর বেশি, তারা প্রহরে প্রহরে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করছে।

এদিক দিয়ে সকাল বেলাটা অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পথে পথে মিলিটারি গাড়ি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখেও অনেকটা স্বস্তি। হাঙ্গামার পর দিন-সাতেক কেটে গেছে—খবরের কাগজ লিখছে শহরের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সে কথায় কেউ নিশ্চিন্ত নয়। সমস্ত শহর বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে—বৃটিশ-বারুদ শহর রক্ষা করে চলেছে।

এ ক'দিন বাজার হয়নি। ঘরে ছিল ডাল আর চাল। শুধু তাই খেয়ে আর ক'দিন চলে। বাজারে বেরুতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গুজব রটে গেছে খাদ্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষ বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। বেগুনে বিষ, দুধে বিষ, মাছে বিষ। শশধর জানে এ গুজবের মূলে কোনো সত্য নেই। পাইকেরী হিসেবে মারাত্মক বিষ সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। স্ত্রী তবু বলে দিয়েছে বুঝে-সুজে জিনিস কিনো।

গুজব কি অসম্ভব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে, শশধর তার প্রমাণ পেল দু'-চার দিনের ভিতরেই। সে দিন সে বাজারে যাচ্ছিল এমন সময় দেখে একটি লোক একখানি চিঠি নিয়ে শশধরকেই খুঁজছে তাদের গলির মধ্যে। শশধর তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে দেখল তার স্ত্রীর নামে লেখা। খোলা চিঠি—তার স্ত্রীর এক বন্ধু থাকেন যশোর জেলায়, তিনি লিখেছেন। কলকাতা যাত্রীর হাতে তাড়াতাড়ি লিখে দিয়েছেন, বোধ হয় খাম সংগ্রহ করতে পারেননি। শশধর চকিতে চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে বলল, আমার-স্ত্রীর নামে চিঠি, এই বাড়িতে দিয়ে এসো বলে বাড়ি দেখিয়ে দিল তাকে।

বাজারে যেতে যেতে শশধর চিঠিখানার কথা ভেবে বিস্মিত হ'ল। চিঠিতে বন্ধু বন্ধুর কুশলের জন্যে যথাসম্ভব ব্যস্ততা প্রকাশ করে শেষে লিখেছেন "কলকাতায় খাদ্যদ্রব্যে আবার ত বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে? যদি দরকার বোঝ, তাহ'লে তরি-তরকারী এখান থেকে পাঠিয়ে দেব।"

শশধরের মন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে। বিপন্ন মানুষ যেখানে যেটুকু আশ্রয় পায়, তাকেই পরম পাওয়া বলে আঁকড়ে ধরে। শশধরও আঁকড়ে ধরল। সে বাজার থেকে ছোট্ট একটা মাছ অগ্নি-মূল্যে কিনে এনে স্ত্রীকে বলল, "খাওয়া ঘুচল এবার থেকে।"

"কেন গো, কি হ'ল আবার?"

"এইটুকু মাছ দু'টাকা, শুনে এলাম তরকারীতে বিষ মিশিয়েছে।" —চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে সে এই কথাগুলো উচ্চারণ করল। বলা বাহুল্য, সে যে তার স্ত্রীর চিঠিখানা দেখেছে সে কথা আদৌ প্রকাশ করল না।

স্ত্রী বলল, "কি সর্বনাশ! তাহ'লে তো তরকারী না কিনে ভাল করেছ।—আচ্ছা, আমি একটা উপায় বের করছি।"

স্ত্রী চিঠির কথাটি গোপন রাখল, সংসার-চালানায় দৈহিক পরিশ্রমের বাইরেও যে সে কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারে, এইটেই সে প্রমাণ করবে ব'লে ঠিক করল, এর রহস্যটা সে আগেই ভাঙতে চাইল না। চতুর শশধর নির্বোধ সেজে চুপ ক'রে রইল।

অফিস নেই ক'দিন। দাঙ্গার জন্যে ট্রাম-বাস ভয়ে ভয়ে চলছে, সেও সকল পথে নয়। শশধর দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে কাটায়। সে দিনও সে ঘুমিয়েই ছিল, কিন্তু বেলা তিনটের সময় কড়া নাড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়েই সে বুঝতে পারল, যে লোকটা

চিঠি নিয়ে এসেছিল সকাল বেলা, সে এখন ফিরে যাবে, তাই চিঠির বাব নিতে এসেছে।

পরদিন দুপুর বেলা শশধর দেখে স্ত্রীর নির্ধারিত উপায়ে আশাতীত ফল ফলেছে—একেবারে রিকশা বোঝাই তরি-তরকারী!—এবং সমস্তই নির্বিষ! শশধর মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠল। স্ত্রীর কাছে এসে বিস্ময়ের ভান ক'রে বলল, "এ সব কি ব্যাপার? এই দুর্দিনে এত তরি-তরকারী জোগাড় করলে কেমন ক'রে? নাঃ, তোমার বাহাদুরি আছে স্বীকার করতেই হবে। একেবারে সাত দিনের পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছ দেখছি।"

স্ত্রী কোনো কথা না বলে গর্বিত ভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

"এ তরকারীতে বিশ-টিশ নেই তো?" শশধর হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে বলে, "বিষ! এ কি তোমার কলকাতার জিনিস যে বিষ থাকবে? একেবারে সোজা ক্ষেত থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছে এ সব।"

"কি ক'রে পেলে বল তো? দাম খুব বেশি নয় তো?"

"দাম দিতে হবে না গো—দাম দিতে হবে না। এ আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছে বনগাঁ থেকে"—বলে শশধর-গৃহিণী বেগুন কোটায় মনোনিবেশ করল।

শশধর আলোচনাটা আর বেশি দূর টানল না। সে ছেলেমেয়েদের জন্যে দুধ সংগ্রহের জন্যে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে সে যখন ফিরে এলো আধ সের দুধ নিয়ে তখন তার আর কথা বলবার শক্তি ছিল না। "এইবার ছেলেদের পালা—হায় রে অদৃষ্ট!" এই সংক্ষিপ্ত হেঁয়ালীপূর্ণ সংবাদটি নিবেদন ক'রে সে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

স্ত্রী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "আবার কি হ'ল ?"

শশধর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "সব জায়গায় বলছে এবারে দুধে বিষ মিশিয়েছে।"

"ও মা, সে কি কথা! তা হ'লে এ দুধ আনলে কেন ?"—বলে স্ত্রী শশধরকে গাল দিতে লাগল।

শশধর বলল, "ভয় নেই, সাহেব-বাড়ি থেকে এই আধ সের দুধ কোন রকমে যোগাড় করেছি দু'টাকা দিয়ে—কিন্তু রোজ তো আর পাওয়া যাবে না।"

"পাওয়া না যায় না যাবে, ছেলেরা দুধ খাবে না, কিন্তু তাই ব'লে তুমি বিষ-মেশানো দুধও এনো না, সাহেব-বাড়ির এত দামী দুধও এনো না।"

"দামের জন্যেও ভাবতাম না, কিন্তু সাহেবপাড়া যেতে হয় এমন জায়গা দিয়ে যেখানে এখনো ছোরা-মারা চলছে।"

"খুব ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছ"—স্ত্রী অভিমান ভরে বলল। "আর তুমি কখনো এ ভাবে যেতে পাবে না, দুধ না জোটে, না খাবে, কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে এই ভাবে ভাবিয়ে তুলবে ?"

"কিন্তু দুধ"—

"তোমাকে ও-সব কিছু ভাবতে হবে না।"

এই কথাটা শোনবার জন্যেই শশধর এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সে প্রতিজ্ঞা করল আর কখনও ও রকম বিপজ্জনক পথে যাবে না।

পরদিন বিনা দুধেই কাটল। তার পরদিন থেকে যশোরের দুধ রোজ আসতে লাগল দু'-তিন সের করে সেই লোকটির মারফৎ। নির্বিষ খাঁটি দুধ শুধু ছেলে-মেয়েই খেল না, শশধরও প্রচুর খেতে লাগল প্রতিদিন। এর মধ্যে তরকারী আরও এক চালান এসে গেছে—বাজার থেকে এই সব বিষাক্ত জিনিষ আর কিনতে হবে না ভেবে

শশধর নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সে হ'ল না; কারণ এখনও মাছ বাকী।

তারপর যথাসময়ে এক দিন সমস্ত মাছে বিষ মিশল। মুসলমানরা না পারে এমন কাজ নেই, এবং সে কথা বিশ্বাস না করে এমন লোকও নেই। শশধর অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল।

বিষ মিশল না শুধু র‍্যাশনের চালে।

শশধর এমনি ভাবে একটু একটু ক'রে সুদিনের দিকে এগিয়ে অভ্যাস করেছে এত দিন। সে জানে অন্ধকার যত গভীরই ক, তার শেষে আলো আসবেই। সে মনে মনে অনেক হিসেব করে দেখেছে জিনিষ-পত্র সুলভ হতে আরও অন্তত দু'বছর লাগবে। ১৯৪৮ সালে দেশের এই অভাব কমতে বাধ্য। এই বছর দু'টি তাকে বহু কৌশলে পার হ'তে হবে। দু'বছর মানে সাত শ তিরিশ দিন। যতটা ফাঁকির উপর এর যতগুলো দিন পার ক'রে দেওয়া যায় ততই লাভ। ছেঁড়া ধুতি যা আগে পরা চলত না, সেই রকম ছেঁড়া ধুতি চ-খানা দু'দিন পরা গেলেও সে তা পরেছে। যে জুতোয় আগে এক ছর চলত, তা সে দু'বছর পরেছে। এই যুক্তিতে যশোরের দুধ, মাছ, আর তরি-তরকারীর সাহায্যে সে তার মেয়াদী দু'বছরের পনোরো ষোলটি দিন পার হয়ে গেল। এর মধ্যে যতই হীনতা থাক—এটাকে সে একটা দৈব আশীর্বাদ ব'লে না মেনে পারল না। স্ত্রীর বন্ধু ধনী গৃহিণী, তিনি খাদ্যে বিষ মেশানোর গুজব শুনে নিজে থেকে তরকারী পাঠানোর প্রস্তাব করেছিলেন, এই শুভ ইচ্ছা আর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সুযোগ শশধর কৌশল ক'রে একটু বেশি ক'রে নিয়েছে বলে তার কিছুমাত্র লজ্জা হ'ল না, উপরন্তু সে ভাগ্যকে প্রশংসা করতে লাগল। রও দিন পনেরো যদি এই ভাবে চলে তা হ'লে পূরো একটি মাসের

বাজার খরচ বেঁচে যাবে, এই কথাটা স্মরণ করে শশধর অত্যন্ত আরাম পেল।

এমন সময় যশোরের সেই ধনী গৃহিণী স্বয়ং এসে হাজির হ'লেন এক দিন। শশধরের স্ত্রী বহু কাল পরে বন্ধুকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সে তো শুধু বন্ধুই নয়, একেবারে প্রাণদাত্রী। এমন বিপদে যে সদ্য বিষের হাত থেকে একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা যাবে তাই ভেবে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কত আলাপ হ'ল দু'জনের। শশধরের স্ত্রী তাকে বাজার থেকে সন্দেশ আনিয়ে খাওয়াল। বন্ধুও তাকে নিমন্ত্রণ করল তার কলকাতার বাড়িতে, সেটা অবশ্য তার পিত্রালয়।

শশধরের স্ত্রী বলল, "ভাগ্যিস তুমি ভাই বনগাঁয়ে ছিলে, তাই আমরা বেঁচে গেলাম এবারের মতো।"

বন্ধু বললেন, "বনগাঁ থেকে তো আমি আজ আট দিন হ'ল এসেছি কলকাতায়।"

"তাহ'লে দুধ তরকারী মাছ এ সব আসছে কেমন ক'রে?"

বন্ধু হেসে বললেন, "ও-সব কলকাতার বাজার থেকেই এ ক'দিন কিনে পাঠিয়েছি। প্রথম পাঁচ-ছ দিন অবিশ্যি বনগাঁ থেকেই পাঠিয়েছিলাম।"

শশধর-গৃহিণী স্তম্ভিত হয়ে বলল, "কলকাতার এই বিষ-মেশানো খাদ্য তুমি পাঠিয়েছ?"

"ও তো দু'দিন পরেই জানতে পারলাম মিথ্যে গুজব, কিন্তু

দেখলাম তুমি যে রকম ভয় পেয়েছ তাতে কলকাতার জিনিষ-পত্র তোমরা কিনতেই পারবে না, অকারণ কষ্ট পাবে না খেয়ে, তাই তোমাকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকেই পাঠাচ্ছিলাম সব।"

পাশের ঘরে অবস্থিত শশধরের কানে সমস্ত কথাই আসছিল। শেষ কথাগুলো শুনে তার দৈনন্দিন জীবন ধারণ বিষয়ে এমন সাবধানী পরিকল্পনাকারী মনটাও একটু দমে গেল এবং সহসা মনে হ'ল—'ধরণী দ্বিধা হও'।

(বসুমতী, ১৯৪৬)